শশিনাথ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আষাঢ়, ১৩৬৬
পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর—
সরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২-সি শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

একটি কথা

"একটি কথা" নাম দিয়ে যে-কথা বলতে উদ্যত তা, আর যাই হোক না কেন, 'শশিনাথ' উপন্যাসের ভূমিকা অথবা ভূমিকার কাছাকাছি আর কোনো বস্তু নিশ্চয়ই নয়। উপন্যাসের ভূমিকা হয় না, আর স্বয়ং ঔপন্যাসিকের দ্বারা লিখিত ভূমিকার অর্থই হয়-না।

কথাসাহিত্য-সৃষ্টিকার্যে যে-সকল লেখক নূতন ব্রতী হয়েছেন, অথবা ভবিষ্যতে হবেন, 'শশিনাথ' উপন্যাসের বর্তমান সংস্করণের সুযোগে তাঁদের একটি উপদেশ দিতে চাই, অবশ্য উপদেশ দেবার যোগ্যতা যদি কিছু অর্জন ক'রে থাকি তবেই। কথায় বলে, বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং। আমি জ্ঞানবৃদ্ধ কিনা, তদ্বিষয়ে বিতর্ক চলতে পারে; কিন্তু আমি যে বয়োবৃদ্ধ, সে কথা আমার অতি বড় শত্রুরও স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। বিজ্ঞতা লাভের সাধারণত যে কয়েকটি উপায় নির্দেশ করা যেতে পারে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বয়োবৃদ্ধি,—কারণ, ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমি যদি ক্রমশ অল্পবিস্তর বিজ্ঞ হয়ে থাকি তাতে বিস্মিত হবার অথবা আপত্তি করবার তেমন কিছু নেই।

আমার মনে হয়, প্রত্যেক নবীন লেখকের উচিত প্রথম দিকের কিছু কিছু লেখা বেশ কিছুকাল দৃষ্টির অন্তরালে ফেলে রাখা। লেখা শেষ ক'রেই ছাপার অক্ষরে লেখা দেখবার আগ্রহে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

লেখার উন্নতিসাধন করতে হ'লে নিজ লেখার ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে সচেতন হওয়া একান্ত আবশ্যক। আর সে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, কিছুদিনের জন্য লেখাটিকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকা। নিত্য যাকে দেখি তার ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখের মধ্যে সহজ হ'য়ে অবস্থান করে। কিন্তু কিছুকাল ব্যবধানের পর অকস্মাৎ একদিন তাকে দেখলে সেগুলি সুস্পষ্ট ধরা দেয়। তখন সংশোধনকার্য সহজ হয়। নিজের দোষ অপরের মুখ দিয়ে শুনলে তত উপকার হয় না, যত হয় নিজের চোখ দিয়ে দেখলে।

'শশিনাথ' আমার প্রথম-লিখিত উপন্যাস। ভাগলপুরে ওকালতি করবার

সময়ে এই উপন্যাস লিখি। কি কারণে, সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু বস্তুত সম্পূর্ণ লিখিত হওয়ার পর বাক্সের নিরুপদ্রব আশ্রয়ের অন্ধকারে আবদ্ধ হ'য়ে 'শশিনাথ' সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল সুগভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। জাগ্রত ক'রে যেদিন তাকে বাক্স থেকে বার করলাম, সেদিন তার মূর্তি দেখে তেমন খুশি হ'তে পারি নি, যেমন পেয়েছিলাম তিন বৎসর পূর্বে তাকে ঘুম পাড়াবার দিনে। যা-কিছু অনিখুঁত অথবা যা-কিছু অপরিপুষ্ট শুধু তাই চোখে পড়ল না, চোখে পড়ল অনাবশ্যক বাহুল্যের অবাঞ্ছনীয় মেদ, যে মেদ ভারাক্রান্ত করে, কিন্তু শোভন করে না। সেদিন নিঃসংশয়ে বুঝেছিলাম, ভাল লিখতে হ'লে 'কি লিখব না' তদ্বিষয়েও টনটনে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। অপ্রয়োজনের ভার শুধু আমাদের দেহকেই নয়, মনকেও ক্লান্ত করে।

কোমর বেঁধে লেগে গেলাম সংশোধনকার্যে। কাটলাম, ছাঁটলাম, জুড়লাম, বদলালাম; অবশেষে তখনকার মত সন্তুষ্ট হ'য়ে পাণ্ডুলিপি বগলে চেপে কলিকাতার পথে রওনা দিলাম। এ কথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, 'শশিনাথ' উপন্যাসের সংশোধন ক্রিয়ার অবসরে রচনা-শৈলী সম্বন্ধে যে নিরীক্ষা নিজে নিজে লাভ করেছিলাম আজ পর্যন্ত তা আমাকে উপকৃত করছে।

রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'লেখা হচ্ছে একটি ভূত, যা লেখকের কাঁধে চেপে থেকে অবিরত অদল-বদল করিয়ে করিয়ে হায়রান ক'রে মারে; আর ছাপা হচ্ছে গয়ার পিণ্ড, যা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেই ভূত কাঁধ থেকে নেমে যায়।' কিন্তু গয়ার পিণ্ডের পরও যে লেখা-ভূত সূক্ষ্মতর দেহ অবলম্বন ক'রে লেখকের কাঁধে চেপে থাকে তার প্রমাণ 'শশিনাথে'র বর্তমান সংস্করণ। এ ক্ষেত্রেও উক্ত ভূত আমার দ্বারা কিছু কিছু পরিবর্তন না করিয়ে ছাড়ে নি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলবার আছে। কোন কারণে লেখার নকল করবার প্রয়োজন হ'লে নবীন লেখক যদি অপরের দ্বারা নকল না করিয়ে নিজ হস্তে নিজের লেখা নকল করবার পরিশ্রমটুকু স্বীকার করেন, তা হলে হাতে-হাতেই পুরস্কারের কিছু নগদ বিদায় লাভ করা দুর্লভ না হ'তে পারে। নকল করতে করতেই দু-চারটা অযথোচিত শব্দ অথবা গোটা-কয়েক কুগঠিত বাক্য পরিবর্তিত হওয়ার ফলে লেখাটার বেশ খানিকটা চক্‌চকিয়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

৪৬।৫-বি বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা,
১লা অগ্রহায়ণ, ১ ৫৫

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি কিরণে এই গ্রন্থের প্রথমাংশ

সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল

সেই

পূজনীয়া স্বর্গীয়া ভ্রাতৃজায়া

শ্রীমতী মৃদুমতী দেবীর

পবিত্র স্মৃতি উদ্দেশ্যে

অর্পিত।

এই লেখকের বই

অভিজ্ঞান (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
অস্তরাগ (২য় সংস্করণ)	৪৷৹
বিদুষী ভার্যা (৩য় সংস্করণ)	৪৷৹
যৌতুক (২য় সংস্করণ)	৪৲
শশিনাথ (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
অমলা (২য় সংস্করণ)	৩৲
সোনালী রঙ (২য় সংস্করণ)	৪৷৹
রাজপথ (৪র্থ সংস্করণ)	৪৲
ছদ্মবেশী (৩য় সংস্করণ)	৩৲
অমূল তরু (৩য় সংস্করণ)	৩৲
দিক্‌শূল (২য় সংস্করণ)	৪৷৹
আশাবরী (২য় সংস্করণ)	৪৲
রাজপথ (নাটক)	২৲
নাস্তিক	৩৲
কমিউনিস্ট্‌ প্রিয়া	২৷৵৹
নবগ্রহ	১৷৹
বৈতানিক	১৷৹
গিরিকা	১৷৹
রাতজাগা	১৷৹

১

কলিকাতার বাদুড়বাগান অঞ্চলে কোন প্রশস্ত দ্বিতল অট্টালিকায় শশিনাথ তাহার পড়িবার ঘরে পাঠে রত ছিল, এমন সময়ে দ্বার খুলিয়া একটি সুন্দরী যুবতী তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

অধ্যয়ন হইতে নিবিষ্টচিত্তকে মুহূর্তের জন্য বিমুক্ত করিয়া শশিনাথ বলিল, "কি মনে ক'রে বউদি ?"

মৃদু হাসিয়া যুবতী বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে। যদি সত্যি কথা বল তো বলি।"

"কি কথা ?"

"আগে বল সত্যি বলবে ?"

দর্শনের একটি জটিল সমস্যায় শশিনাথ মগ্ন ছিল। যখন দেখিল, ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী ঊর্মিলা একটি জটিলতর সমস্যা গড়িয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছেন, যাহা হইতে অব্যাহতি লাভের কোন উপায় দেখা যাইতেছে না, তখন সে অনন্যোপায় হইয়া ধীরে ধীরে বহি বন্ধ করিয়া কহিল, "যদি কোনো কথা না বলি তো স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু যদি বলি তো মিথ্যা বলব না। অতএব তোমার প্রশ্ন কি বল।"

ঊর্মিলার মুখে মিষ্ট হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

"লীলাকে তোমার পছন্দ হয় ?"

কথা শুনিয়া শশিনাথ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "এই কথার জন্যে এত ভূমিকা করছিলে? এ তো অতি সহজ কথা; আর এর সত্যি উত্তরই বা দেব না কেন?"

"পছন্দ হয়?"

"হয়।" বলিয়া শশিনাথ সকৌতুকে ভ্রাতৃজায়ার মুখের দিকে চাহিল।

ঊর্মিলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "তবে তাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি নেই?"

শশিনাথ সহাস্যে বলিল, "এবার কঠিন প্রশ্ন করেছ বউদি! জগতে যতগুলি পছন্দসই মেয়ে আছে, সবগুলিকেই দেখে আমার পছন্দ হবে। কিন্তু তাই ব'লে প্রত্যেকটিকেই বিয়ে করতে আমার যদি আপত্তি না থাকে তো সে বড় ভয়ানক কথা!"

ঊর্মিলা হাসিয়া কহিল, "কিন্তু আমি তো ভয়ানক কথা জিজ্ঞাসা করি নি ভাই। আমি একটিরই কথা জিজ্ঞাসা করছি। আর একটিকেই বিয়ে করবার জন্যে অনুরোধ করছি।"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শশিনাথ কহিল, "সর্বনাশ! তোমার এবারকার প্রশ্ন আরও কঠিন হ'য়ে উঠল। এর কোনো উত্তরই আমার মাথায় আসছে না।"

ঊর্মিলা বলিল, "তা হ'লে তুমি বলতে চাও যে, তোমার আপত্তি নেই?"

মৃদু হাস্যের সহিত শশিনাথ কহিল, "ক্ষমা কর বউদি, আমার কথায় যদি সেই রকম অর্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে, ভাষার ওপর আমার কিছুমাত্র দখল নেই। কারণ, তুমি যা বুঝেছ, আমি ঠিক তার উল্টোটাই বরাবর বোঝবার চেষ্টা করছি।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া ঊর্মিলার প্রসন্ন মুখ অনেকখানি ম্লান হইয়া গেল। কহিল, "লীলা বাপ-মা-মরা ঘাড়ে-পড়া মেয়ে, তাই কি তোমার অমত?"

উর্মিলার কথা শুনিয়া শশিনাথের মুখে সবিরক্তি বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। কহিল, "এ কথা তুমি যদি ঠাট্টা ক'রে বলে থাক, তা হলেও ভাল কর নি বউদি। আমার ওপর তোমার সত্যিই কি এই ধারণা?"

অপ্রতিভ হইয়া উর্মিলা কহিল, "তবে তোমার অমত কেন?"

শশিনাথ বলিল, "অমত কেন, সে কথা শুনলে তুমি এখনি ইংরেজী শিক্ষার কুফলের বিষয়ে লেকচার দিয়ে বসবে।"

উর্মিলা হাসিয়া বলিল, "ওঃ, লেখাপড়া শেষ না ক'রে বিয়ে করবে না, সেই কথা বলতে চাও?"

শশিনাথ কহিল, "হেসে ফেললে যে? কথাটা একেবারেই তুচ্ছ নাকি?"

উর্মিলা অন্যপথ অবলম্বন করিল। কহিল, "কেন, তোমার দাদাও তো লেখাপড়া শেষ না করেই বিয়ে করেছিলেন।"

গম্ভীরভাবে শশিনাথ কহিল, "তা ঠিক, তবে সে বিষয়ে আমার একটি কথা বলবার আছে। দাদা লেখাপড়া শেষ না করে বিয়ে করেছিলেন এটাও যেমন সত্যি, দাদা লেখাপড়া শেষ করতে পারলেন না এটাও ঠিক তেমনি সত্যি। বল ঠিক কি না?"

ছোট একটি ঢোঁক গিলিয়া উর্মিলা বলিল, "কেন, আমি কি তোমার দাদার পড়ার বই বন্ধ ক'রে দিতাম?"

মৃদু হাস্যসহকারে শশিনাথ কহিল, "বই বন্ধ ক'রে দেবার দরকার তো হয় না—আপনা-আপনিই বন্ধ হ'য়ে যায়। এ বিষয়ে দু-মত হ'তে পারে না বউদি। মান্ধাতার আমল থেকে বউ আর বই-এ বিরোধ চ'লে আসছে। সেই জন্য একটিকে শেষ ক'রে অপরটি ধরা উচিত। বউ শেষ ক'রে বই ধরবার মত পরমায়ু ভগবান মানুষকে দেন নি; সেই জন্যে বই শেষ করেই বউ ধরা বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি ঠিক যথাসময়ে এ সংসারে প্রবেশ কর নি, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল।"

উর্মিলা হাসিয়া বলিল, "ওঃ, তা হ'লে লীলাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা

করতে বলছ তো? এম, এ, পাস করতে তো তোমার আর মাসকয়েক দেরি আছে। তোমাদের মতে লীলা যদি সতের বৎসর অপেক্ষা ক'রে থাকতে পারে তো আরও দু-চার মাস নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে।"

উর্মিলার কথা শুনিয়া শশিনাথ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "দেখ বউদি. বাঙালী-বাড়ির বউ না হ'য়ে তুমি যদি উকিল ব্যারিস্টার হ'তে, তা হ'লে বাংলা দেশের অনেক উপকার হ'ত। কিন্তু বৃথা পরিশ্রম করছ—এ মামলা তোমার টিকবে না, কিছুতেই আমার কাছে ডিক্রী পাবে না।"

শরতের রবিকরোজ্জল প্রসন্ন শস্য ক্ষেত্রের উপর সহসা খণ্ডমেঘ আসিয়া পড়িলে যেমন তাহা মলিন ভাব ধারণ করে, শশিনাথের কথা শুনিয়া উর্মিলার হাস্যপ্রফুল্ল মুখ তেমনি ম্লান হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে কতকটা আপনার মনে ধীরস্বরে কহিল, "এ আমার এমনই কি অন্যায় মামলা যে, কিছুতেই টিকবে না!"

শশিনাথ কিন্তু উর্মিলার স্বগত উক্তিকে উপেক্ষা না করিয়া স্পষ্টভাবে জবাব দিয়া কহিল, "অন্যায় না হ'লেও অনেক সময়ে মামলা টেকে না।"

ক্ষুণ্ণস্বরে উর্মিলা কহিল, "তাকেই বলে—অবিচার।"

এবার শশিনাথ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "অবিচার নিশ্চয়ই, কিন্তু অবিচার করছে কে? যে জোর ক'রে বিয়ে করাতে চাচ্ছে সে, না, যে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না সে? বিয়েটা যদি শুধু নিজেকে নিয়ে একটা ব্যাপার হ'ত তা হ'লে তোমার কথায় আমি দিনের মধ্যে তিনশো বার বিয়ে করতাম। কিন্তু এ যে নিজের সুখ-দুঃখ, ভাগ্য-অদৃষ্টের সঙ্গে অন্য একজনকে বাঁধতে হবে। আমাদের হিঁদুর ঘরে সে আবার এমন বাঁধন যে, কাটবে ছিঁড়বে কিন্তু খুলবে না।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া উর্মিলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু তোমাকে তো একদিন এ বাঁধনে পড়তেই হবে ঠাকুরপো।"

শশিনাথের চোখের কোণে মৃদু হাস্য কুঞ্চিত হইয়া উঠিল! বলিল, "কে

বললে পড়তেই হবে! অবশ্য আমি এত বড় আহাম্মক নই যে, হলফ নিয়ে বলব কখনই পড়তে পারি নে। তবে মনের বর্তমান অবস্থা থেকে অন্তত এটুকু জোর ক'রে বলতে পারি যে, না পড়তেও পারি।"

মনের বর্তমান অবস্থা যে কি তাহা ঊর্মিলার অগোচর ছিল না। সেই জন্যই বিশেষ করিয়া সে তাহার এই সংসারবিমুখ দেবরটিকে বিবাহের মায়াপাশে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। বৈরাগ্যের প্রবল স্রোতে যে নৌকা চঞ্চল, গুরুতম নোঙরের ভারে তাহাকে অচল করিবার অভিসন্ধি ছিল। তাই দেবরের কথা শুনিয়া মনের মধ্যে অভিমানের আঘাত বাজিলেও ঊর্মিলা একেবারে নিরাশ বা নিরস্ত হইল না। এ শুধু লীলার বিবাহের ব্যবস্থা নহে, ইহার মধ্যে সংসারের মঙ্গলও নিহিত রহিয়াছে—এ বিবেচনা তাহাকে ভগ্নোদ্যম হইতে দিল না। একটু অভিমানের সুরে অনুযোগের ভঙ্গীতে সে বলিল, "কিন্তু কখনো যদি বিয়ে কর তখন তো মনে হবে যে, বউদিদির অনুরোধ রাখি নি।"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "তখন না হয় দণ্ড-স্বরূপ বিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়ো।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া ঊর্মিলা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "মন্দ কথা নয়। শাপে বর পেতে চাও!" তাহার পর গমনোদ্যত হইয়া বলিল, "উপস্থিত আর তোমার পড়ার ক্ষতি করব না—চললাম। কিন্তু মনে ক'রো না যে, রণে ভঙ্গ দিয়ে চললাম।"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "না, তা কেন? সন্ধি স্থাপনা ক'রে চললে।"

হাসিতে হাসিতে ঊর্মিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

শশিনাথের দাদা সোমনাথ যখন ফার্স্ট' আর্টস্ পড়িতেছিল, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। জননীর মৃত্যু বহুপূর্বেই হইয়াছিল। এক বিধবা পিসী সংসারের কর্ত্রীরূপে এই পিতৃমাতৃহীন বালকদ্বয়ের অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতার শোক কতকটা ভুলিবার জন্যই হউক বা কাশীবাসের পথ পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, পিসীমা সংসারে একটি বধূ আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি চাহিতেছিলেন, মেয়েটি এমন একটু ডাগর হয় যে, সংসারে আসিয়া তাঁহার ভার আরও না বাড়াইয়া লাঘবই করিতে পারে।

পিসীমার মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন পাশের বাটি ভাড়া লইয়া সপরিবারে একটি পীড়িত ভদ্রলোক পশ্চিমের কোনো অজ্ঞাত শহর হইতে চিকিৎসা করাইতে আসিলেন। পরিজনবর্গের মধ্যে দুইটি অবিবাহিতা বালিকা ছিল। একটির নাম উর্মিলা, অপরটির নাম লীলা। ইহারা পরস্পরে সহোদরা এবং পীড়িত ব্যক্তির সম্পর্কে ভাগিনেয়ী। হিন্দু-পরিবারে সাধারণত যে বয়সে বিবাহ হয়, উর্মিলা তিনচার বৎসর পূর্বেই তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তখন লীলার বয়স এগার বৎসর। ব্যাধির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যত না হউক, এই দুইটি ভাগিনেয়ীর হস্ত হইতে উদ্ধার লাভের জন্য মাতুল অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার নিকট ডাক্তার অপেক্ষা ঘটকের গতিবিধিই ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে মাতুলের পক্ষে ব্যাধি এবং ভাগিনেয়ী উভয়েরই হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়ার আশা একই মাত্রায় অল্প। অর্থপণের পরিবর্তে শুধু সৌন্দর্য-পণ লইয়া বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় এমন পাত্র কোনও ঘটক বাহির করিতে পারিল না, অথচ অর্থ ব্যয় করিয়া ভাগিনেয়ীর

বিবাহ দিবার অবস্থা মাতুলের একেবারেই ছিল না। অবশেষে প্রায় একই সময়ে ডাক্তার এবং ঘটক উভয়েই মাতুলকে এক প্রকার জবাব দিয়া বসিল।

অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয়, সেই সময়ে সোমনাথের পিসীমার সহিত এই বিপন্ন পরিবারের পরিচয় ঘটিল। তখন পৌষ মাস, শীতকাল। পিসীমা ছাদের উপর রৌদ্র পোহাইতেছিলেন। সহসা পাশের বাটির ছাদে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, ষোল-সতের বৎসরের একটি কিশোরী ছাদে বিছানা রৌদ্রে দিতেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিছানা রৌদ্রে দেওয়া শেষ না হইল, পিসীমা নীরবে বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। শেষ হইলে হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিলেন। বালিকা নিকটে আসিলে পিসীমার মনে হইল, ছাদের সে দিকটা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গায়ে সোনার আঁচড় নাই, পরনে একখানি নীলাম্বরী শাড়ি এবং দুই হাতে দুইগাছি কাঁচের লাল চুড়ি। তাহারই দাপট দেখে কে!

"তোমরা কতদিন এ বাড়িতে এসেছ?"

বালিকা কহিল, "প্রায় তিন মাস।"

সবিস্ময়ে পিসীমা কহিলেন, "তিন মাস! ওমা, একদিনও দেখি নি তো? তোমরা কে কে আছ এখানে?"

"মামাবাবু, মামীমা, আমার ছোট বোন আর আমি।"

"তোমার মা নেই?"

"না, মা মারা গেছেন।"

"বাবা?"

"বাবাও—" বালিকার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। পিসীমা অন্তরে ব্যথা পাইলেন। কহিলেন, "আহা ম'রে যাই! তোমার আর কোন ভাই-বোন আছে?"

"না।"

"তোমার মামার ছেলেপিলে আছে ?"

"না, ছেলেপিলে হয় নি।"

"তোমার মামীমা তা হ'লে তোমাদের ভালবাসেন ?"

একটু ইতস্তত করিয়া ঢোঁক গিলিয়া বালিকা কহিল, "বাসেন।" এত বড় মিথ্যা কথাটা সহজে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল না।

'বাসেন'-এর অর্থ বুঝিতে পিসীমার বিলম্ব হইল না। প্রসঙ্গান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বালিকার সীমন্তে দৃষ্টি পড়িল। সবিস্ময়ে কহিলেন, "তোমার এখনও বিয়ে হয় নি ?"

লজ্জায় বালিকার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার আনত-আরক্ত মুখের নীরব উত্তর লাভ করিয়া পিসীমা কহিলেন, "তোমার বিয়ে দেবার জন্যে তোমার মামা বুঝি কলকাতায় এসেছেন ?"

মৃদুস্বরে বালিকা বলিল, "না, মামাবাবুর অসুখ; চিকিৎসার জন্যে আমরা এসেছি।"

পিসীমার মনের মধ্যে একটা কথা বিদ্যুতের মত ঝলকিয়া উঠিল; কহিলেন, "তোমরা বামুন, না কায়েত ?"

"বামুন।"

"তোমার বাবার উপাধি কি ?"

"বাঁড়ুজ্জে।"

"বাঁড়ুজ্জে ?" পিসীমার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য, তাঁহার অন্তরের একমাত্র কামনা মূর্তিমতী হইয়া তিন মাস পাশের বাটিতে বাস করিতেছে, আর তিনি দেশ-দেশান্তরে শহরে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন! পিসীমা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়াই হউক এই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী বালিকাটিকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

আনন্দের আবেগে তাঁহার হৃদয়ের উৎস খুলিয়া গেল। কহিলেন, "মা, তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে ?"

এই প্রশ্নে বালিকা একটু বিপন্ন মনে করিল, কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া কহিল, "মামীমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে যাব।"

পিসীমা হাসিয়া কহিলেন, "সে আসার কথা বলছি নে মা। তুমি কি এ বাড়ির বউ হ'য়ে, লক্ষ্মী হ'য়ে আসবে? এ বাড়ি ঘরদোর আসবাবপত্র সব তোমার হবে। আমি তোমাকে বুকে ক'রে রাখব।"

সহসা এই অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত প্রস্তাবে ও প্রশ্নে বালিকা সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িল। এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই তাহার মাথায় আসিল না। সে শুধু রক্তিম হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অবসর পাইলে পিসীমা আরও কত কি পাগলামি করিতেন বলা যায় না। নীচে হইতে একটি ক্ষীণ, অথচ যথেষ্ট কর্কশ এবং কঠোর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। কিন্তু কোনও বাক্য বুঝা গেল না। বালিকা বলিল, "মামীমা ডাকছেন।"

সস্নেহে পিসীমা কহিলেন, "আচ্ছা, তবে এখন এস মা। তোমার নামটি কি?"

বালিকা কহিল, "ঊর্মিলা।"

"আচ্ছা, এস।" মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তোমাকে আমি শিগগিরই নিয়ে আসছি।"

ঊর্মিলার কর্ণে সে কথা পৌঁছিল, সে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই পিসীমা পাশের বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ি, ঢুকিতেই উঠান। উঠানের এক দিকে একটি ছোট চৌবাচ্চা এবং পাশে জলের কল। চৌবাচ্চার পাশ দিয়া সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। পিসীমা বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ঊর্মিলা কোমরে আঁচল জড়াইয়া হাঁটুর নিকট কাপড় উঠাইয়া উঠানে চৌবাচ্চার ধারে বসিয়া একরাশি বস্ত্রে সাবান দিতেছে। পিসীমা বুঝিতে পারিলেন, সেগুলি রোগীর বস্ত্র। পিসীমাকে দেখিয়া ঊর্মিলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

পিসীমা কহিলেন, "ঊর্মিলা, তোমার মামী কোথায়?"

ঊর্মিলা সিঁড়ি দেখাইয়া দিয়া কহিল, "ওপরে আছেন।"

নীচে কথাবার্তার শব্দ শুনিয়া উপরে বারান্দা হইতে একজন স্ত্রীলোক ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

পিসীমা কহিলেন, "পূব দিকের বাড়িতে থাকি। তোমাদের বাড়ি অসুখ শুনে দেখতে এসেছি।"

পূর্বদিকের বাড়ির আকার প্রকার স্মরণ করিয়া উপর হইতে স্ত্রীলোকটি সাগ্রহে ব'লল, "আসুন, উপরে আসুন।" পিসীমা বুঝিলেন, ইনিই মামীমা।

বিস্তারিতভাবে রোগীর কথাই চলিতেছিল, তাহার মধ্যে ঊর্মিলার বিবাহের কথা তুলিতে পিসীমার সঙ্কোচ বোধ হইতে ছিল। কিন্তু সুযোগ আপনি উপস্থিত হইল।

মামীমা কহিল, "রোগ নিয়ে তো এই বিপদ, তার ওপর দু কাঁধে ঝুলছে দুটো কপালপোড়া মেয়ে, বড়টা তো ধাড়ী হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু বিয়ের কিছুই হ'ল না। অথচ রোগীর তো রোগের কথা মনেই থাকে না—বিয়ে বিয়ে ক'রেই প্রাণটা বেরুল।"

পিসীমা কহিলেন, "একটিকে তো নীচে দেখলাম, আর একটি কোথায়?"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মামীমা বলিলেন, "ওই ঘরে ব'সে আছে। লীলা, এদিকে আয়।"

বাহিরে আসিয়া লীলা সন্ত্রস্ত হইয়া মামীমার পাশে দাঁড়াইল।

মামীমা ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "মেয়ের ঢঙ দেখ, যেন সঙ! প্রণাম কর্।"

অপ্রতিভ হইয়া লীলা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রনাম করিতে গেল। পিসীমা সাদরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন। সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "আহা! যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা! কি করছিলে মা?"

সভয়ে লীলা কহিল, "মামাবাবুর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম।"

পিসীমা কহিলেন, "লক্ষ্মী মেয়ে।" তাহার পর লীলার মামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখুন, অসুখের কথা তো ভগবানের হাত, তাঁর দয়া ভিন্ন কিছু হবার জো নেই। তবে মানুষের দ্বারা আপনাদের এ বিপদে যতটা করা সম্ভব, তা আমরা করতে পারি।" বলিয়া ধীরে ধীরে ঊর্মিলার সহিত সোমনাথের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

ঊর্মিলার মামী দেখিলেন, মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সুবিধাটা আরও কিছু বেশী মাত্রায় করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, "তা তো বটে। কিন্তু এই রুগীর খরচপত্র, তার ওপর মেয়ের বিয়েতে বাজে খরচ কি ক'রে করি বলুন? অসুখের খরচ ছাড়া আর একটি পয়সা বাজে-খরচ করবার শক্তি আমাদের নেই।"

পিসীমা কহিলেন, "খরচ করেই যদি তোমাদের এ সময়ে বিয়ে দিতে হয়, তা হ'লে তো ভারি উপকার করলাম। দেখ, ভগবানের কৃপায় আমার সোমনাথের এক পয়সা কারো কাছে চাইবার দরকার নেই, ভগবান তাকে যা দিয়েছেন যথেষ্ট দিয়েছেন, আমি শুধু মেয়েটি চাচ্ছি।"

মনে মনে পুলকিত হইয়া মামী গম্ভীরমুখে কহিলেন, "আচ্ছা, আপনি বসুন। কর্তাকে কথাটা বলি।"

প্রায় আধ ঘণ্টাকালব্যাপী মন্ত্রণারপর মামী আসিয়া কহিলেন, আপনি একবার দরজার পাশে দাঁড়াবেন আসুন। দু-একটা কথা কর্তা নিজে আপনাকে বলবেন।"

পিসীমা দরজার নিকট দাঁড়াইলে রোগী শয্যার উপর কোনো প্রকারে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "আপনার সদয় প্রস্তাবের জন্য আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটু নিবেদন আছে। যে অসুখে আমাকে ধরেছে, তাতে যে এ যাত্রায় পরিত্রাণ পাব, তা মনে হয় না। আমার অবর্তমানে আমার স্ত্রীর অবস্থা কি হবে, সে চিন্তা আমার মৃত্যু-চিন্তার চেয়ে অধিক কষ্টকর হয়েছে। তার উপর যদি দুটো মেয়ে তার গলগ্রহ হয়ে

থাকে, তা হলে সে আরও বিপদে পড়বে। তা ছাড়া মেয়ে দুটোর একটা গতি হ'ল দেখে যেতে পারলে আমি মনে একটু শান্তি পাই। সে জন্যে আমি একেবারে দুটিকে পার করবার চেষ্টায় আছি। এক জায়গায় সেই রকম কথাবার্তাও চলেছে। আপনাকে আমি বলতে পারি নে, কিন্তু লীলার ভারও যদি আপনি দয়া করে নেন, তা হলে আমার কোনো আপত্তিই থাকে না।"

পিসীমা সানন্দে কহিলেন, "এ ভারের কথা নয় আনন্দের কথা। লীলাকে আমি বুকে ক'রে নিয়ে যাব। তার সব ভার আমার ওপর থাকবে।"

সেই দিনই বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ঊর্মিলা ও লীলা পাশের বড় বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিবাহের পর আরও এক মাস রোগের হস্তে নিগ্রহ ভোগ করিয়া অবশেষে মাতুল চির-নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিলেন। শ্রাদ্ধের পর তাঁহার স্ত্রী এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় লইলেন। সে-যে কোথায় এবং কত দূরে কেহ তাহার সন্ধান জানিল না। আরও এক বৎসর সোমনাথের সংসারে থাকিয়া পিসীমা কাশীবাস করিলেন। এখন ঊর্মিলা গৃহের গৃহিণী। লীলার বিবাহের বয়স হওয়ায় সে বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ঘরে এমন সংপাত্র থাকিতে বাহিরে যাইতে সে সম্মত নয়।

দুই-তিন দিন হইল সুবাসিনী বেড়াইতে আসিয়াছে। সুবাসিনী সোমনাথ-শশিনাথের মাসতুতো বোন, কলিকাতায় তাহার শ্বশুরবাড়ি, পিত্রালয় হুগলী জেলার কোন পল্লীগ্রামে; মাঝে মাঝে সে সোমনাথের গৃহে আসিয়া দুই-চার দিন থাকিয়া যায়। স্বামী নরেন্দ্রনাথ অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান, তিন বৎসর হইল হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন।

রান্নাঘরে ঊর্মিলা বৈকালের জন্য খাবার তৈয়ার করিতেছিল, এবং সুবাসিনী ও লীলা নিকটে বসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছিল। এ কাজটি ঊর্মিলা পারত পক্ষে পাচকের হস্তে ছাড়িত না। নিত্য নূতন নূতন মিষ্টান্ন ও খাবার প্রস্তুত করিবার আগ্রহ ও শখ তো তাহার ছিলই, তাহা ছাড়া স্বামী ও দেবরকে

স্বহস্ত-প্রস্তুত আহার্য খাওয়াইয়া সে মনের মধ্যে বিশেষ তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিত। তাহার উপর আজ সন্ধ্যার সময়ে সুবাসিনীর স্বামী নরেন্দ্রনাথ আসিবেন ও আজ রাত্রি এই গৃহে যাপন করিয়া পরদিন বৈকালে সুবাসিনীকে লইয়া যাইবেন। সেই জন্য অদ্যকার খাবার প্রস্তুতের মধ্যে বিশেষ একটু আয়োজনের ব্যবস্থা ছিল।

রস পাক করিতে করিতে ঊর্মিলা কহিল, "সুবা-ঠাকুরঝি, বেসনগুলো গোলাপ-জল জাফ্রান আর এলাচ-গুঁড়ো দিয়ে বেশ ক'রে ফেনাও না ভাই।" লীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "লীলা, তুমি ততক্ষণ আলুসিদ্ধগুলো বেশ ভাল ক'রে বেটে রাখ।"

সহকারিণীগণ নিজ নিজ নির্দিষ্ট কার্যে নিযুক্ত হইল। ঊর্মিলা নিবিষ্টমনে রস নাড়িয়া নাড়িয়া রসের গাঢ়তা লক্ষ্য করিতে লাগিল। ধোঁয়া ও অগ্নিতাপে তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি রক্তপদ্মের মত টকটকে হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া সুবাসিনী কহিল, "সত্যি বউদি, এক লীলা ছাড়া তোমার মত সুন্দরী বাঙ্গালীর ঘরে আমি আর দেখি নি।"

সুবাসিনীর কথা শুনিয়া মৃদু-হাস্য করিয়া ঊর্মিলা বলিল, "কি ক'রে দেখবে ভাই, নিজের মুখখানি তো আর নিজে দেখতে পাও না।"

সুবাসিনী হাসিয়া বলিল, "খুব দেখতে পাই—আরসির সামনে দাঁড়ালেই শ্রীমুখ নজরে পড়ে। কি ক'রে বললে বউদি! কিসে আর কিসে! সোনায় আর সীসেয়!"

ঊর্মিলা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, ঠাকুরজামাই এলে এর বিচার তাঁর কাছে হবে। দেখব তিনি তোমার মুখ ভাল বলেন, না, আমার মুখ ভাল বলেন!"

সুবাসিনীর মুখে লজ্জার মৃদু আভাস ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা, ধর, সেখানে যদি আমার হারই হয়, তা হ'লে কিন্তু দাদার কাছে আপীল করব। দেখব, তিনি কার মুখ ভাল বলেন।"

ঊর্মিলার মুখে কৌতুকের হাস্য ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "উকিলের বউ হয়ে আপীল খুব করতে তো শিখেছ, কিন্তু দাদা যদি তোমার মুখখানা পছন্দ ক'রে বসেন, তখন কি করবে শুনি!"

সুবাসিনীর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। ঊর্মিলার পৃষ্ঠে ছোটখাটো একটি কিল মারিয়া কহিল, "তুমি ভারি দুষ্টু।" তাহার পরই সহসা তাহার মাথায় বুদ্ধি যোগাইল; কহিল, "আর তোমার ঠাকুরজামাই যদি তোমার মুখ পছন্দ ক'রে বসেন, তা হ'লে কি করবে শুনি?"

ঊর্মিলা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তা হ'লে ঠাকুরজামাইকে আরও দুখানা গোকুল-পিঠে বেশি ক'রে খেতে দোব। কিন্তু তোর দাদা তোর মুখ পছন্দ করলে কি খেতে দিবি তা বল্?"

বেসনের থালা ঠেলিয়া দিয়া তর্জন করিয়া সুবাসিনী বলিল, "যাও, তুমি ভারি অসভ্য! তোমার সঙ্গে কথা কইতে নেই।"

হাসিতে হাসিতে ঊর্মিলা বলিল, "তা বাপু, আমার উপর রাগ করছিস কেন? তুই নিজেই তো আপীল করবার কথা তুললি। আপীল ক'রে এখন সুফলের ওপর রাগ করলে চলবে কেন?"

থালা টানিয়া লইয়া মুখখানা হাঁড়ির মত গম্ভীর করিয়া সুবাসিনী বলিল, "তুমি বুঝি তোমার—" কিন্তু ঊর্মিলার পাল্টা পরিহাসের ভয়ে কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে থামিয়া গেল।

ননদ-ভাজের রঙ্গ দেখিয়া লীলা মনে মনে পুলকিত হইতেছিল। সুবাসিনীর দুরবস্থা দেখিয়া তাহার ভারি হাসি পাইল, কহিল, "সুবাদিদি, ভাল চাও তো দিদিকে বেশি ঘাঁটিও না। দিদির মুখ ছুটলে, তোমাকে শেষ পর্যন্ত ছুটে পালাতে হবে তা জেনো।"

লীলার কথায় সুবাসিনীর মনোযোগ লীলার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ঊর্মিলার দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা বউদি, আমাদের মুখের ব্যবস্থা তো এক রকম হ'ল, লীলার মুখের বিচারের জন্য কার কাছে যাওয়া যাবে?"

অকস্মাৎ সুবাসিনীর এ অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে লীলা একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া সে বলিল, "বাঃ রে! বেশ তো! আমি ভাল কথা বললাম ব'লে উল্টে আমার পেছনে লাগলে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরবে হাসিতে হাসিতে সুবাসিনী কহিল, "পেছনে লাগালাগি আবার কি ভাই? আমরা আমাদের কথা নিয়েই মত্ত ছিলাম, তোমার কথাটা একেবারে ভুলে থাকা কি ভদ্রতা হয়? বল না বউদিদি, কার কাছে যাওয়া যাবে?"

মুখ টিপিয়া সুবাসিনীর দিকে মাথা ঈষৎ ঝুঁকাইয়া উর্মিলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুরপোর কাছে।"

সুইচ্ টিপিয়া দিলে ইলেক্‌টিক লাইটের তার যেমন নিমেষের মধ্যে দীপ্ত হইয়া উঠে, উর্মিলার এই একটি কথায় লীলার মুখমণ্ডল তেমনি মুহূর্তের মধ্যে আরক্ত হইয়া উঠিল। এমন-একটি অদ্ভুত ও গুরুতর কথা উর্মিলা এমন অসঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে কি করিয়া বলিল, তাহা ভাবিয়া লীলার বিস্ময় লজ্জাকে অতিক্রম করিল। এ আবার এমনই সঙ্কোচের কথা যে, ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে যাওয়াও তদপেক্ষা অধিক সঙ্কোচজনক। লীলা অবনতমুখে সিদ্ধ আলুর খোসা ছাড়াইতে লাগিল।

সহাস্যে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুবাসিনী কহিল, "তোমার মনে মনে বুঝি তাই আছে? তা হচ্ছে না বউদি, লীলাকে আমি নিয়ে যাব।"

বিস্মিত-স্মিত মুখে উর্মিলা কহিল, "তুমি নিয়ে যাবে, কি রকম?"

সুবাসিনী কহিল, "আমার ঠাকুরপোর সঙ্গে লীলার বিয়ে দিতে হবে।"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "আর আমার ঠাকুরপো ভেসে যাবে নাকি?"

সুবাসিনী কহিল, "মেজদাদা এখন কবে বিয়ে করবে তার কোন ঠিক নেই। যাই বল বউদি, লীলাকে আমাদের হিঁদুর ঘরে আর বেশি দিন আইবড় রাখা চলে না। আমার দেওর এম, এস-সি, একজামিন দিলেই বিয়ে দেওয়া হবে ব'লে তার সম্বন্ধ খোঁজা হচ্ছে।"

উনানের উপর হইতে রসের পাত্র নামাইয়া ফেলিয়া উর্মিলা কহিল, 'লীলাকে কি এই সতর বৎসরই আইবড় রাখা যেত? আমাদের স্থিরই আছে যে, ঠাকুরপোর সঙ্গে তার বিয়ে হবে, তাই ঠাকুরপোর লেখাপড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আছি। তারও তো আর বেশি দেরি নেই। তোমার দাদার ইচ্ছে নয় যে, লীলা পরের বাড়ি যায়।"

লীলা বড়ই বিপদে পড়িল। নির্বিবাদে এ সকল কথাবার্তা শুনার মধ্যেও সে একটা অস্বস্তি ও সবিরক্তি লজ্জার ক্লেশ পাইতেছিল, অথচ প্রতিবাদের দ্বারা এ প্রসঙ্গকে বন্ধ করিতে যাওয়ার মধ্যেও সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। অনন্যোপায় হইয়া লীলা দেখিল, আলুগুলিকে পিষিয়া পিষিয়া মাখমের মত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

সুবাসিনী হাসিয়া কহিল, "আমার কাছে গেলে পরের বাড়ি যাওয়া হবে না।"

উর্মিলা বলিল, "এত বড় মেয়ের সঙ্গে বরেনের বিয়ে দিতে নরেন রাজি হবেন?"

"সে জন্যে কারুর অমত হবে না—তাঁরও না, ঠাকুরপোরও না।" লীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "এমন ছবিখানি আবার কারো অপছন্দ হয় না-কি?"

এবার লীলার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল। বিরক্তিভরে লজ্জা-স্মিতমুখে সে বলিল, "আচ্ছা সুবাদিদি, যত রাজ্যের বাজে-কথা ছাড়া আর কি তোমাদের কথা নেই?"

সুবাসিনী হাসিয়া কহিল, তুমি রাগ করছ লীলা, কিন্তু বিয়ের কথা শুনলে আমার তো ভারি আমোদ হ'ত।" বলিয়া হাস্যময়ী রহস্যপ্রিয়া সুবাসিনী উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহার সরল সুমিষ্ট হাস্যরবে রান্নাঘর প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করিল।

অতিমাত্রায় বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া উর্মিলা বলিল, "ওমা, সে কি কথা! বিয়ের কথায় তোমার আমোদ হ'ত সুবা-ঠাকুরঝি?"

"কেন হবে না? তুমিও তো একদিন বলছিলে যে, দাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে যখন .স্থির হ'য়ে গিয়াছিল, তখন তোমার ভারি আনন্দ হয়েছিল।"

একটু ইতস্তত করিয়া লজ্জিতভাবে উর্মিলা কহিল, "সে অন্য কারণে।"

"বিয়ের আগে ছাদে দাদাকে দেখে তোমার পছন্দ হয়েছিল, এই তো কারণ?"

এবার উর্মিলার গণ্ডে লাল আভা দেখা দিল। এই রঙ্গপ্রিয়া মুখরা ননদটিকে প্রসঙ্গান্তরে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আচ্ছা সুবা, বিয়ের আগে তুমি ঠাকুর-জামাইকে দেখেছিলে?"

উর্মিলা সুবাসিনীকে কখনও সুবা-ঠাকুরঝি, কখনও সুবা বলিয়া সম্বোধন করিত। কখনও বলিত তুমি, কখনও বা তুই।

উর্মিলার প্রশ্নে সুবাসিনী প্রথমে একটু ইতস্তত করিল; তাহার পর হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "সত্যি কথা বলব?"

"বল না, তাতে দোষ কি?"

সলজ্জ-স্মিতমুখে সুবাসিনী কহিল, "দেখি নি, কিন্তু প্রায় দেখে ফেলেছিলাম। বিয়ের দিন যাই উনি এলেন, তোমরা তো যে যেদিকে পার বর দেখতে ছুটলে, আমি একলাটি কনে সেজে তোমার ঘরের পাশের ঘরে ব'সে ছিলাম। চেয়ে দেখি, সবাই চ'লে গিয়েছে, কেউ কোথাও নেই। বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস ধড়াস করছিল, আর কি রকম বর দেখতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হ'ল, ধাঁ ক'রে উঠে জানলার কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু অত ভিড়ে স্পষ্ট কিছু দেখতে পেলাম না—কার পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি এসে পিঁড়েয় ব'সে পড়লাম।" বলিয়া সুবাসিনী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিয়া উর্মিলা কহিল, "ওমা, তাই নাকি?—ধন্যি মেয়ে তো তুমি!"

লীলাও হাসিতে লাগিল।

সুবাসিনী কহিল, "আচ্ছা বউদি, সত্যি কথা বল, দেখবার জন্যে ভারি একটা আগ্রহ হয় না?"

উর্মিলা কহিল, "আমি কি ক'রে বলব বল? আমি তো আগেই দেখে রেখেছিলাম।"

এমন সময়ে শশিনাথ আসিয়া প্রবেশ করিল। কহিল, "কি বউদি, কিসের কমিটি হচ্ছে? তাহার পর খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন দেখিয়া বলিল, "উঃ, আজ যে বিষম ব্যাপার! ভোজ টোজ আছে নাকি?" সুবাসিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কি সুবা, হাতে সাদামত কি শুকিয়ে খড়খড় করছে?" লীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "লীলা যে একরাশ মলম, না, কি তৈরি করেছ!"

অকস্মাৎ শশিনাথের আবির্ভাবে ও প্রত্যেকের প্রতি এক-একটি উদ্ভট প্রশ্নে সকলেই প্রথমে একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল।

উর্মিলা কহিল, "ওটা ক্ষুধাদাহ-নিবারণী মলম।'

শশিনাথ কহিল, "তোমাদের অত হাসি হচ্ছিল কিসের? হাসির দাপটে আমাকে পড়ায় ভঙ্গ দিতে হ'ল। কি প্রহসনের অভিনয় চলছে দেখতে এলাম।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া উর্মিলা কহিল, "এখানে আমাদের একটা বিষয়ে তর্ক চলছিল। আমরা কিছুতেই স্থির করতে পারছি নে। তুমি যদি বিচার ক'রে দাও তো বলি।"

উর্মিলা যে ঠিক কি বলিতে চাহে বুঝিতে না পারিয়া সুবাসিনী ও লীলা তাহার মুখের দিকে সকৌতুকে তাকাইয়া রহিল।

শশিনাথ কহিল, "কি বল?"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "স্পষ্টবাদী ব'লে তোমার তো খুব জাঁক আছে—আচ্ছা, বল দেখি, আমাদের তিন জনের মধ্যে কার মুখ সব চেয়ে ভাল?"

ঊর্মিলার এই অদ্ভুত ও আজগুবি প্রশ্ন শুনিয়া লীলা বিস্ময়ে ও সঙ্কোচে লাল হইয়া উঠিল, সুবাসিনী মুখ লুকাইয়া নীরবে হাসিতে লাগিল, আর শশিনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চাহিয়া রহিল।

স্মিতমুখে ঊর্মিলা কহিল, "কি, চুপ ক'রে রইলে কেন? সাহস হচ্ছে না নাকি? তুমি তো বল, মনের যা অকপট ধারণা, তা অসঙ্কোচে প্রকাশ করা উচিত। এখন বল।"

দ্বিধাজড়িত-কণ্ঠে শশিনাথ কহিল, "শাস্ত্রের আদেশ আছে জান তো? সত্য কথা বলবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলবে না। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলে তা তোমাদের তিন জনের মধ্যে দুজনের পক্ষে অপ্রিয় সত্য হবে।"

ঊর্মিলা কহিল, "হোক অপ্রিয় সত্য, আমাদের শোনবার সাহস আছে, আর তোমার বলবার নেই।"

মৃদু হাসিয়া শশিনাথ বলিল, "তবে আমার ওপর যেন রাগ ক'রো না। আমার তো মনে হয় লীলারই মুখ সকলের চেয়ে ভাল।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া ঊর্মিলা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। সুবাসিনীও কোনও প্রকারে হাসি চাপিতে না পারিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। চাপা হাসির উত্তেজনায় তাহার সর্বশরীর কাঁপিতেছিল। আর লীলা লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া মাটিতে মিশাইয়া যাইবার উপক্রম করিল। অব্যবহিত পূর্বে যে সকল কথা হইয়াছে তাহার সহিত যুক্ত হইয়া শশিনাথের কথা লীলাকে লজ্জায় ও সঙ্কোচে অভিভূত করিয়া দিল।

তিন জনের ভাব দেখিয়া শশিনাথ সবিস্ময়ে স্মিতমুখে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর "নাঃ, মানুষকে যেমন ভূতে পায়, তেমনি তোমাদের আজ হাসিতে পেয়েছে।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। লীলার অবস্থা দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল যে, ঊর্মিলার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া সে নিজে কোন একটা ফাঁদে পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লীলাকেও অপ্রতিভ করিয়াছে।

৪

সন্ধ্যার পর হলঘরে নরেন্দ্র ও শশিনাথ তর্ক লাগাইয়াছিল। নরেন্দ্র বলিতেছিল, "এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না যে, বিয়ে না ক'রে সন্ন্যাসী না হ'লে সংসারের, বিশ্বমানবের বা সমাজের উপকার করা যায় না। সন্ন্যাসী হ'য়ে সংসার ত্যাগ করবে, সে তো প্রথমেই সংসারের ওপর একটা অত্যাচার ক'রে বসল। আত্মহত্যা ক'রে জগৎকে একটি প্রাণী হ'তে বঞ্চিত করা যে হিসাবে অন্যায় ও পাপ, সন্ন্যাসী হ'য়ে সমাজকে বঞ্চিত করা ঠিক সেই হিসাবে অন্যায় ও পাপ।"

শশিনাথ কহিল, "সন্ন্যাসী না হ'লে সংসারের কোন উপকার করা যায় না, এ কথা তোমাকে স্বীকার করতে বলছি নে। কিন্তু এ কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সন্ন্যাসী হয়েও সংসারের উপকার করা যায়। সন্ন্যাসী হওয়াকে আত্মহত্যার সঙ্গে তুমি তুলনা করছ; কিন্তু তুলনা তো আর যুক্তি নয়। আত্মহত্যায় জগৎ বাস্তবিকই বঞ্চিত হচ্ছে; সন্ন্যাসী হওয়ায় সংসার বঞ্চিত হচ্ছে না, নূতন ক'রে পাচ্ছে, এমন কি বেশি ক'রে পাচ্ছে। একটা হচ্ছে বর্জন, আর একটা বাস্তবিকই অর্জন।"

নরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "এক হিসেবে অর্জনই বটে। নিজের শান্তি আর স্বচ্ছন্দতা অর্জন। তুমি যাই বল শশি, সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্যে একটা স্বার্থপরতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আছেই। যে ভারটা মাথার ওপর আপনি এসেছে, সেটা বইব না—বইব সেইটে, যার জন্যে আমি অন্তত মুখ্যভাবে দায়ী নই। যারা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, তাদের মুখের দিকে চাইব না; তাদের ত্যাগ করে যাব ইহকালের দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আর পরকালে একটা বড় [illegible] পাবার মরীচিকায়। বৈরাগ্যকে

যারা অভয় বলে, আমি তাদের কাপুরুষ বলি। আমি অনুরাগকে আনন্দ বলি। যারা কাপুরুষ, তারা অভয় চায়—যারা নয়, তারা আনন্দ চায়।"

শশিনাথ কহিল, "আমার সন্ন্যাসের মূলমন্ত্রই হচ্ছে অনুরাগ—আনন্দ; বিরাগ নয়। সংসারের রুদ্রমূর্তি দেখে, দুঃখ-দৈন্য-যন্ত্রণা ভোগ ক'রে যারা পরিত্রাণের জন্যে গিরি-গুহায় ঢুকে তপস্যা করছে, তুমি তাদের স্বার্থপর দায়িত্বজ্ঞানহীন বা যা ইচ্ছে ব'লে যত পার গাল দাও, আমি তা নিয়ে এখন তর্ক করব না। কিন্তু আমার সন্ন্যাসী তো তা নয়। সে আপনার আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য যেমন সংসারের প্রতি নির্লিপ্ত-নিস্পৃহ, পৃথক,—সংসারের অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও মঙ্গলকামনায় সে আবার তেমনি সংসারেরই বুকে বাসা বেঁধেছে। সে সংযত, কিন্তু বিমুখ নয়।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া নরেন্দ্র মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কহিল, "বিমুখ নয় তাই বা বলি কেমন ক'রে? সমস্ত মানবজাতির অর্ধাংশকে যে ঘৃণা করে, ভয় করে, নারী আর অগ্নি—দুই যে সমান জ্ঞান করে, সে বিমুখ নয় তো কি?"

একরাশি বারুদে অগ্নি-সংযোগ করিলে তাহা যেমন মুহূর্তের মধ্যে ফস্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, নরেন্দ্রের কথা শুনিয়া শশিনাথ তেমনি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে সজোরে কহিল, "মিথ্যা কথা, কখনই নয়। নারীকে ঘৃণাও করি নে, ভয়ও করি নে, অগ্নিও ভাবি নে। যে নারীজাতির মধ্যে জননী-মূর্তি, কন্যা-মূর্তি, ভগ্নি-মূর্তি দেখতে পাই, সে নারীজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম পুরুষজাতির চেয়েও বেশি।"

পূর্বের মত মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্র কহিল, "সে তো বেশ কথা। কিন্তু পত্নী-মূর্তি দেখতে মনের মধ্যে বিভীষিকা দেখ কেন? পত্নী-মূর্তি না দেখলে কন্যা-মূর্তি দেখবে কেমন ক'রে? জননীরূপে যিনি গরীয়সী, পত্নীরূপে তিনি সর্বনাশী কেমন ক'রে হন?"

শশিনাথ কহিল, "সর্বনাশী তিনি একেবারেই হন না; কিন্তু সন্ন্যাসের পক্ষে তিনি মস্ত বিঘ্ন, তাই সন্ন্যাসীর পক্ষে পত্নীরূপে তাঁকে পাওয়া চলে না। মানুষ যত দিন বিয়ে না করে, ততদিন তাকে সংসারী বলা যায় না। বিয়ে হ'লেই সে পুরোদস্তর সংসারী হ'ল। এই জন্যে স্ত্রীকে চলিত-কথায় লোকে সংসার বলে, গৃহ বলে।"

তর্কের এই অবস্থায় উর্মিলা ঘরে প্রবেশ করিল। কাহার সহিত কি কথা কহিয়া আসিয়াছিল, দিনান্তের সন্ধ্যাকাশে অনুদ্দীপ্ত সূর্য-কিরণের মত তাহার মুখে কৌতুকহাস্যের বিলীয়মান রেখাটুকু তখনও মধুরভাবে লাগিয়া ছিল। উজ্জ্বল আলোকে তাহার সেই শান্ত নির্মল মূর্তিখানি দেখিয়া বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় উভয়ে অবাক হইয়া এক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল। শশিনাথের মুখ ভক্তি, প্রীতি ও আনন্দেপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে একটু উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "যে জাতির মধ্যে বউদিদির মত একজন মানুষ থাকতে পারে সে নারিজাতিকে ঘৃণা করব, এত বড় পাপী আমি নই।"

সহসা দেবরের মুখে এমন শ্রদ্ধা ও প্রীতির বাক্য শুনিয়া উর্মিলা বিস্ময়ে ও সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সলজ্জস্মিত–মুখে কহিল, "কেন ঠাকুরপো, আমি হঠাৎ কি অপরাধ করলাম!"

উত্তেজনার বশে ফস্ করিয়া একটা জমকালো রকমের কথা বলিয়া ফেলিয়া শশিনাথও একটু লজ্জিত বোধ করিতেছিল। ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "অপরাধ! অপরাধ তোমার অনেক আছে। তোমার প্রথম অপরাধ, তুমি গোকুল-পিঠে খুব চমৎকার করতে পার। তোমার দ্বিতীয় অপরাধ, ক্ষিধে না থাকলে তুমি খেতে বাধ্য কর। তোমার তৃতীয় অপরাধ, খাইয়ে খাইয়ে শরীর মোটা ক'রে দিয়েও মোটা হওয়া তুমি স্বীকার কর না। তোমার অনেক অপরাধ।"

এমন সময়ে সোমনাথ এমন-একটি সংবাদ বহন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, যাহাতে মুহূর্ত মধ্যে তর্কের স্রোত অন্য দিকে ফিরিয়া গেল।

হরিচরণ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করিতেন—ইন্‌ভ্যালিড পেন্‌শন লইয়া দুই-তিন মাস ধরিয়া চব্বিশ-পরগনার বিলাসপুরের বাড়িতে আছেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার অবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যাকে একটি কায়স্থ-যুবক পড়াইত। পরে প্রকাশ পায় যে, অন্ধ অবুঝ প্রেম এই দুইটি তরুণ-তরুণীকে গুরু-শিষ্যার বন্ধন হইতে কখন মুক্ত করিয়া দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলেটি সৎ এবং শিক্ষিত; এবং সমাজসংস্কারের যূপকাষ্ঠে একমাত্র দুহিতার আনন্দ ও সুখকে বলি দিবেন না বলিয়া হরিচরণবাবু সেই কায়স্থ-যুবকের সঙ্গেই হিন্দুমতে কন্যার বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা কিন্তু এই ব্যাপারে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। হরিচরণবাবুকে একঘরে তো করিয়াছেই, অধিকন্তু এই বলিয়া শাসাইয়াছে যে, বিবাহের রাত্রে বর-পক্ষকে গ্রাম হইতে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিবে—কিছুতেই গ্রামের মধ্যে ব্যভিচার ঘটিতে দিবে না। কলিকাতায় আসিয়া যে হরিচরণবাবু কন্যার বিবাহ দিবেন, সে পথও তাহারা রাখে নাই। বিলাসপুর হইতে নৈহাটি পাঁচ ক্রোশ পথ। গ্রামে দুইখানি ঘোড়ার গাড়ি ও কয়েকখানা গরুর গাড়ি আছে—গ্রামের জমিদার বলিয়াছে, যে-গাড়োয়ান হরিচরণবাবু বা তাঁহার কন্যাকে স্টেশনে পৌঁছাইবে, তাহার গৃহ জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, কন্যার বিবাহের জন্য যত না হউক, হরিচরণবাবুর চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে কলিকাতায় আসা আবশ্যক। সে পথ তো বন্ধই—এমন কি, গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার এবং পচা ঔষধের সহায়তা পাইবার উপায়ও নাই। গ্রামের দূষিত স্বাস্থ্য এবং কুটিল চক্রান্তের মধ্যে নিয়ত পিতার জীবন বিপন্ন ও কন্যার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে।

উত্তেজিত-স্বরে শশিনাথ কহিল, "হরিচরণবাবু পুলিসে খবর দিচ্ছেন না কেন?"

সোমনাথ বলিল, "সে সব করে কে! রুগ্ন শরীরের জন্যে অসময়ে পেন্‌শন

নিতে হয়েছে। আপনার বলতে তো ঐ মেয়েটি। আত্মীয় যারা আছে, তারা সকলেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে।"

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "হরিচণবাবু কি আপনাদের আত্মীয়?"

সোমনাথ বলিল, "না, সম্পর্ক কিছুই নেই। তবে তিনি বাবার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

শশিনাথ কহিল, "সেই সম্পর্কই যথেষ্ট। সেই সম্পর্কের খাতিরে আমরা তাঁকে তাঁর এ সৎকার্যে প্রাণপণ সাহায্য করব।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সোমনাথ কহিল, "সে সম্পর্ক না থাকলেও সাহায্য করার কোন বাধা ছিল না, যদি না ব্যাপারটার মধ্যে একটা গুরুতর সামাজিক সমস্যা জড়ানো থাকত।. কিছু না ভেবে-চিন্তেই যে আমাদের মন হরিচরণবাবুকে সাহায্য করবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠছে, এর কারণ হরিচরণবাবুর প্রতি গ্রামের লোকের জবরদস্তি। তাদের উপায়টা যদি এ রকম অত্যাচারি না হ'ত, তা হলে হয়তো তাদের উদ্দেশ্যটাকে অন্যায় ব'লে মনে হ'ত না।"

সোমনাথের কথা শুনিয়া শশিনাথ উত্তেজিত হইল উঠিয়া। তাহার বলিষ্ঠ দেহের ভিতর যে সবল ও সদয় হৃদয় বর্তমান ছিল, তাহা এককালে ক্রোধ ও করুণার আঘাতে তীব্রভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সে কহিল, " আমার কিন্তু ঠিক অন্য রকম মনে হচ্ছে। গ্রামের লোক যে ব্যাপারটায় বাধা দিচ্ছে, সেটা যদি অন্যায় হয়, তা হ'লে তাদের এ জবরদস্তিতেও কোন অন্যায় নেই, কারণ অন্য উপায় না 'থাকলে জবরদস্তি করেও ভাল কাজ করা ভাল। কিন্তু এ যে ঠিক উল্টো! একটা মানুষ প্রমাণ করতে চায় সে মানুষ আর কতকগুলো অমানুষ সব পণ্ড ক'রে দেবে?"

নরেন্দ্র কহিল, "তুমি কি এই বামুনের মেয়ের সঙ্গে কায়েতের ছেলের বিয়ে খুব পছন্দ করছ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শশিনাথ কহিল, "করছি নে? বিশেষভাবে করছি। মানুষের মাঝখানে মানুষ ব্যবধানের যে অন্যায় অস্বাভাবিক পাঁচিল গেঁথেছে,

তার প্রথম ইট যিনি খুলে দিচ্ছেন, সেই হরিচরণবাবুকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করছি। তুমি কি আশা কর, বামুনের মেয়ে আর কায়েতের ছেলের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক বন্ধন হ'তেই পারে না—এ অস্বাভাবিক নিয়ম চিরকালই থাকবে?"

সোমনাথ ধীরভাবে কহিল, "চিরকাল থাকবে না মেনে নিলেও এতদিনের পাঁচিল একদিনে ভাঙা যাবে না, ঠিক। তুমি কি মনে কর সমাজের মধ্যে বহুদিন ধরে আর বহুদর্শিতার পরিণামে এই-যে ব্যবধান-পার্থক্যের পাঁচিল-পরিখাগুলো দাঁড়িয়ে গেছে, সেগুলো লোপ পেলেই মানুষের চরম সুখ হবে? যদি কোন বিপ্লবের ফলে কোন দিন সেগুলো লোপ পায়, তার পরদিন থেকেই মানুষ আবার নতুন করে ব্যবধান-বাধা গড়তে আরম্ভ করবে। সমাজের মধ্যে কতকগুলো অনুশাসন চিরকালই থাকবে, আর অবস্থা বিশেষে কখনও সেগুলোকে একটু কঠোর বলেও মনে হবে। ছুরিতে সময়ে সময়ে হাত কাটে বলে ছুরি একেবারে হাতে করব না, এ কথা ঠিক নয়।"

এতক্ষণ চুপ করিয়া ঊর্মিলা সকলের কথা শুনিতেছিল, এবার সে কথা কহিল। স্বামী ও দেবরের তর্কের মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, বামুনের মেয়ের সঙ্গে কায়েতের ছেলের বিয়ে না হয় নাই হ'ল। কিন্তু গ্রামের লোকের জবরদস্তিতে তাঁরা যে অন্য সব অসুবিধে ভোগ করছেন, তার ব্যবস্থা তো তোমাদের করা উচিত।"

শশিনাথ কহিল, "শুধু সেইটুকুই আমাদের কর্তব্য নয় বউদিদি, সেই কায়েতের ছেলের সঙ্গে যাতে বিয়ে হয়, সে চেষ্টাও আমাদের করতে হবে। মেয়ের বাপ যখন কায়েতের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া স্থির করেছেন, তখন তিনি সব দিক ভেবে-চিন্তেই ঠিক করেছেন। পথের লোক তাতে বাধা দেয় কেন?"

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, "পথের লোক বাধা দিচ্ছে না, সমাজের লোক

বাধা দিচ্ছে। যতক্ষণ তুমি সমাজের মধ্যে আছ, ততক্ষণ সমাজ-শাসন মানতে বাধ্য।"

শশিনাথ কহিল, "কিন্তু এ-যে তা-ও নয়। এরা হরিচরণবাবুকে সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতেও দিচ্ছে না। কোন্ আইনের বলে, কোন্ বিধি-বিধানের জোরে এরা হরিচরণবাবুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর হাত দিতে চায়?"

সোমনাথের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নরেন্দ্র বলিল, "তুমি একটু ভুল করছ শশি। সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে হরিচরণবাবু মেয়ের বিয়ে দিতে ঠিক চাচ্ছেন না। তিনি হিন্দুমতেই কায়েতের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান।"

নরেন্দ্রের কথা শুনিয়া শশিনাথ সজোরে হাসিয়া উঠিল। সোমনাথের সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া ইতিপূর্বেই লীলা ও সুবাসিনী ঘরের মধ্যে আসিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

শশিনাথ নরেন্দ্রের কথায় উত্তরে কহিল, "বল কি হে? তুমি কি বলতে চাও, হিন্দুমতে বিয়ে দিলেই বিলাসপুরের সেই পাষণ্ডগুলোর সমাজে থাকা হ'ল? হিন্দুধর্ম এত সঙ্কীর্ণ? তুমি জান, বৈষ্ণব-সমাজ হিন্দুধর্মের বাইরে নয়—নানকপন্থী, গুরু গোবিন্দের সম্প্রদায়, আর্যসমাজ হিন্দুধর্মের বাহিরে নয়। এমন কি, ব্রাহ্ম-সমাজও হিন্দুধর্মের বাহিরে নয় বলা যেতে পারে।"

শশিনাথের এ কথায় কোন উত্তর নরেন্দ্র খুঁজিয়া পাইল না, উত্তর দিবার জন্য তাহার বিশেষ আগ্রহও ছিল না। কারণ, শশিনাথের মতের সহিত তাহার মত অভিন্ন না হইলেও বিশেষ বিভিন্ন ছিল না। মানুষের সৃষ্ট নিয়মের নির্বিচার অধীনতায় মানুষকে যে চিরকালই থাকিতে হইবে, কখনও সে তাহাকে যুক্তি ও ন্যায়ের হিসাবে পরীক্ষা করিবে না, এবং আবশ্যক বিবেচনা করিলে পরিবর্তন বা পরিবর্জন করিবে না—ইহা নরেন্দ্রের মত ছিল না।

নরেন্দ্রকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সোমনাথ বলিল, "হিন্দুদের সমাজ গোঁড়ার সমাজই হবে না কেন? বিশ্বের সমাজ থেকে পৃথক ক'রে একটা

বিশেষ সমাজকে যখন হিন্দু নাম দিচ্ছ, তখন সে সমাজে অন্য সমাজ থেকে পৃথক কিছু কিছু আচার ব্যবহার নিশ্চয়ই থাকবে। ইংরেজ সমাজকে তো আমরা খুব উন্নত মনে করি, কিন্তু সেও তো গোঁড়া সমাজ। একজন ইংরেজ তার খুড়তুতো বোনকে বিয়ে করতে পারে, অথচ শালীকে বিয়ে করতে পারে না, এর কোন যুক্তি দেখাতে পার কি!"

শশিনাথ কহিল, "যুক্তিহীন হ'য়ে চলাই কি বিশেষত্ব রক্ষা ক'রে চলা। মানুষের চেয়ে মানুষের নিয়মকে বড় ক'রে, চক্ষু বুজে বিচার-বিতর্ক না ক'রে চলাই কি সমাজের নাম রেখে চলা! চলা মানে যদি নিজের ইচ্ছাশক্তি আর বুদ্ধির সাহায্যে চলা হয়, তা হ'লে তাকে চলা বলা যায় না।"

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, "চলা মানে যদি প্রতিপদে নিজের ইচ্ছাশক্তি আর বুদ্ধির চালনার দ্বারা চলা হয়, তা হ'লে চলাই হয় না। মানুষকে জীবনে এত বেশি চলতে হয় যে, প্রতিপদে তার পথ বার ক'রে চলা চলে না। তাই এক যুগে পথ আবিষ্কৃত হয়, আর যুগযুগান্তর মানুষ সেই পথ ধরে চলে। এক যুগ তৈরি ক'রে, আর যুগে যুগে তার ফল ভোগ চলে।"

শশিনাথ কহিল, "কিন্তু যে পথ বার হয়েছে সেইটেই যে সর্বোৎকৃষ্ট পথ, তা না হ'তেও তো পারে। বহু লোক বহুদিন ধ'রে যে পথে চলে আসছে সেইটেই সর্বোত্তম পথ—এ সংস্কারের কথা, জ্ঞানের কথা নয়। তিন হাজার বছর আগে যে নিয়ম তৈরি হয়েছিল আজও তা সমাজের পক্ষে উপযোগী আছে, এ খুবই সন্দেহের কথা।"

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, "আর তিন হাজার বছর ধ'রে যে-নিয়মটা সমাজের দ্বারা পালিত হ'য়ে এসেছে সেইটে যে আজ একেবারে সমাজের পক্ষে হঠাৎ অনুপযোগী হ'য়ে উঠেছে, সেইটেই কি নিঃসন্দেহ?"

শশিনাথ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তা হলেই তো দাদা, বিচার-বুদ্ধির কথা এসে পড়ছে। নির্বিচারে পুরনো নিয়ম পালন করা তা হ'লে উচিত নয়। কিন্তু সে যাই হোক, এখন আলোচনা গবেষণার সময় নেই। এখন

প্রথম কাজ বিলাসপুরের লোকদের হাত থেকে হরিচরণবাবুকে রক্ষা করতে হবে। আমি কালই বিলাসপুর গিয়ে তাঁদের কলকাতায় নিয়ে আসব।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া ঊর্মিলা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাহার এই প্রবল ও প্রবণ দেবরটিকে সে বিলক্ষণ চিনিত। সে জানিত, শক্তির হিসাব করিয়া কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার অভ্যাস শশিনাথের নাই—সেই জন্য অধিকাংশ স্থলে দেহের বলের অভাব তাহাকে মনের বলের দ্বারা পূরণ করিতে হয়। সমস্ত গ্রামের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইয়া শশিনাথ নিজেকে নিরতিশয় বিপন্ন করিবে এই আশঙ্কায় ঊর্মিলা তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার ফলে শশিনাথ যখন একা যাইবে না, বরেনকেও সঙ্গে লইবে বলিয়া অঙ্গিকার করিল, তখন ঊর্মিলার উৎকণ্ঠা কিছুমাত্র হ্রাস না পাইয়া বরং বাড়িয়াই গেল। তাহার মনে হইল, অগ্নি একা ছিল, এবার তাহার সহিত ঘৃত সংযুক্ত হইল।

ঊর্মিলার উদ্বেগ দেখিয়া শশিনাথ সকৌতুকে কহিল, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বউদি, যেন আমাদের কোনো যুদ্ধযাত্রা করতে হবে! দোহাই তোমার, বিলাসপুরের কাপুরুষগুলোকে অকারণ এত বড় ক'রে দেখো না। আমার দেহের শক্তি আর মনের বল যদি আমার সঙ্গে থাকে তা হ'লে সারা বিলাসপুরের ম্যালেরিয়া-রোগী আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।"

সোমনাথ কহিল, "কায়েতের ছেলের সঙ্গে হরিচরণবাবুর মেয়ের বিয়ে আমার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হ'লেও সমাজের জুলুম থেকে হরিচরণবাবুকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। তবে জবুরদস্তির বিরুদ্ধে তোমরা যেন উল্টে জবরদস্তি ক'রে ব'সো না; আর এমন কোন কাজ ক'রো না, যাতে নিজেরা কোনো রকম বিপন্ন হও।"

সোমনাথ ও ঊর্মিলার কাছে শশিনাথ প্রতিশ্রুত হইল, তেমন কিছু করিবে না।

জগৎ সুরের লেনে সোমনাথদের একটি ভাড়াটিয়া বাড়ি ছিল। পুরাতন ভাড়াটিয়া উঠিয়া যাইবার পর গৃহটি মেরামত হইয়াছে কিন্তু এখনও নূতন ভাড়াটিয়া আসে নাই। স্থির হইল, সেই বাড়ি হরিচরণবাবুর বাসের জন্ম ঠিক করিয়া রাখা হইবে। পরদিন বিলাসপুর যাত্রার ব্যবস্থা করিবার জন্ম শশিনাথ বরেনের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

বরেন বাড়িতেই ছিল। সমস্ত কথা বলিয়া শশিনাথ উত্তরের প্রত্যাশায় তাহার মুখের দিকে আগ্রহভরে চাহিয়া রহিল।

বরেন শশিনাথের সমবয়স্ক, এবং বন্ধু বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় না, তাহাই। গৌরকান্তি, দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ, প্রশান্ত, কিন্তু দৃঢ় মুখের মধ্যে আভ্যন্তরিক শক্তির চিহ্ন মুদ্রিত। শশিনাথের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং অল্প ভাবপ্রবণ। সময়ের পূর্বেই ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখিবার ধৈর্য একেবারে নাই, কিন্তু কার্যকালে স্থির বুদ্ধির সাহায্যে কার্য করিয়া লয়।

শশিনাথের কাহিনী শুনিতে শুনিতে ক্রোধে ও ঘৃণায় বরেনের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দৃঢ়স্বরে কহিল, "নিশ্চয় যাব শশি, নিশ্চয় যাব। এ তুমি আবার জিজ্ঞাসা করছ কি ?"

তাহার পর দুই বন্ধুতে মিলিয়া পরামর্শ হইয়া গেল। স্থির হইল, সাধারণ বাঙালীর পরিচ্ছদে তাহারা যাইবে না, বেশ এবং ভঙ্গী এমনভাবে করিতে হইবে, যাহাতে গ্রামবাসীর মনে সহজেই একটা ভীতি উৎপাদিত হয়।

সমস্ত ঠিক করিয়া শশিনাথ যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

৫

পরদিন বেলা এগারোটার সময়ে শশিনাথ ও বরেন নৈহাটি স্টেশনে পৌঁছিল। হ্যাটকোট পরিয়া শশিনাথ পুরোদস্তুর সাহেব সাজিয়াছিল। বরেন কোট্‌প্যান্ট পরিয়া এবং মাথায় একটা অসম্ভব রকম বড় পাগড়ি জড়াইয়া চেহারাটা এমন করিয়া তুলিয়াছিল যে, প্ল্যাটফরমের অর্ধেক লোক তাহার দিকে সকৌতুক কৌতূহলের সহিত চাহিয়া ছিল। তাহার মুখের বাংলা ভাষা এবং মাথার পাঞ্জাবী-পাগড়ি কোন্‌টা তাহার নিজস্ব, তাহা তাহাদের কাছে প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছিল।

স্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়া শশিনাথ বিলাসপুর যাতায়াতের জন্য দুইখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিল।

একখানা গাড়ি শশিনাথ এবং বরেন, ও অপরখানা শশিনাথের অনুচর বীরণ সিং অধিকার করিল। শশিনাথ কহিল, "থানায় গিয়ে একটা কন্‌স্টেব্‌ল সঙ্গে নিলে কেমন হয়?"

নাসা-গহ্বরে নস্য ভরিয়া লইয়া বাকি নস্য হাত দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে শশিনাথের দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বরেন বলিল, "বল কি হে? মশা মারতে কামান দাগতে হবে? থানায় গিয়ে এ কথা বললে দারোগা যে হেসে উঠবে। গ্রামের লোক কি করবে না-করবে কিছু জানা নেই, গ্রামের একটা লোকের নাম পর্যন্ত জানি নে, অথচ থানায় গিয়ে কন্‌স্টেব্‌ল চাইব?"

বরেনের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া শশিনাথ হাঁকিয়া বলিল, "যানে দেও।" গাড়ি দুইটি বিলাসপুর অভিমুখে রওনা হইল।

গাড়ি ছাড়িতেই বরেন বলিল, "অযাচিত উপকার করতে তো চলেছ, কিন্তু গিয়ে যদি দেখ, এ উপকার কেউ চায় না ?"

শশিনাথ কহিল, "আমার কর্তব্য তা হ'লে তখনি শেষ হবে। কিন্তু সে তো হ'ল সহজ কথা, গিয়ে যদি দেখ গ্রামের লোকের হাত থেকে হরিচরণবাবু আর তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করা কঠিন ব্যাপার ?"

হাসিয়া উঠিয়া বরেন কহিল, "আমাদের কর্তব্য তা হ'লে তখনি আরম্ভ হবে। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক্। ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে, তখন যা ভাল বোঝা যাবে, করা যাবে।" বলিয়া গাড়ির কাঠে চাপড় মারিয়া তাল দিয়া গান ধরিল—'কতকাল পরে বল ভারত রে, দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে'।

বর্তমান অবস্থার সহিত এই গানের তাৎপর্যের কোন সঙ্গতি নির্ণয় করিতে না পারিয়া শশিনাথ নির্বাক হইয়া বাহিরের দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া রহিল। অগ্রহায়ণ মাস। মাঠে মাঠে ধান সোনালী রঙে পাকিয়া উঠিয়াছে। কোথাও কাটা আরম্ভ হয় নাই, কোথাও বা কৃষকেরা দলবদ্ধ হইয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ধান কাটিতেছে। ধান কাটিতে কাটিতে কেহ সরু মেঠো-সুরে গান ধরিয়াছে। হেমন্তের আকাশ চিরিয়া তাহাদের সেই মিহি করুণ তান শশিনাথের কর্ণে বিচিত্র সুরে বাজিতে লাগিল। আলের উপর দিয়া সরু পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া গ্রামের ভিতর গিয়া মিশিয়াছে। গ্রামের পাশে খামারে শস্য ক্রমশ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীর ধারে পাত্র-হস্তে চকিত-নেত্রে গ্রাম-বধূগণ। কলিকাতার কঠোরদৃশ্য-দর্শনক্লিষ্ট শশিনাথের চক্ষু বসুন্ধরার এই অব্যক্ত-মধুর শ্রী দর্শন করিয়া স্নিগ্ধ হইয়া গেল।

হঠাৎ গান ও সংগত বন্ধ করিয়া বরেন কহিল, "আজকের দিনটা কি জানি শশি, কেন আমার ভারি চমৎকার লাগছে! মনে হচ্ছে, একটা কি যেন অদ্ভুত কিছু করতে যাচ্ছি। নিত্যকার ধরা-বাঁধা জীবনটা কাটিয়ে হঠাৎ পুরোদস্তুর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে ঢুকে পড়ছি।"

বরেন্দ্রের কথা শুনিয়া শশিনাথ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আশ্চর্য বা অন্যায়

কিছুই মনে হচ্ছে না। কোন দিনই তো দশটা বেলায় ভাত খেয়ে এমন ক'রে বালিকা উদ্ধার করতে ছোট না।"

সহাস্যমুখে বরেন কহিল, "তা সত্যি। কিন্তু দেখ, ব্যাপারটা রোম্যাণ্টিক হ'ত, যদি তোমার জন্যে উদ্ধার করতে যেতাম। এ যেন একেবারে নীরস পরোপকার।"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "আরও রোম্যাণ্টিক্ হ'ত, যদি নিজের জন্যে উদ্ধার করতে যেতে।"

প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া তাহারা যখন ক্যাণ্ট বড়, না হেগল্ বড়—এই লইয়া ভীষণ তর্ক করিতেছিল, তখন গাড়ি দুইখানি ধীরে ধীরে বিলাসপুর গ্রামে প্রবেশ করিল। বেলা তখন দেড়টা।

উপর হইতে কোচম্যান হাঁকিয়া বলিল, "কোন্ দিকে যাব হুজুর?"

বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া শশিনাথ কহিল, "এই বিলাসপুর নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

অনতিদূরে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সহিত গাড়ি দুইখানি ও আরোহীদিগকে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। শশিনাথ হাত নাড়িয়া তাহাকে নিকটে ডাকিল। সে নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা বিলাসপুর তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হরিচরণ মুখুজ্জের বাড়ি কোন্ দিকে?"

সে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, "সোজা বরাবর গিয়ে ডান হাতি ভাঙতে হবে, তারপর—"

এমন সময় সম্মুখবর্তী গৃহ হইতে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে রুক্ষস্বরে কহিল, "থাম্ তুই, ফাজ্‌লামি করতে হবে না।" তাহার পর শশিনাথের দিকে চাহিয়া নম্রভাবে কহিল, "কার বাড়ি যাবেন মশাই?"

শশিনাথ কহিল, "হরিচরণ মুখুজ্জের বাড়ি।"

"কি প্রায়জেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?',

"না।"

আর কোন প্রশ্ন না করিয়া সেই ব্যক্তি গাড়ির আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। খানিকটা আসিয়া বাম দিকে একটা গলির ভিতর প্রবেশ করিল।

শশিনাথের কানে কানে বরেন বলিল, "এ লোকটার নিশ্চয় কু-মতলব আছে শশি। আমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে।"

শশিনাথ মুখ বাড়াইয়া কহিল, "ও লোকটি যে বললে ডান দিকে ; এদিকে যাচ্ছেন কেন ?"

পথপ্রদর্শক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ও একটা পাগল, ও কি জানে? আসুন আমি মুখুজ্জে মশায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই।" বলিয়া সে আবার অগ্রসর হইল।

বজ্র-গম্ভীর-স্বরে বরেন্দ্র হাঁকিল, "সবুর।"

গাড়ি দুইখানি মুহূর্তের মধ্যে থামিয়া গেল, বরেন গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে শশিনাথও নামিল।

সেই স্বেচ্ছাগত পথপ্রদর্শকের সম্মুখীন হইয়া বরেন টানিয়া টানিয়া বলিল, "তুমি ঘরে ওয়াপস্ যাও, নেহি মাঙ্তা হ্যায়। হামি আপনি তল্লাস করবে।"

বরেনের দীর্ঘাকৃতি ও দীর্ঘ পাগড়ি দেখিয়া এবং অদ্ভুত উর্দু ভাষা শুনিয়া সে লোকটি হঠাৎ বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহার পরই ঝুঁকিয়া বরেনকে এক দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল, "আগা সাহেব, হামি সত্য বলছি, ঝুট বলছি না, মুখুজ্জে মশায়কে দেখিয়ে দেবে।"

উচ্চৈস্বরে বরেন কহিল, "হামি চায় না তোমারে, তুমি চালিয়ে যাও।"

হ্যাট মাথায় দিয়া অগ্রসর হইয়া রক্তবর্ণ চক্ষু করিয়া শশিনাথ ইংরাজিতে সজোরে যাহা বলিল, তাহার একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া সে ব্যক্তির মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল।

একটা কিছু গোল বাধিয়াছে মনে করিয়া বীরণ সিং তাহার দীর্ঘ লাঠি লইয়া ব্যাঘ্রের মত কোচবক্স হইতে লাফাইয়া পড়িল।

কাঁদ কাঁদ হইয়া লোকটি শশিনাথের দিকে করুণভাবে চাহিয়া বলিল, "কি বলছ সাহেব?"

"টুমি ইংরাজি জানে না?"

"না।"

"টোমার নাম কি?"

শশিনাথের দিকে কাতরভাবে চাহিয়া সে ইতস্তত করিতে লাগিল।

বরেন হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "বোলো বোলো, জল্‌দি বোলো।"

"আজ্ঞে সদাশিব লাহিড়ি।"

শশিনাথ পকেটবুক বাহির করিয়া লিখিয়া লইল।

"টোমার বাপের নাম?"

"বাপ মারা গেছেন।"

পুনরায় বরেন হুঙ্কার দিল, "বোলো বোলো, জলদি বোলো।"

"আজ্ঞে, ৺যজ্ঞেশ্বর লাহিড়ি।"

বাপের নামও লেখা হইল। এমন সময়ে অদূরে এক ব্যক্তিকে আসিতে দেখা গেল, বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে, গৌরবর্ণ, মাথায় মস্ত টাক।

তাঁহাকে দেখিয়া সদাশিব তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "চাটুজ্জে মশাই শিগগির আসুন, ভয়ানয় বিপদ!"

শুনিবামাত্র চাটুজ্জে মশাই থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কেন?"

সদাশিব চীৎকার করিয়া বলিল, "এই আগা সাহেব আর এই সাহেব হরিচরণ মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার বাড়িতে বসিয়ে মুখুজ্জে মশাইকে

খবর দোব মনে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলুম, আর এঁরা আমার নাম ধাম সব লিখে নিচ্ছেন!"

"মুখুজ্জে-বাড়ি যাবে, তা আমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলে কেন?" বলিয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া চাটুজ্জে মশাই পাশের বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িলেন।

"উস বাবুকা নাম কি আছে?"

সদাশিব কহিল, "বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গ্রামকা জমিদার।"

পকেটবুকে নাম লিখিয়া লইয়া শশিনাথ তর্জনী নাড়িয়া কহিল, "এবার যদি টুমি ঠিক জায়গায় না নিয়ে যাবে তো হামি তোমাকে চালান করবে।"

"আজ্ঞে, চলুন না।" বলিয়া সদাশিব কাতরভাবে পথ দেখাইয়া চলিল। প্রথম লোকটি যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঠিক, ডান দিকে যাইতে হইল। কিয়দ্দূর গিয়া একটি বাড়ি দেখাইয়া দিয়া সদাশিব বলিল, "এই বাড়ি।"

একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ, সংস্কারের অভাবে কতকটা জীর্ণ। সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গা, মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটা অযত্ন-রক্ষিত ফুলের গাছ। বাড়ির পাশে পুষ্করিণী, তাহার চতুর্দিকে সারিবদ্ধ নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ। বাড়ির অপর দিকে রাঙচিতার বেড়া ঘেরা একটি ছোট ফলের বাগান। একটা পেয়ারাগাছ হেলিয়া রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, কয়জন লোভী বালক ঢিল ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া কাঁচা পেয়ারা পাড়িতেছে।

বরেনের আদেশে সদাশিব চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মুখুজ্জে মশাই, একবার বাইরে আসুন।" গলা শুকাইয়াছিল বলিয়া কণ্ঠস্বর ভাল বাহির হইল না। তাহার পর হস্ত-নির্দেশে পুষ্করিণীর দিকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে পুকুরে মুখুজ্জে মশাইয়ের মেয়ে রয়েছে।"

শশিনাথ ও বরেন চাহিয়া দেখিল, একটি পনেরো ষোল বৎসরের বালিকা পুষ্করিণীতে আচমন করিতেছে।

সদাশিব বলিল, "মুখুজ্জে মশাই নিশ্চয় ঘুমুচ্ছেন, মেয়েকেই ডাকব?"

ডাকিতে হইল না, মেয়েটি উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সদর-দ্বারে লোকজন ও গাড়ি দেখিয়া কৌতূহল সহকারে চাহিয়া রহিল। দুই দিকে কেয়ারি করা ইট বসানো সরু পথ ঘুরিয়া পুষ্করিণীর দিকে গিয়াছে। সদাশিবকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া শশিনাথ ও বরেন সেই পথ ধরিয়া বালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মেয়েটি যে সুন্দরী, তাহা দূর হইতেই বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু নিকটে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যুবকদ্বয়ের মুগ্ধ দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া বালিকার সৌন্দর্যের উপর আবদ্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সলজ্জ-কুণ্ঠিত ভাবে চেতনা লাভ করিয়া শান্তস্বরে শশিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি হরিচরণ মুখুজ্জে মহাশয়ের কন্যা?"

মৃদুকণ্ঠে বালিকা কহিল, "হ্যাঁ।"

শশিনাথ হাসিমুখে কহিল, "আমাদের দুজনের এই অভদ্র পোশাক দেখে অবাক হয়েছেন, কিন্তু এ রকম পোশাক না থাকলে আজ আপনাদের বাড়ি বের করা কঠিন হ'ত। আপনার বাবা বাড়ি আছেন?"

"আছেন।"

"আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমাদের অনাত্মীয় ভাববেন না। পরিচয় পেলে বুঝতে পারবেন আমরা আপনাদের আপনার লোকই। সদর-দরজায় গিয়ে আমরা দাঁড়াচ্ছি—আপনি গিয়ে একবার হরিচরণবাবুকে খবর দিন।"

মৃদুকণ্ঠে বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলব তাঁকে?"

"বলবেন, স্বর্গীয় বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে শশিনাথ দেখা করতে এসেছে।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া বালিকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল "এখন আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি। আপনাকে দেখেই চেনা ব'লে মনে হয়েছিল। আপনার ফোটো আমাদের বাড়িতে আছে।"

বিস্মিত হইয়া শশিনাথ কহিল, "আমার ফোটো।—বাবার সঙ্গে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

বরেনের দিকে চাহিয়া শশিনাথ কহিল, "ইনি আমার বন্ধু ও আত্মীয় বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।"

নম্রভাবে বালিকা উভয়কে অভিবাদন করিল। কহিল, "বাবা জেগেই আছেন, চলুন, এই পথ দিয়ে আপনাদের নিয়ে যাই।"

বরেন জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও তাঁর অসুখ বেশি কি?"

"খুব বেশি। আসুন।" বলিয়া অগ্রসর হইল।

শশিনাথ ও বরেনকে গমনোদ্যত দেখিয়া, সদাশিব চীৎকার করিয়া কহিল, "আগা সাহেব, হাম যায়গা?"

বরেন হস্তের ইঙ্গিতে যাইতে আদেশ দিল।

"সাহেব, হামারা নাম কেটে দিন।"

শশিনাথ পকেটবুক বাহির করিয়া নাম কাটিয়া দিবার ভঙ্গী করিল।

সদাশিব দূর হইতে উভয়কে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

বরেন হাসিয়া কহিল, "এই তো তোমার বিলাসপুরের বীরের নমুনা!"

শশিনাথ স্মিতমুখে কহিল, "জমিদারটি আরো। সামনে এসে সে একটা তালও ঠুকলে না!"

বরেন তাহার মাথা হইতে দীর্ঘ পাগড়িটি খুলিয়া চাদরের মত ভাঁজ করিয়া লইল।

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "আগা সাহেবের যে আগা গেল!"

বরেন হাসিতে হাসিতে কহিল, "কিন্তু গোড়া বাঁচল।"

৬

খিড়কি-দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া, একটা সরু পথ অতিক্রম করিয়া শশিনাথ ও বরেন গৃহাঙ্গনে আসিয়া পড়িল। নিস্তব্ধ গৃহ; অপ্রশস্ত উঠানের এক ধারে একটা শিউলিফুলের গাছের তলায় তখনও একরাশ বাসি ফুল ঝরিয়া পড়িয়া আছে। উঠানের মাটি অত বেলাতেও শিশিরে ভেজা, তাহা হইতে একটা বদ্ধ সোঁতা গন্ধ উঠিতেছে।

উঠান পার হইয়া সিঁড়ি বহিয়া শশিনাথ ও বরেন দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হইল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বালিকা ডাকিল, "বাবা!"

"কি বাবা?" হরিচরণ আদর করিয়া কন্যাকে সময়ে সময়ে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন।

"এঁরা এসেছেন।"

"কারা?"

শশিনাথ ও বরেন ঘরে প্রবেশ করিয়া হরিচরণবাবুকে নত হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। হরিচরণ তাড়াতাড়ি শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বিস্মিতভাবে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "কই, চিনতে পারছি নে তো?"

মৃদু হাসিয়া শশিনাথ বলিল, "আজ্ঞে, আমি শশিনাথ, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের—"

শশিনাথকে আর অধিক বলিতে হইল না। বন্ধু-পুত্রকে চিনিতে পারিয়া হরিচরণ বিশেষ প্রীত হইলেন এবং শশিনাথের নিকট বরেনের পরিচয় পাইয়া তাহাকেও সযত্নে আহ্বান করিলেন। তাহার পর কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সরযূ, শীঘ্র এদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর মা।"

খাওয়ার ব্যবস্থা মানে সকালবেলার পরিশ্রমের পর সরযূর কতখানি পরিশ্রম, তাহা মনে করিয়া শশিনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমরা ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না—আমাদের খাওয়ার এখন একেবারে দরকার নেই।"

হরিচরণবাবু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি ভাবছ খাবারের ব্যবস্থা করতে হ'লে সরযূকে কষ্ট দেওয়া হবে। একটু পরেই তোমরা বুঝতে পারবে সে বিষয়ে ও কত মজবুত।" তাহার পর কন্যার প্রতি গভীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমার এ রুগ্ন জীর্ণ দেহটাকে খাইয়ে-দাইয়ে ও যে-রকম ক'রে খাড়া ক'রে রেখেছে, ওর মা-ও বোধ হয় তেমন পারতেন না।"

শশিনাথ ও বরেন প্রশংসমান-চক্ষে চাহিয়া দেখিল, সরযূর নিটোল সুন্দর মুখখানি প্রত্যুষের আকাশের মত রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। মৃত জননীর উল্লেখে স্নিগ্ধ চক্ষুদুইটি ছলছল করিতেছে। তরুণ যুবকদ্বয় তাহাদের সম্মুখস্থিত বিশ্বশিল্পীর এই মনোরম চিত্রের প্রতি ক্ষণকাল অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। এই কমনীয় আবরণের অন্তরস্থ সেবাপরায়ণ স্নেহশান্ত নারী-হৃদয়ের পরিচয়ে তাহাদের সকল শ্রম এবং শ্রান্তি সার্থকতার সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়া গেল। অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এতক্ষণ যেখানে শুধু কর্তব্যের প্রেরণা ছিল, সৌন্দর্যের এই স্বর্ণপ্রতিমার লাবণ্য ও মাধুর্য তথায় উদ্দীপনা লইয়া আসিল।

পিতার প্রশংসা-বচন ও আগন্তুকদ্বয়ের মুগ্ধ দৃষ্টি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সরযূ গমনোদ্যত হইয়া কহিল, "বাবা, খাবার করতেও তো খানিকক্ষণ সময় যাবে, আমি উদ্যোগ করিগে?"

ব্যস্ত হইয়া সরযূকে লক্ষ্য করিয়া শশিনাথ বলিল, "অনর্থ এখন কষ্ট করবেন না; যখন দরকার হবে, আমরা নিজেরাই আপনাকে জানাব।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া হরিচরণ বলিলেন, "তুমি সরযূকে 'আপনি' বলছ, এতে সরযূ দুঃখিত না হলেও আমি হচ্ছি। সরযূ তোমার চেয়ে পাঁচ-ছ বছরের ছোট ব'লেই নয়, বিশুর সঙ্গে আমার যে রকম হৃদ্যতা ছিল, তাতে সরযূ তোমার

উপর বোনের চেয়ে কম দাবি করতে পারে না। অবশ্য এ কথা ভাল ক'রে তুমিও জান না, সরযূও জানে না।" বলিয়া হরিচরণ হাসিতে লাগিলেন।

মৃদু হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "এখন থেকে সবযূকে আমি ছোট বোন ব'লেই জানব।" তারপর সরযূর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি যখন তোমার দাদা হলাম সরযূ, তখন তো আর সঙ্কোচের কথা রইল না। যখন চাইব, তখন খাবার দিয়ো।"

শশিনাথের বাক্যে সরযূর মন প্রীতি ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল, এবং তাহার অন্তরের সেই অব্যক্ত কাহিনী ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্যে প্রকাশ-লাভ করিল। এই সদ্য স্থাপিত ভ্রাতৃত্বের মধুর রসে তাহার হৃদয় সহসা এমনই সিক্ত হইয়া উঠিল যে, কেবলই তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, শশিনাথকে 'দাদা' বলিয়া ডাকে, কিন্তু নূতনত্বের সঙ্কোচ সে বিষয়ে অন্তরায় হইয়া রহিল।

বরেনের দিকে চাহিয়া হরিচরণ সহাস্যে কহিলেন, "ছেলেবেলায় পড়েছ—Things which are equal to the same thing are equal to one another—সে হিসাবে তুমিও সরযূর দাদা।"

সহাস্যে বরেন কহিল, "সে হিসাব আমি আগেই করে রেখেছি।"

তাহার পর নানা প্রকার কথাবার্তার মধ্যে সরযূ যখন কার্যোপলক্ষে অন্যত্র উঠিয়া গেল, তখন শশিনাথ তাহাদের আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্য জানাইল। যুবকদ্বয়ের কথা শুনিতে শুনিতে হরিচরণের রুগ্ন পাংশু মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি প্রথমে তাহাদিগকে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইলেন, পরে ক্রমে ক্রমে সরযূর বিবাহঘটিত অবস্থা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিলেন।

সর্বত্র যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। সংবাদটা কলিকাতায় যে আকারে উপনিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অতিরঞ্জনটুকু বাদ দিলে ঘটনাটি এইরূপ দাঁড়ায়—কন্যার মঙ্গল ও সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই যে হরিচরণ এ

বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। তিনি ছেলেটির প্রতি চাহিয়াই স্বীকৃত হইয়াছেন। সে যখন বিহ্বল হইয়া তাহাকে জানায় যে, এ বিবাহ না হইলে তাহার জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহার যখন সে কথা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন তিনি সামাজিক সংস্কারের যূপকাষ্ঠে একটি জীবনের সুখশান্তিকে বলি দেওয়া সমীচীন মনে করেন নাই। ছেলেটির নাম প্রকাশ-চন্দ্র বসু—প্রোফেসারি করে, চমৎকার ছেলে—একটা মানুষের মত মানুষ। তাহার প্রতি সরযূর মানসিক অবস্থা কি, তাহা হরিচরণ ঠিক অবগত নহেন। তবে এ কথা জানেন যে, প্রকাশ যখন প্রথম তাঁহার নিকট আসিয়া পড়ে, তখনও সরযূ তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল না। হরিচরণের প্রতি গ্রামবাসীর অত্যাচারের কথা তাহারা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সর্বতোভাবে না হইলেও অনেকটা সত্য। ধোপা নাপিত বন্ধ, পাচক ও ভৃত্য কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে, গ্রামের ডাক্তার জমিদারের শাসনে চিকিৎসা বন্ধ করিয়াছে। শুধু প্রতিবেশিনী পাঁচুর মা এই বিপদে সকলের শাসন-নিষেধ উপেক্ষা করিয়া দুই বেলা এই বিপন্ন ব্রাহ্মণ-পরিবারের যথাসাধ্য সেবা করিয়া যাইতেছে, নতুবা সরযূকে বাসন মাজিতে, জল তুলিতেও হইত। প্রথম যে-দিন পাঁচুর মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজ করিতে আসিয়াছিল, সেদিন সরযূ বলিয়াছিল, "না পাঁচুর মা, আমার কোন কষ্ট হবে না। শেষকালে আমাদের জন্যে তুমি বিপদে পড়বে।" সরযূর কথা শুনিয়া পাঁচুর মা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়াছিল, "বল কি দিদিমণি, পরকালের ভয় কি একেবারেই নেই যে, আমরা দাসদাসী দাঁড়িয়ে দেখব—তুমি বামুনের মেয়ে বাসন মাজছ, জল তুলছ? আমি কাউকে ভয় করি নে। আমি তো বামুন-কায়েত নই দিদিমণি, যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অত্যাচারটা দেখব।"

হরিচরণের মুখে সকল কাহিনী শুনিয়া শশিনাথ সেই দিনই বৈকালের গাড়িতে কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করিল, এবং পাছে গ্রামের লোকের

অজ্ঞাতসারে যাওয়ার পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটে, সেই আশঙ্কায় তাহারা নৈহাটি হইতে যাতায়াতের ভাড়া করিয়া দুইখানি গাড়ি আনিয়াছে, তাহাও বলিল।

অত শীঘ্র কলিকাতা যাওয়ার কল্পনা প্রথমে হরিচরণ অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পর যখন দেখা গেল যে, দুই দিন পূর্বে কলিকাতা যাওয়ায় ক্ষতি নাই, কারণ অপর কিছুর জন্য না হইলেও হরিচরণের চিকিৎসার জন্য সত্বর কলিকাতা যাওয়া আবশ্যক এবং কলিকাতায় থাকিবার ব্যবস্থাও শশিনাথ স্থির করিয়া আসিয়াছে, তখন হরিচরণ সম্মত হইলেন। স্থির হইল যে, সে দিন যাওয়া সম্ভব নহে, পরদিন আহারাদির পর যাওয়া হইবে। অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে গাড়োয়ানেরা একদিন থাকিতে স্বীকৃত হইয়া ঘোড়া খুলিয়া দিয়া আহারাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইল।

সন্ধ্যার পর শশিনাথ ও বরেন হরিচরণের সহিত গল্প করিতেছিল। রান্নাঘরের একদিকে পরিষ্কার করিয়া দুই খানি আসন পাতিয়া জল দিয়া একটি লণ্ঠন সম্মুখে রাখিয়া সরযূ তাহাদিগকে খাইতে ডাকিল।

আসন গ্রহণ করিয়া সরযূর দিকে চাহিয়া শশিনাথ সহাস্যমুখে কহিল, "এত খাবার করেছ সরযূ তা হ'লে কলকাতায় গিয়ে যখন আমাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে, তখন আর বেশি কি খাওয়াবে!"

সলজ্জ মৃদু হাসিয়া সরযূ কহিল, "বেশি তো কিছুই করি নি।"

"এ যদি বেশি না হয় তা হলে বলতে চাও যে তুমি আমাদের অতিশয় পেটুক ঠাউরেছ!"

খাইতে খাইতে শশিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "সরযূ তুমি আগেও রাঁধতে জানতে, না, বামুন ছেড়ে যাওয়ার পর রাঁধতে শিখেছ!"

শান্তস্বরে সরযূ কহিল, "আগেও রাঁধতুম।"

"তা বুঝেছি নইলে এত চমৎকার রান্না হয় না।"

শশিনাথের প্রশংসায় সরযূ লজ্জিত হইয়া চুপ রহিল।

নিবিষ্ট-মনে বরেন আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শশিনাথের কথা শুনিয়া হাসিয়া সরযূকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "রান্না কেমন হয়েছে, সেটা আমার আর বলবার দরকার করে না। আমি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছি। রবিবাবু একখানা ছেলেদের বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, বইখানি ছেলেদের উপযোগী হয়েছে কি না এই থেকে জানা যায় যে, এক ঘণ্টার মধ্যে ছেলেরা বইখান ছিঁড়ে শেষ করেছিল। সেই রকম খাবার যদি অল্প সময়ের মধ্যে খেয়ে শেষ হ'য়ে যায়, তা হ'লে বুঝতে হবে যে, খাবারটা খুবই চমৎকার হয়েছে।"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে বাক্যে আর ব্যবহারে দু রকমেই প্রমাণ হ'ল যে, তোমার রান্না ভাল হয়েছে। ব্যবহারের প্রমাণ আমিও দোব, তবে বরেনের মত অত তাড়াতাড়ি নয়।"

বরেন হাসিয়া কহিল, "অত বেশিও নয়।" বলিয়া বাকি দুই-তিন-খানা লুচির মধ্যে একখানা লুচি তরকারির সহিত মুখে পুরিয়া দিল।

সরযূ তাড়াতাড়ি আরও কতকগুলো লুচি বরেনের পাত্রে দিল। স্ফীতমুখে অস্পষ্টভাবে বরেন একটা কি বলিল, ঠিক বুঝা গেল না। তাহার পর নিরাপত্তিভরে একটির পর একটি করিয়া লুচিগুলি গলাধঃকরণ করিতে লাগিল।

বক্রভাবে বরেনের দিকে চাহিয়া শশিনাথ বলিল, "পাড়াগাঁয়ের নিন্দে তো খুব করছিলে, কিন্তু একদিনের চেঞ্জেই ক্ষিধে বেড়েছে দেখছি!"

অপ্রতিভ হইয়া সরযূ কহিল, "না, বেশি দিই নি তো।"

অম্লান গম্ভীর-মুখে সরযূর দিকে চাহিয়া বরেন বলিল, "ওর কথায় লজ্জিত হবেন না। ভগবানের কৃপায় ডিসপেপ্‌সিয়া লিখতে গেলেও আমার বানান ভুল হয়। আমি এই রকমই খেয়ে থাকি। আপনি বরং কলকাতা গিয়ে আমাকে খাইয়ে দেখবেন—আমি এর চেয়ে কম খাব না।"

মৃদুহাস্যে সে কথার উত্তর দিয়া সরযূ মিষ্টান্ন আনিতে অন্য ঘরে গেল।

বরেনের শূন্যপাত্রের দিকে চাহিয়া শশিনাথ বলিল, "কি হে, এ কিস্তিও যে শেষ ক'রে ফেললে?"

বরেন হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই, বাস্তবিকই ভারি খিধে পেয়েছিল। তুমি যা বলছ, তাই হ'ল নাকি? চেঞ্জ লাগল?"

শশিনাথ স্মিতমুখে কহিল, "কিংবা ভাল লাগল।"

"কি? রান্না?"

"কিংবা রাঁধুনী।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া বরেন মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তা যদি বল, তা হ'লে রান্নার চেয়ে রাঁধুনী আমার ঢের ভাল লেগেছে। যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি! এ যেন ঠিক বিলাসপুর-পাঁকের পদ্মটি।"

শশিনাথ হাসিয়া বলিল, "বাস্তবিকই অদ্ভুত, নইলে তোমার মত লোকের মুখ দিয়ে কাব্যের ভাবা বেরোয়!"

দুইখানি রেকাবে মিষ্টান্ন ও ক্ষীর লইয়া প্রবেশ করিয়া সরযূ দেখিল, বরেনের পাত্রখানি একেবারে পরিষ্কার—ঠিক যেন মাজিয়া ঘষিয়া তকতকে। উভয়ের সম্মুখে রেকাব দুইখানি রাখিয়া সরযূ তাড়াতাড়ি লুচির পাত্র আনিয়া কয়েকখানি লুচি বরেনের পাত্রে দিল। তাহার পর ব্যঞ্জন লইয়া আসিল।

হাত বাড়াইয়া বাধা দিয়া বরেন কহিল, "আপনাকে জানানো দরকার যে, আমার একটা বদ্ অভ্যাস আছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি খাই, আর পাতে

কোন জিনিস ফেলে রাখি নে। কিন্তু তাই ব'লে বারম্বার যদি আপনি এই রকম দিয়ে যান, তা হ'লে হয় আপনার লুচি ফুরোবে, নয় আমার ধৈর্য ফুরোবে। এ কখানা লুচি তরকারি দিয়ে যদি খাই, তা হ'লে তো ক্ষীর খাবার সময়ে আবার আপনি লুচি দেবেন? তা আর দরকার নেই; এ কখানা আমি কোন রকমে শেষ করব।"

বরেনের কথায় শশিনাথ হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ক্ষীর খাবার সময়ে লুচি দিতেই হবে, এ নিয়ম তুমি কোথায় পেলে?"

স্মিতমুখে শশিনাথের দিকে চাহিয়া বরেন বলিল, "আমার রুচির কাছে।"

আহারের পর হরিচরণের সহিত অর্ধ-ঘণ্টাকাল গল্পের পর বরেন ও শশিনাথকে সরযূ শয়নের জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল।

হরিচরণের পাশের ঘরেই উভয়ের শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দুইখানি পাশাপাশি খাটের উপর দুইটি পরিচ্ছন্ন সাদা ধবধবে বিছানা পাতা। চাদর, মাথার বালিশ, পাশ বালিশ—কোথাও একটুও মালিন্য বা খুঁত নাই। নিকটেই একটি ছোট টেবিলের উপর কাট্-গ্লাসের পল-কাটা বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছে। তাহা হইতে অনুজ্জ্বল স্নিগ্ধ-রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে। টেবিলের উপর একটি কাচের ও একটি কাঁসার গেলাস। নিম্নে একটি মৃন্ময়-পাত্রে পানীয় জল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া এমন সুব্যবস্থা দেখিয়া, ও এই সকল সহজ অথচ সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যে দুইখানি কমনীয় হস্তের নিষ্ঠা ও যত্ন স্পষ্ট অনুভব করিয়া বরেন ও শশিনাথের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সমস্ত দিনের অনভ্যস্ত উদ্যম ও পরিশ্রমে ক্লান্ত তাহাদের দেহ এই শান্ত বিশ্রামের ক্রোড়ে আশ্রয়লাভের কল্পনায় তৃপ্তি বোধ করিল।

ঘরের বাহির হইতে সরযূ কহিল, "আর কিছু চাই কি?"

স্নিগ্ধ-কণ্ঠে শশিনাথ কহিল, "চাই,—তোমাকে অব্যাহতি দিতে চাই। সমস্ত দিন তুমি আমাদের জন্য পরিশ্রম করছ, এবার গিয়ে তুমি বিশ্রাম কর।"

তাহার পর ব্যগ্র হইয়া শশিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে সরযূ?"

মৃদুস্বরে সরযূ কহিল, "না।"

"ছি ছি! দেখ দেখি! খেয়ে নিয়ে আমাদের শোবার ব্যবস্থা করলেই তো হ'ত!"

মৃদু হাসিয়া সরযূ কহিল, "তা হোক। এতে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

"আচ্ছা, আর দেরি ক'রো না, যাও তুমি।"

সরযূ প্রস্থান করিলে বরেন তাহার দেহকে একটা শয্যার উপর যতটা সম্ভব দীর্ঘ ও ঋজুভাবে ঢালিয়া দিয়া কহিল, "আঃ!"

জলের গ্লাসে জল ঢালিতে ঢালিতে শশিনাথ কহিল, "কাল কটার গাড়িতে যাওয়া যাবে বরেন?"

পাশ ফিরিয়া শুইয়া বরেন বলিল, "তা হচ্ছে না, কালকের কথা কাল হবে। এখন কোন কথা কচ্ছি নে; ঘুমব, বড্ড ঘুম পেয়েছে।"

তাহার পর জল খাইয়া, একটা জানালা খুলিয়া দিয়া, বাতি নিবাইয়া শয্যায় আসিয়া শশিনাথ যখন জিজ্ঞাসা করিল, "কি বরেন, ঘুমোলে না-কি?" তখন নিদ্রিত বরেন এমন একটা পরিণত অবস্থার স্বপ্ন দেখিতেছিল, উপস্থিত যাহার কোন সম্ভাবনা দৃষ্টি-গোচর ছিল না।

প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া বরেন দেখিল, নীচে সরযূ ও পাচুর মা গৃহকর্ম করিতেছে। শশিনাথ নিদ্রাগত, হরিচরণও তখন উঠেন নাই। সরযূর পরিধানে একটি মামুলি সেমিজ ও এক খানি চওড়া লালপাড় শাড়ি। আঁচলখানি ঘুরাইয়া কোমরে জড়ানো। হাতে কয়েকগাছি সোনার গোখরি চুড়ি, গলায় একগাছি সরু হার। তখনও সূর্যোদয় হয় নাই—অনুদিত সূর্যের স্বর্ণকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া আকাশ পৃথিবী রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। সেই রশ্মিজালের মধ্যে উদ্ভাসিত সরযূর অমল মূর্তিখানি দেখিয়া বরেন আর একবার নূতন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার

সম্ভনিদ্রামুক্ত চক্ষে মনে হইল, উষা মূর্তিমতী হইয়া গৃহাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বরেনকে বারান্দায় দেখিয়া পাঁচুর মা কহিল, "বাবু, মুখ ধোয়ার সব ব্যবস্থা এখেনে রেখেছি।"

বরেন নীচে অসিতেই সরযূ স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে ঘুমের অসুবিধা হয় নি তো?"

প্রশান্তমুখে বরেন কহিল, "আপনি চ'লে আসবার দুমিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তারপর এই উঠে আসছি। অসুবিধে হলেও বুঝতে পারি নি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

সরযূ কহিল, "কোনো বিষয়ে অসুবিধা হ'লে বলবেন।"

সহাস্যমুখে বরেন কহিল, "দ্বিধা সঙ্কোচ ব্যাপারটা আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে কারো নেই—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন; কিন্তু আপনি যদি সর্বদা আমাদের জন্য এ রকম ব্যস্ত হয়ে থাকেন তা হলে কিছু বলবার অবসর আমরা পাই কেমন করে?"

সরযূর মুখে ক্ষীণ মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, "বাবা শয্যাগত—এ পাড়াগাঁয়ে কোনো জিনিস পাওয়া যায় না, ইচ্ছা থাকলেও যত্ন করবার যো নেই।"

বরেন হাসিয়া কহিল, "কিন্তু জিনিসের অভাবে আপনার যত্ন তো এক মুহূর্তও অপেক্ষা করে থাকছে না, আর আপনার যত্নে জিনিসের অভাবও তো আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।"

সরযূর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একবার বরেনের দিকে চাহিয়া পর-মুহূর্তেই নতনেত্র হইয়া কহিল, "আপনি আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন?"

বরেন পূর্বেই ভাবিয়া দেখিয়াছিল শশিনাথেরও তুলনায় তাহার সহিত সরযূর সম্পর্ক এত সুদূর যে শশিনাথ 'তুমি' বলিতেছে বলিয়াই সরযূর মত বয়স্কা মেয়েকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করা তাহার পক্ষে অসঙ্গত; তাই সে হাসিয়া

কহিল, "তার জন্যে কিছু মনে করবেন না। 'তুমি' বলতে যে-দিন আমার মুখে বাধবে না সে দিন আপনিই 'তুমি' বলব।"

এ বিষয়ে আর কোনও কথা না বলিয়া সরযূ কহিল, "আপনার চা তৈরি করব কি?"

বরেন কহিল, "শশি এখনও ওঠে নি—সে উঠলে একসঙ্গেই হবে।"

উপরে আসিয়া বরেন দেখিল শশিনাথ উঠিয়াছে; কিন্তু শয্যাত্যাগ করে নাই, শয্যার উপর অলসভাবে পড়িয়া আছে।

বরেনকে দেখিয়া শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "সারারাত জেগেই আছ নাকি হে?"

বরেন কহিল, "সারারাত জেগে থাকলে কি কেউ এত সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠে? সারারাত জেগে থাকলেই এত বেলাতেও লোকে বিছানায় প'ড়ে থাকে।"

"তা বটে।" বলিয়া শশিনাথ সহাস্যমুখে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর বরেনের সহিত দুই একটা কথা কহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

পাঁচুর মা বাটনা বাটিতেছিল, শশিনাথকে দেখিয়া বলিল, "দিদিমণি, বাবু উঠেছেন।"

সরযূ রান্নাঘরে দুধ জ্বাল দিতেছিল, বাহিরে আসিয়া শশিনাথকে দেখিয়া বলিল, "রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো?"

হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া শশিনাথ বলিল, "সারারাত। তোমার ব্যবস্থায় তো কোনো ত্রুটি ছিল না সরযূ।"

সরযূ কিন্তু শশিনাথ ও বরেনের যথোপযুক্ত যত্ন করিতে পারিতেছে না ভাবিয়া বাস্তবিকই মনে মনে ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত হইতেছিল। পিতা পীড়িত—চলৎশক্তিহীন। সে ছাড়া গৃহে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যে অতিথিদ্বয়ের পরিচর্যার ভার লইতে পারে। অতিথি দুইটি কলিকাতাবাসী ধনী-সন্তান, সে চেতনাও তাহার আছে। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা, তাহার ও তাহার যুবক অতিথিদ্বয়ের

জাতি ও বয়সের হিসাব বিস্মৃত হইয়া অতিথি সৎকার করা। একজন ষোল বৎসরের অবিবাহিতা কিশোরীর পক্ষে দুইজন অবিবাহিতা যুবকের সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া অকুণ্ঠিত হইতে পারা খুব সহজ ব্যাপার নহে, নিরন্তর তাহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া ও কথা না কহিয়া উপায়ও নাই। পরিচর্যা করিবার ইচ্ছা ও আগ্রহের সহিত মনের সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা অনুভব করিয়া সরযূ মনে করিতেছিল, যথোপযুক্ত পরিচর্যা হইতেছে না। তাই সে কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "ব্যবস্থা আর কি করতে পারছি—আপনাদের কত কষ্ট হচ্ছে!"

সরযূর কথা শুনিয়া শশিনাথের মুখে শান্ত স্নিগ্ধ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে মাথা নাড়িয়া একটু জোরের সহিত বলিল, "না, একেবারেই কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কাল থেকে তোমাকে দিয়ে আমি যে নির্মল আনন্দ পাচ্ছি তা একেবারে খাঁটি। তুমি হয়তো জান না, আমার সহোদরা বোন নেই—একটি মাসতুতো বোন আছে, সে কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি থাকে ব'লে তার বাড়িতে গিয়ে এমন ক'রে বাস ক'রে বোনের যত্ন পাওয়ার সুবিধা হয় না। যে রসের স্বাদে আমি এতদিন বঞ্চিত ছিলাম, কাল থেকে তা আমি তোমার কাছ থেকে পাচ্ছি। সে একেবারে নিছক মিষ্টি রস—তার মধ্যে আর অন্য কোনো রসের সংস্রব নেই। তুমি যখন আমার বোন, তখন এখন থেকে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেবল ভদ্রতার নয়—স্নেহেরও। বুঝেছ?"

মাথা নত করিয়া সরযূ এতক্ষণ শশিনাথের এই অদ্ভুত মধুর বাণী শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন শুধু বাক্যের সমষ্টি নহে—পরন্তু কোনো তেজ অথবা শক্তি যাহা অনিবার গতিতে তাহার মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পুলকে ও আবেগে সরযূর দেহ অল্প অল্প কাঁপিতেছিল।

শশিনাথের প্রশ্নে মুখ তুলিয়া চাহিয়া সলজ্জ মিষ্টস্বরে সরযূ বলিল, "বুঝেছি।" তাহার পর ধীরে ধীরে আঁচলখানি গলদেশে বেষ্টন করিয়া ভূমিষ্ট হইয়া শশিনাথকে প্রণাম করিয়া ভক্তি-নম্র-কণ্ঠে বলিল, "আজ থেকে আপনি আমার দাদা হলেন।"

সরযূর অনাবৃত মস্তকের উপর সযত্নে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া শশিনাথ কহিল, "চিরসৌভাগ্যবতী হও।"

হেমন্তের রবিকরোজ্জ্বল ঝল্‌মলে প্রভাত এই দুইটি তরুণ প্রাণীর ভক্তি ও আশীর্বচনের নীরব সাক্ষী হইয়া রহিল।

পাঁচুর মার অন্তঃকরণ যে পরিমাণে সরল, মস্তিষ্ক বোধ হয় ঠিক সেই পরিমাণেই বক্র। অর্থাৎ কোন জিনিসই প্রথমে সহজভাবে তাহার বিবেচনায় আসে না। দূর হইতে বক্রদৃষ্টিতে সরযূ ও শশিনাথের ব্যাপার দেখিয়া সে যাহা স্থির করিয়া বসিল, সেইটাই ভুল। ঔৎসুক্যে তাহার মসলা-বাটা ভাল হইতেছিল না। শশিনাথ প্রস্থান করিতেই সরযূর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনিই কি তোমার সোয়ামী হবেন দিদিমণি?"

সরযূর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া সে কহিল, "না, না, ইনি আমার দাদা হন।"

"কি রকম দাদা দিদিমণি?"

একটু ইতস্তত করিয়া সরযূ কহিল, "একটু দূর-সম্পর্কের।"

এ উত্তরে পাঁচুর মা সন্তুষ্ট না হইয়া কহিল, "জ্ঞাতি নয় তো দিদিমণি?" কেমন করিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল, শশিনাথ ইহাদের বিবাহ আটক হইবার মত আত্মীয় নহে।

সরযূ কহিল, "না, জ্ঞাতি নয়।"

তখন পাঁচুর মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "আহা! এইটি তোমার সোয়ামী হ'লে কিন্তু চমৎকার হ'ত!"

ব্যস্ত হইয়া সরযূ কহিল, "ছি, পাঁচুর মা, বলতে নেই, পাপ হবে।"

পাপ-পুণ্যের ভেদ নির্ণয় করিতে না পারিয়া পাচুর মা এক মুহূর্ত নির্বাক হইয়া দাড়াইয়া রহিল। তাহার পর পুনরায় মসলা পিষিতে বসিল।

৮

পাঁচ দিন হইল হরিচরণ কলিকাতায় আসিয়া জগৎ সুরের লেনে বাস করিতেছেন। এ কয়েক দিন শশিনাথ হরিচরণের সংসার গঠিত করিতে এত ব্যস্ত ছিল যে, নিজের কাজকর্ম দেখিবার অবসর একেবারেই পায় নাই। এখন সকল ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রত্যহ হরিচরণের গৃহে যাইবার প্রয়োজন হয় না,—তথাপি উর্মিলা প্রতিদিনই একবার করিয়া গিয়া দেখিয়া আসে। নিত্যকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শশিনাথ কতক সংগ্রহ এবং কতক ক্রয় করিয়া দিয়াছে। দাসদাসী নিজ নিজ কর্তব্য বুঝিয়া লইয়াছে। হরিচরণের চিকিৎসার ভার একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকের উপর পড়িয়াছে। সর্বোপরি সরযূ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভ্যাসের বলে সংসারটি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। এখন তাহাদের বাড়ি যাওয়া বেড়াইতে যাওয়ার বেশি নহে। তাই সকালে উঠিয়া শশিনাথ তাহার উৎক্ষিপ্ত মনকে পুনরায় পাঠে সংযোজিত করিবার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিতেছিল, এমন সময়ে সোমনাথ প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করিল।

দুই চারিটা অবান্তর কথাবার্তার পর সোমনাথ কহিল, "শশি, তোমার বউদিদি যে আমাকে ভারি বিপদে ফেলেছে!"

ঈষৎ হাসিয়া শশিনাথ বলিল, "সে তো আর নূতন কথা নয় দাদা। বউদিদি তো প্রায়ই তোমাকে বিপদে ফেলেন।" শশি বোধ হয় কথাটা কতক অনুমান করিতে পারিয়াছিল।

সোমনাথ কহিল, "এবার একটু গুরুতর কথা—তুমি ভিন্ন এর মীমাংসা হয় না।"

পেন্সিল কাটিতে কাটিতে শশিনাথ বলিল, "কি বল, শুনি?"

সোমনাথ ভাবিয়াছিল, কথাটা বেশ একটু গুছাইয়া বলিবে, কিন্তু বলিবার সময় মুখে তেমন কিছু জুটিল না। বলিল, "লীলার বিয়ের বিষয়ে তোমাকে অনুরোধ করতে বলেছে।"

অম্লান-বদনে শশিনাথ বলিল, "সে তো ভাল কথা—এর আবার অনুরোধ কি? আমি আজ থেকেই পাত্রের সন্ধান আরম্ভ করব।"

একটু উস্‌খুস করিয়া সোমনাথ কহিল, "তা নয়। তার ভারি ইচ্ছে, তুমি লীলাকে বিয়ে কর।"

ঈষৎ হাসিয়া শশিনাথ পেন্সিল কাটায় মনোযোগ দিল। তাহার পর কহিল, "বউদির এটা বোঝবার ভুল। তঁার নিজের মুখের কথাই আমার কাছে যথেষ্ট জোরালো। কারো সুপারিশ নিয়ে আমার কাছে আসবার তাঁর দরকার নেই। তাঁকেই আমি ওপরওয়ালা মনে করি।"

মনে মনে খুশি হইয়া সোমনাথ কহিল, "তা সে জানে। সে কথা নয়। ধর, আমিই তোমার মতামত জানতে চাচ্ছি।" নিজের চেয়ে স্ত্রীকে বড় করিলে সন্তুষ্ট হওয়ার দুর্বলতা, অনেকের মত সোমনাথেরও ছিল।

অতি সহজভাবে শশিনাথ কহিল, "বউদিকে যা বলেছি, তা ছাড়া নতুন কথা আমার বলবার নেই। আমার অমত আছে।"

একটু ক্ষুণ্নস্বরে সোমনাথ কহিল, "অবশ্য লীলাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হ'লে আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই নে।"

শশিনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "দেখ দাদা, তুমি যে কথা বলছ, সে কথা একেবারে উঠতে পারে না। রূপে গুণে লীলাকে আমার পছন্দ হয় না—এ কথা আমি নিজে বললেও তুমি বিশ্বাস করবে না। তবে কি কারণে আমি বিয়ে করতে রাজি হচ্ছি নে, তা তোমার জানতে ইচ্ছা হ'তে পারে। প্রথমত আমার মনে হয়, এতদিন ধ'রে ব্যবহারের ফলে যে সম্পর্কগুলো খাপ খেয়ে গেছে, সেগুলোকে একেবারে অদ্ভুতভাবে উল্টেপাল্টে দেওয়া হবে। দুটো সম্পর্ক ভেবে দেখলে তোমার নিজেরই হাসি পাবে, শালী হবে

ভাদ্রবউ, আর ভাই হবে ভায়রাভাই! যে তোমাকে পিটুলি গুলে খাওয়াতে পারে, তোমার ছায়া মাড়ালে তাকে গঙ্গাস্নান করতে হবে।" বলিয়া শশিনাথ হাসিতে লাগিল।

সোমনাথ কহিল, "এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তা হ'লে এ কোনো কাজের আপত্তি নয়। আর কোনো আপত্তি আছে?"

শশিনাথ কহিল, "আমার দ্বিতীয় আপত্তি—যদিও এইটেই আমার প্রথম আপত্তি হওয়া উচিত ছিল—বিয়ে করবার কোন ইচ্ছা বা কল্পনা আমার একেবারেই নেই। আমি তো আইবড় মেয়ে নই যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমার বিয়ে দিয়ে দায়ে খালাস হ'তে হবে।"

"তৃতীয় আপত্তি?"

"তৃতীয় আপত্তি—আমার মনে হয়, এমন সম্পর্ক করা উচিত নয়, যাতে আত্মীয়ের সংখ্যা না বেড়ে একই থেকে যায়। এই ধর, লীলার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'লে, আমি তো তোমার ভাই থাকবই—অধিকন্তু লীলার স্বামী তোমার ভায়রাভাই হবে; কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমি দুইকে এক ক'রে দোব। ঠিক নয় কি?"

শশিনাথের কথা শুনিয়া সোমনাথ কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মুখে বিস্ময়সূচক শব্দ-বিশেষ বাহির করিয়া কহিল, "যত সব ছেলে-মানুষের পাল্লায় পড়া গেছে! আমি কিছু জানি নে—তোমার বউদিদির সঙ্গে যা হয় বোঝাপড়া ক'রো।" বলিয়া সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

শশিনাথ কহিল, "দাদা, একটা কথা বউদিকে জানিয়ো যে, তিনি যেন মনে না করেন আমি তাঁর চেয়ে লীলার কম হিতৈষী। আমি যদি দেখি, লীলার এমন কোন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে যে আমার চেয়ে কোন অংশে হীন, তখন আমি সে বিয়ে ভেঙে দিয়ে লীলাকে বিয়ে করব। কিন্তু তার আগে কেন? দেশে তো সৎপাত্রের অভাব নেই—আর আমরা তো ঠিক ক'রেই রেখেছি, লীলার বিয়েতে বোনের সখ মেটাব। তবে যদি খরচ

বাঁচাবার মতলবে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও, তা হ'লে আমি বলছি, তোমাকে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না, লীলার বিয়ের সব খরচ আমি আর বউদি করব। লীলা যেন স্বপ্নেও এ কথা মনে করতে না পারে যে, সে তোমার আশ্রয়ে আছে ব'লে সৎপাত্রের চেষ্টায় তুমি একবার রাস্তা পর্যন্ত মাড়ালে না, বাড়ি থেকেই সস্তা মাল ধ'রে দিতে চাচ্ছ!"

সোমনাথের মুখে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল, "পাগল শুধু পাগলা-গারদেই থাকে না—বাইরেও থাকে দেখছি।" বলিয়া প্রস্থান করিল।

হাসিতে হাসিতে শশিনাথ একখানা বই খুলিয়া পড়িতে বসিল।

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সোমনাথ দেখিল, ঊর্মিলা নিবিষ্টমনে রবি বর্মার একটি চিত্রে কাপড় পরাইতেছে। পৌরাণিক যুগের দময়ন্তী ঊর্মিলার হাতে পড়িয়া লেস্ ও রিবনের সাহায্যে আধুনিক বঙ্গমহিলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া মনোযোগ সহকারে সোমনাথ দেখিতে দেখিতে বলিল, "বাঃ! চমৎকার হচ্ছে! দময়ন্তীকে দেখে যেমন মেম ব'লে মনে হচ্ছে, হাঁসটিও ঠিক মুরগীর মত দেখতে হয়েছে। চিঠি পাঠানোর বদলে রোস্ট ক'রে নল সাহেবকে পাঠিয়ে দিলে বোধ হয় তিনি বেশি খুশি হন।"

সোমনাথের কথা শুনিয়া ঊর্মিলা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তুমি কি মনে কর, সীতা সাবিত্রী আজকালকার দিনে জন্মালে সেমিজ পরতেন না, না সাবান মাখতেন না?"

সোমনাথ কহিল, "ঠিক কথা। আর লক্ষ্মণ ধনুর্বাণের পরিবর্তে রাইফেল হাতে বনে বনে পাখি শিকার ক'রে বেড়াতেন, আর ঊর্মিলা—"

সোমনাথকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া ঊর্মিলা কহিল, "ঊর্মিলা এখনও তেমনি ব্যাকুল হ'য়ে স্ত্রীভোলা স্বামীর পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।" তাহার পর শিল্পকার্য ত্যাগ করিয়া সোমনাথের অতি নিকটে আসিয়া

কহিল, "তুমি কি মনে কর, সেকালের ঊর্মিলায় আর তোমার ঊর্মিলার কোন তফাত আছে ?"

পত্নীর ভক্তি-প্রীতি-উদ্ভাসিত মুখের প্রতি সোমনাথ কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সস্নেহে তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া কহিল, "নেই ? এই ধর, যদি তোমার লক্ষ্মণ—রাম ও সীতার পরিবর্তে রামবাবুর ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চোদ্দ মাসের জন্য জাপানে বেড়াতে যান তো তুমি কি কর ?"

শঙ্কিত হইয়া ঊর্মিলা কহিল, "আবার তোমাদের জাপান যাবার হুজুগ উঠেছে না কি ? না না, সে হবে না, কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না।"

সোমনাথ উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কিন্তু হ'লে কি কর শুনি ?"

ঊর্মিলা কহিল, "সেবার তো বলেইছিলাম, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।"

"সেই ম্যাচ্‌ফ্যাক্টারিতে ?"

"রামবাবুর স্ত্রী যেতে পারেন, আর আমি পারি নে ?"

"রামবাবু যে ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন—আর আমি হব শিক্ষার্থী।"

"তা হোক, তুমি বাসা ক'রে আমাকে নিয়ে থাকবে, বোর্ডিংএ থাকতে হবে না।"

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, "এই দেখ, ত্রেতাযুগের ঊর্মিলা আর কলিকালের ঊর্মিলায় কত তফাত ! ত্রেতার ঊর্মিলা চোদ্দ বছর স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পেরেছিল, আর কলির ঊর্মিলা চোদ্দ মাস পারে না।"

সমূহ বিপদ দেখিয়া ঊর্মিলা নজির বদলাইয়া ফেলিল। বলিল, "সীতা তো রামের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন।"

হাসিয়া সোমনাথ কহিল, "সীতার কথা তো হচ্ছে না, ঊর্মিলার কথা হচ্ছে। আর তুমি তো একদিন আমার সঙ্গে তর্ক করেছিলে যে, রামের সঙ্গে সীতার বনে যাওয়ার বাহাদুরি কিছুই ছিল না, সব মেয়েমানুষই তা পারে। বরং স্বামীর

আদেশে চোদ্দ বছর স্বামীর বিচ্ছেদ ভোগ করায়, আর স্বামীর অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকায় উর্মিলার যথেষ্ট বাহাদুরি ছিল।"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "সে কথা এখনও স্বীকার করি। সে অবস্থায় পড়লে চোদ্দ বছর কেন, চোদ্দ জন্ম আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি। কিন্তু ইচ্ছে ক'রে সে অবস্থায় পড়ব কেন?"

আর এ কথার উত্তর দিতে সোমনাথের প্রবৃত্তি হইল না—স্নেহভরে প্রিয়-তমার গণ্ডে সে প্রেমের একটি নিবিড় পুরস্কার মুদ্রিত করিয়া দিল।

ব্যস্ত হইয়া উর্মিলা কহিল, "সর, সর। লীলা এখনই আসবে।"

উর্মিলাকে বাহুবন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া সোমনাথ কহিল, "লীলার জন্যে এবার পাত্র সন্ধান করা যাক উর্মিলা, শশি তো একেবারেই রাজি নয়।"

উর্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপোকে কিছু বলেছিলে নাকি?"

শশিনাথের সহিত যেরূপ কথা হইয়াছিল, সোমনাথ উর্মিলাকে তাহা আনু-পূর্বিক শুনাইল। সমস্ত ধীরভাবে শুনিয়া উর্মিলা মনের মধ্যে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ পীড়া অনুভব করিল। একাধিক কারণে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল শশিনাথের সহিত লীলার বিবাহ হয়। দেবরের প্রতি উন্মুক্ত স্নেহের দাবিতে ও দেবরের দিক হইতে অমিত ভক্তির ভরসায়, উর্মিলা ভাবিত এ বিবাহ শেষ পর্যন্ত হইয়াই যাইবে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল হইয়া আজ তাহার মনে নৈরাশ্যের ব্যথার সহিত অভিমানের সূক্ষ্ম বেদনাও জাগিয়া উঠিল।

সোমনাথ উর্মিলাকে নীরব ও ব্যথিত দেখিয়া সান্ত্বনার সুরে কহিল, "তার আর দুঃখ কি—শশি বলেছে, তার চেয়েও ভাল পাত্রের সন্ধান সে ক'রে দেবে।"

শুনিয়া উর্মিলার অভিমানক্লিষ্ট মন আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এ যেন প্রহার করিয়া গায়ে হাত বুলানোর মত—আঘাতের উপর অপমান। মনে মনে সে প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, চাই না তোমার এ নির্দয় অনুগ্রহ, চাই না এ সান্ত্বনার পরিহাস। মুখে কিন্তু মৃদু হাসিয়া কহিল, "না। দুঃখ আর কি? তুমি তা হ'লে অন্য পাত্র দেখ—আর তো চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না।"

৯

উপর্যুপরি তিন দিন শশিনাথ হরিচরণের গৃহে যাইতে পারে নাই। আজ সকালে উঠিয়াই মনে মনে স্থির করিল, বৈকালে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিবে। দর্শনের একখানা পুস্তক লইয়া সে অধ্যয়নের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে দ্বারের পর্দার অপর দিকে মৃদু কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল, "শশিদা!"

শশিনাথ পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "এস।"

পর্দা তুলিয়া হস্তে চায়ের পেয়ালা লইয়া লীলা প্রবেশ করিল। শীতকালের প্রভাতে ফুটন্ত চায়ের পেয়ালা হইতে প্রচুর বাষ্প উত্থিত হইয়া লীলার মুখের সম্মুখে চপল কুজ্ঝটিকা রচনা করিতেছিল।

মৃদু হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "তুমি চা নিয়ে যে লীলা?—কালী কোথায় গেল?"

কালীচরণ সংসারের খানসামা-চাকর। অন্যান্য সৌখিন ও সহজ কর্তব্যের সহিত চায়ের ব্যাপারও তাহার এলাকার অন্তর্গত।

লীলা কহিল, "কাল রাত থেকে তার জ্বর হয়েছে. আজ যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শশিনাথ বলিল, "বটে! তাই সকাল থেকে তাকে দেখতে পাই নি। চা-ও তা হ'লে তুমিই করেছ।"

"হ্যাঁ।"

পেয়ালা তুলিয়া শশিনাথ এক চুমুক পান করিল।

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "চিনি কি বেশি হয়েছে?"

ডিশের উপর পেয়ালা রাখিয়া শশিনাথ মাথা নাড়িয়া কহিল, "নাঃ, ঠিক হয়েছে। আর যদি একটু বেশিই হ'ত তা হ'লেই বা এমন কি ক্ষতি ছিল?

মানুষের জীবনটা এতই বড় যে, চায়ে একটু চিনি বেশি হ'ল কি পানে একটু চুন কম হ'ল, এ—সব সামান্ত ব্যাপারগুলোকে একেবারেই গ্রাহ্য করা উচিত নয়। এ-সব ছোট ব্যাপারগুলো কিন্তু বাস্তবিকই ছোট নয়, এই সব উপাদানের সাহায্যেই আমাদের চরিত্র গ'ড়ে ওঠে। আজ যেটা শুধু চায়ের চিনির মধ্যে সহজভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, দুদিন পরে সেটাই হয়তো অন্নবস্ত্রের মধ্যে বিরাটরূপে দেখা দেবে। এ তুমি নিশ্চয় জেনো, মানুষের মধ্যে যে সব অভাব ও অনুযোগ দেখতে পাওয়া যায়, বাইরের সঙ্গে তার সংস্রব নেই, সমস্তই মানুষ নিজের মধ্যে রচনা করে। সেইজন্তে মানুষের নিজেরই স্বার্থে প্রধান কর্তব্য—নিজেকে সংযত করা। নিজের মধ্যে এমন সব অভাব সৃজন করা উচিত নয়, যার জন্তে অবশেষে শুধু নিজেরই প্রতি অনুযোগ করতে হয়। আমি যে এত কথা বললাম, এ থেকে যেন মনে ক'রো না যে, তোমার চায়েতে চিনি বেশি হয়েছে; চিনি তোমার ঠিকই হয়েছে। কাল সন্ধ্যাবেলা বউদির সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা হয়েছিল। চায়ের চিনির কথায় সেগুলো মনে প'ড়ে গেল; অথচ দুটো ব্যাপারের পরস্পরের সঙ্গে যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাও নয়। বউদিদির সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে, তা যদি তোমার জানা থাকে, তা হ'লে আমার কথা বুঝতে পারবে। আর তা যদি না হয়, তা হ'লে আমার কথার সহজ সত্যটুকু বুঝতে ও জীবনের মধ্যে খাটাতে চেষ্টা ক'রো। নিজে যেন নিজের অভাব ও দুঃখ সৃষ্টি ক'রো না।"

এক চামচ চায়ের চিনির উত্তরে এত দীর্ঘ বক্তৃতা ও উপদেশের জন্ত লীলা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে ইহার মূল তত্ত্বটি নির্ণয় করিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল।

লীলার মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "চায়ে চিনি একটু বেশি হ'লে চা নষ্ট হ'য়ে গেল মনে করা যেমন ভুল, চায়ে পরিমাণের অতিরিক্ত চিনি দেওয়াও তেমনি অনুচিত। কিন্তু সে বিষয়ে তোমার বা আমার চিন্তার কোন কারণ নেই; কেন না, তুমি পরিমিত চিনিই দিয়েছ

এবং আমারও চা-টা বেশ ভাল লাগছে।" বলিয়া শশিনাথ পুনরায় চায়ের পেয়ালা তুলিয়া পান করিল।

একটু ইতস্ততসহকারে স্মিতমুখে লীলা কহিল, "কিন্তু এ সব কথা তুমি কেন বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে শশিদা!"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "যতটুকু বুঝতে পেরেছ, তার বেশি বোঝবার এখন দরকার নেই। দরকার যখন হবে, তখন আমি আরও স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দোব।"

লীলা উত্তর দিবার পূর্বেই "ঠাকুরপো, তোমার একখানা চিঠি আছে" বলিয়া পর্দা ঠেলিয়া ঊর্মিলা কক্ষে প্রবেশ করিল। শশিনাথ চিঠি লইয়া দেখিল, খামের উপর অপরিচিত স্পষ্টাক্ষরে লিখিত তাহার নাম ও ঠিকানা। খাম খুলিয়া দেখিল, দুই ছত্রে চিঠি সমাপ্ত—নীচে সরযূর স্বাক্ষর।

ঊর্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি ঠাকুরপো?"

"সরযূর।" বলিয়া শশিনাথ পত্রখানি ঊর্মিলাকে প্রদান করিল। পত্রে লেখা ছিল:—শ্রীচরণেষু, অনুগ্রহ করিয়া আজ কোন সময়ে বাবার সহিত একবার দেখা করিবেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী এ চিঠি লিখিলাম। নিবেদন ইতি—স্নেহানুগতা সরযূ।

ঊর্মিলা কহিল, "তুমি কাল গিয়েছিলে ঠাকুরপো?"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "তিন দিন যাই নি।"

"আমিও দু-তিন দিন যাই নি। তোমার দাদাও বোধ হয় যান নি। ছিঃ, ভারি অন্যায় হয়েছে। আমাদের ভরসায় একটি মেয়েকে অবলম্বন করে এখানে রয়েছেন—আর আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছি। যাও ঠাকুরপো, এখনি তুমি যাও।"

শশিনাথ কহিল, "ভাবছিলাম বিকেলে যাব; কিন্তু যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, তখন এ বেলাই যাওয়া যাক।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে শশিনাথ হরিচরণের নিকট উপস্থিত হইল। বিলাসপুর

হইতে আসিবার দশ দিন পূর্বে হরিচরণ প্রকাশের শেষ পত্র পান, তাহার পর হইতে তাহার আর কোন সংবাদ নাই। কলিকাতায় আসিয়া তাহাকে পত্র দিয়াছেন, কিন্তু সে আসিয়া দেখাও করে নাই, উত্তরও দেয় নাই। সে কলিকাতায় আছে কি না ও শারীরিক কেমন আছে জানিবার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া হরিচরণ শশিনাথকে প্রকাশের সংবাদ লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

হরিচরণ কহিলেন, "সরযূর সঙ্গে তার বিয়ের কথা তুমি জান, সে কথাও তাকে জানাতে পার; আর আবশ্যক হ'লে তার সঙ্গে বিবাহের দিন স্থান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনাও করতে পার। আর একটা কথা, তোমার বন্ধু বরেনকে মাঝে মাঝে আসতে ব'লো। ছেলেটি ভারি চমৎকার, তাকে আমার ভারি ভাল লাগে।"

বন্ধুর প্রশংসায় শশিনাথ মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইল, এবং হরিচরণের উভয় অনুরোধই পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রকাশের বাসার ঠিকানা লইয়া সে প্রস্থান করিল।

বহুবাজার অঞ্চলে একটি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর প্রকাশের বাসা, নম্বরের সাহায্যে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সম্মুখের বাড়ির দ্বারে এক ব্যক্তি বসিয়া ছিল; বাড়িটি মেস্ কিনা তাহার নিকট হইতে পাকা বুঝিয়া লইয়া শশিনাথ ও বরেন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। একটি অপ্রশস্ত অন্ধকার পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা ভিতরের বারান্দায় উপস্থিত হইল। ডান দিকে সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। বাম দিকে একজন ভৃত্য কয়েকটা লণ্ঠন ও ডিবা লইয়া আসন্ন অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুঝিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। একটি প্রজ্বলিত ডিবার শিখা হইতে রশ্মির চতুর্গুণ কালি বাহির হইয়া চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। শশিনাথ তাহাকে প্রকাশের ঘরের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল।

সে তখন একটা ভগ্নপ্রায় ডিজ্ লণ্ঠনের দুর্ভেদ্য কল-কজার সমস্যায় ব্যস্ত

ছিল। নিজের দুরূহ কর্তব্য হইতে কোন প্রকারে একবার মুখ উঁচু করিয়া বলিল, "বলতে পার নে বাবু, আমি নতুন লোক।"

সেখানে সময় অপব্যয় করা অনাবশ্যক বোধ করিয়া শশিনাথ ও বরেন সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। সন্ধ্যার পূর্বেই কিন্তু সিঁড়ির ভিতরে অন্ধকার এমন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল যে, সিঁড়ি উপরে উঠিয়াছে কি নীচে নামিয়াছে, সোজা গিয়াছে, কি বাঁকিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। বেগতিক দেখিয়া বরেন কহিল, "ওহে, ভারি অন্ধকার! একবার আলোটা ধর তো।"

বলিবামাত্র সে ব্যক্তি উটিয়া ত্বরিতপদে সেই প্রজ্জ্বলিত ডিবা লইয়া তাহাদের এত নিকটে উপস্থিত হইল যে, শশিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "সর সর, আলোয় কাজ নেই। ধোঁয়ায় মারা গেলুম।"

কিন্তু সেই ক্ষীণ আলোকেই কতকটা কাজ হইল। সিঁড়ির কতকটা আন্দাজ করিতে পারিয়া উভয়ে সন্তর্পণে দ্বিতলে পৌঁছিল; এবং অনুসন্ধানে প্রকাশের কক্ষটি জানিয়া লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

একটি তরুণ যুবক টেবিলের সম্মুখে বসিয়া নিবিষ্টমনে পাঠ করিতেছিল, শশিনাথের প্রশ্নে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুকদ্বয়কে ঘরের মধ্যে আহ্বান করিল।

প্রবেশ করিয়া শশিনাথ তাহার প্রশ্নের পুনরুক্তি করিল।

যুবকটি কহিল, "তিনি আট-দশ দিন বাড়ি গেছেন। তাঁর বিয়ে এই অঘ্রান মাসের মধ্যেই বোধ হয় হবে—তারই ব্যবস্থা করতে গেছেন; কাল সকালে আসবেন। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

বরেন কহিল, "আমরা আসছি তাঁর যেখানে বিয়ে হবে সেখান থেকেই।"

বরেনের কথা শুনিয়া যুবকটির আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। "আপনারা কি তবে হুগলী থেকে আসছেন?"

"না, কেন বলুন দেখি?"

একটু ইতস্তত করিয়া যুবকটি কহিল, "সুধামাধববাবু হুগলীতে ওকালতি করেন না ?"

"তিনি কে ?"

যুবকটি সামান্য বিহ্বলভাবে একবার বরেনের মুখের দিকে, একবার শশিনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "তাঁরই মেয়ের সঙ্গে তো মাস্টার মশায়ের বিয়ে হচ্ছে।"

যুবকের কথা শুনিয়া শশিনাথ বরেনের প্রতি একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল ; তাহার পর কহিল "আমাদের যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করাই দরকার, তখন এ সব কথায় কোন লাভ নেই। কাল কখন এলে তাঁর দেখা পাব বলতে পারেন ?'

"তিনি আসবেন খুব ভোরে, আপনারা দশটার আগে আসবেন।"

রাস্তায় বাহির হইয়া শশিনাথ কহিল, "ব্যাপার কি হে ?"

বরেন কহিল, "খুব সম্ভবত মেসের ছেলেটি যা জানে, তা আগেকার ঘটনা কিংবা প্রকাশ আসল কথা এখানে প্রকাশ করে নি।"

বরেনের অনুমান সঙ্গত মনে করিলেও শশিনাথ কহিল, "হ'তে পারে ; কিন্তু আমার মনে খট্‌কা বেধেছে—মনে হচ্ছে, এর মধ্যে কোন গোল আছে !"

বরেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তর দিল, "খোদ প্রকাশের সঙ্গে যতক্ষণ কথা না হচ্ছে, ততক্ষণ অনর্থক কতকগুলো অনুমানে সময় নষ্ট ক'রে ফল নেই।"

ঈষৎ হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "অনুমানকে একেবারেই আমল দিতে চাচ্ছ না ; কিন্তু অনুমানের দ্বারাই বড় বড় জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা স্বীকার কর কি না ?"

বরেন হাসিয়া কহিল, "তা স্বীকার করলেও, জ্ঞানটা যখন এত হাতের কাছে—কয়েক ঘণ্টা পরেই পাওয়া যাবে, তখন অনুমান নিয়ে বিব্রত কেন হই ?"

শশিনাথ কহিল, "আচ্ছা, তাই ভাল। তা হ'লে আজ রাত্রে হরিচরণবাবুকেও অনুমানের দ্বারা বিব্রত ক'রে কাজ নেই—কাল সকালে একেবারে টন্‌টনে জ্ঞান হাতে ক'রে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া যাবে।"

১০

পরদিন প্রাতে শশিনাথ ও বরেন যখন মেসে প্রবেশ করিল, তখনও মেসের সকল কক্ষে দিনের আলো প্রবেশ করে নাই। পাছে প্রকাশ কোথাও বাহির হইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় ইহারা অতি প্রত্যুষেই উপস্থিত হইয়াছিল। একটি অপরিচিত যুবক প্রকাশের কক্ষে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া লিখিতেছিল—বরেন ও শশিনাথকে দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া কক্ষমধ্যে আহ্বান করিল এবং উঠিয়া তাহাদিগকে বসিবার স্থান নির্দেশ করিয়া কহিল, "কাল সন্ধ্যায় আপনারাই কি এসেছিলেন ?"

শশিনাথ কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনিই বোধ হয় প্রকাশবাবু ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তখন শশিনাথ তাহাদের পরিচয় ও আগমনের কারণ বিবৃত করিল।

শশিনাথের কথা শুনিয়া প্রকাশ অল্পক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "হরিচরণবাবুর চিঠি আজ এসে আমি পেয়েছি, আর তাঁর চিঠিরই উত্তর লিখছিলাম। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে জানাবেন যে, আজই তিনি তাঁর চিঠির উত্তর পাবেন।"

প্রকাশের এ উত্তরে শশিনাথ ভিতরের কথা কিছু বুঝিতে পারিল না। অথচ কাল সন্ধ্যার সময় যে সন্দেহটা মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল, আজ তাহাকে উৎপাটিত না করিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। তাই

কথাটা এইখানেই শেষ না করিয়া কহিল, "দেখুন, যে কারণে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এত ব্যস্ত—চিঠিতে ভাল ক'রে সে বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নয়।"

একটু চিন্তা করিয়া প্রকাশ বলিল, "হরিচরণবাবুর সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক, ও আপনারা তাঁর সংসারের খবর কতটা জানেন, জানলে আমার পক্ষে এ বিষয়ে কথা কওয়ার একটু সুবিধে হয়।"

হরিচরণের সহিত তাহাদের আত্মীয়তার সূত্র ও পরিমাণ শশিনাথ ব্যক্ত করিল, এবং সরযূর সহিত তাহার বিবাহের সুযোগে তাহারা যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় কাটিয়া মৃতপ্রায় সমাজের দেহে রক্ত সঞ্চারের উদ্যোগ করিতেছে, তাহার জন্যে তাহাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দিত করিয়া তাহার ঐকান্তিক সহানুভূতি জানাইল। শশিনাথ বলিল, "বাংলা দেশের সমাজ-ইতিহাসে আপনাদের নাম চিরদিন উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মানুষের উপর মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক অধিকার থেকে মানুষ যে এতদিন বঞ্চিত আছে, সেই অধিকারের উপর মানুষকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আপনারা সমস্ত বাংলা দেশের ধন্যবাদভাজন হচ্ছেন।"

শশিনাথের সবল দীপ্ত বাক্য শুনিয়া প্রকাশ প্রথমে একটু বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে অবিচলিতভাবে কহিল, "আপনি আমার উপর যে গৌরব ও প্রশংসা অর্পণ করছেন, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি তার অধিকারী নই। কারণ, আমি যে শুধু হরিচণবাবুর কন্যাকে বিয়ে করছিনে তা নয়, অন্য জায়গায় আমার বিয়ে স্থির হ'য়ে গিয়েছে। আপনার সুখ্যাতির একটি কণাও আমার প্রাপ্য নয়।"

প্রকাশের কথায় কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া শশিনাথ সহজভাবে বলিল, "কাল সন্ধ্যায় আপনার ঘরে এই রকম একটা কথা শুনেছিলাম বটে, কিন্তু কথাটা এমন অদ্ভুত আর অন্যায় মনে হয়েছিল যে, আপনার মুখ থেকে না শুনে সে কথা আধখানা বিশ্বাস করাও পাপ ব'লে আমাদের মনে হয়েছিল।"

মৃদু হাসিয়া প্রকাশ বলিল, "অনেক সোজা কথা সময়ে সময়ে বাইরে থেকে অদ্ভুত আর অন্যায় ব'লে মনে হয়। তার জন্যে আমি আপনাদের দোষ দিতে পারি নে।"

বরেন এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই। প্রকাশের প্রবঞ্চনার কথা শুনিয়াই সে মনের মধ্যে জ্বলিতেছিল, তাহার উপর শশিনাথের প্রচ্ছন্ন ভৎ'সনার উত্তরে প্রকাশকে এমন নির্লজ্জভাবে সাফাইয়ের ন্যাকামি গাহিতে দেখিয়া সে আর সামলাইতে পারিল না। ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমাদের দোষ দিতে পারেন না শুনে কৃতার্থ হলাম। কিন্তু তবুও কথাটা যে সোজা, তা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে।"

বরেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রকাশ এক মুহূর্ত নীরবে তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "আমার বিষয়ে যে কোনো ধারণা করা আপনার অধিকার—আর আমার কোনো কাজের কৈফিয়ৎ আপনাকে দেওয়া না-দেওয়া আমার অধিকার—আমার ইচ্ছার অভাবে আমার ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে জানবার জন্য আপনি যতটুকু কৌতূহলী হবেন ততটুকুই আপনার অনধিকার চর্চা।"

প্রকাশের উত্তরে বরেন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ভণ্ডের মুখে এ-যে সাধুর উক্তি! অসহ্য রোষে সে তীব্রস্বরে কহিল, "আপনার ব্যক্তিগত কোনো কথা জানবার আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, কিন্তু একজন ব্রাহ্মণের মেয়েকে প্রলুব্ধ ক'রে, তারপর নিজের স্বার্থের জন্য তাকে বর্জন করা কি রকম ক'রে সোজা কথা, সেটা জানবার আমাদের শুধু কৌতূহল নয়, অধিকারও আছে।"

এবার প্রকাশের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। বলিল, "যে কথা আপনি বললেন, তার উপযুক্ত উত্তর দিতে পারতাম, কিন্তু আপনি যে আমার ঘরে আছেন, তা আমি ভুলি নি।" তাহার পর শশিনাথের দিকে ফিরিয়া কহিল, "আপনি আবার আমাকে কি বলবেন তা তো জানি নে, কিন্তু দয়া

ক’য়ে আপনার সঙ্গীটিকে বুঝিয়ে বলুন যে, একজনের বাড়ি চড়াও হ’য়ে এ রকম অপমান করায় কোন পৌরুষ নেই।”

উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশিনাথ কহিল, “অপমানে কাজ নেই, বুঝিয়ে বলবারও দরকার নেই। হরিচরণবাবু আমাদের যা বলতে বলছেন, তা আমরা বলেছি,—এখন আপনি তাঁকে কি বলতে বলেন, তা বলুন।”

প্রকাশ বলিল, “আপনি বলবেন যে, আজই তিনি আমার চিঠি পাবেন।” একটু চিন্তা করিয়া কহিল, “দেখুন, এ বিষয়ে সরযূ আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন সে চিঠির উল্লেখ হরিচরণবাবুর চিঠিতে অনেকবার থাকবে। কিন্তু কয়েকটা কারণে সে চিঠিখানা আমি তাঁর কাছে পাঠাব। আপনারা যদি চিঠিখানা পড়েন, তা হ’লে আপনাদের দিকের খবর জানতে পেরে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ’তে পারবেন। যে কথা সরযূ হরিচরণবাবুকে কিংবা আপনাদের হয়তো বলতে পারবেন না. সে কথাটা আপনারা চিঠি থেকে জেনে যান।” বলিয়া লেটর-প্যাডের ভিতর হইতে সে একখানা চিঠি বাহির করিল।

শশিনাথ কিন্তু সরযূর বিনা সম্মতিতে তাহার পত্র পাঠ করিতে স্বীকৃত হইল না।

প্রকাশ কহিল, চিঠিটা যদি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ কথার না হ’ত, তা হ’লে আমি কখনই কাউকে দেখাতাম না। শুধু তাই নয়, এ চিঠি কেউ দেখলে সরযূর পক্ষে কোন ক্ষতি বা আপত্তির সম্ভাবনা নেই, বরং সরযূর অন্তরের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পেরে, এ ঘটনায় তার কতটা লাভ-লোকসান হ’ল বুঝতে পারবেন। আপনার যদি পড়তে আপত্তি থাকে, আমিই পড়ে শোনাই।—‘শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার দীর্ঘ পত্রখানি পাইয়াছি ও আপনার উপদেশ ও অনুরোধ অনুযায়ী সব কথা সাধ্যমত ভাবিয়া দেখিয়াছি। এ ব্যাপারে আমার নিজের সুখ দুঃখ হিসাব করিবার প্রয়োজন নাই। যে বিবেচনার ফলে আমি আপনার পূর্বপ্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছিলাম, সেই বিবেচনার ফলে আমি আপনার বর্তমান প্রস্তাবেও স্বীকৃত হইলাম; এ কথাটা বাবাকে খুব শীঘ্র না জানাইলে যদি

আপনার কোনো অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে কিছু দিন পরে জানাইবেন। তিনি উপস্থিত এত অসুস্থ যে, রোগের যন্ত্রণার সহিত আমার বিবাহের চিন্তা যোগ না হইলেই ভাল হয়। আশা করি, আপনি কুশলে আছেন, ইতি বিনীতা সরযূ।' এই সরযূর চিঠি—এ থেকে আপনারা বিবেচনা ক'রে দেখবেন, এ ব্যাপারে সরযূর কতটা লাভ-লোকসান হচ্ছে।"

শশিনাথ কহিল, "এ চিঠি থেকে শুধু সেইটেই বিবেচনা করা যাবে না, কারণ সরযূর নিজ পক্ষের কথাটা একেবারেই জানান নি। সে যা হোক, আমরা এখন চললাম। আপনি যেমন বললেন, হরিচরণবাবুকে জানাব।"

পথে বাহির হইয়া বরেন উত্তেজিতভাবে কহিল, "লেখাপড়া শিখেও লোকটা জানোয়ার।"

মৃদু হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "জানোয়ারের প্রতি তুমি অকারণ অবিচার করছ বরেন। জানোয়ার যে এত নীচ, সেটা তোমার অনুমান মাত্র—কোনো প্রমাণ নেই।"

বরেন কহিল, "তা সত্যি।"

দুই বন্ধুতে প্রকাশ-সরযূর বিষয়ে নানাপ্রকার আলোচনা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। প্রকাশের নির্মম অভদ্র আচরণ তাহাদের মনে যেমন সবিরক্তি ঘৃণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, সরযূর নিঃস্বার্থ সংযত চিত্তের পরিচয়ে তাহারা তেমনই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

শীতের আড়ষ্ট রাত্রি হইতে জাগ্রত হইয়া তখনও কলিকাতা কুয়াশার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। রাজপথের দুই ধারে বিপণিশ্রেণী তখনও অধিকাংশ অবরুদ্ধ—বড় বড় তালা ঝুলিতেছে। পথে জনপ্রবাহ—গাড়ি ঘোড়াও বেশি নাই। শশিনাথ ও বরেন প্রশস্ত ফুটপাথের উপর দিয়া প্রকাশ-সরযূর কাহিনী চিন্তা করিতে করিতে চলিল। শশিনাথ ভাবিতেছিল হরিচরণের কথা। এই অশুভ কঠোর সংবাদ হরিচরণ কিরূপে গ্রহণ করিবেন—নিজের সমস্ত বিবেক ও শক্তির সহিত সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সমাজকে বর্জন করিয়া এখ

কিরূপে সমাজের নিকট নতমস্তকে বলিবেন, পরাজিত হইয়াছি, অনুতাপ করিতেছি, নিজের অবিবেচনা ও দুষ্কৃতির দণ্ড পাইয়াছি, এখন ক্ষমা কর—আশ্রয় দাও! উৎপীড়িতা অবমানিতা কন্যার লজ্জা ঘৃণা-মথিত হৃদয়েই বা সান্ত্বনার কোন্ রসায়ন প্রয়োগ করিবেন! বরেন ভাবিতেছিল সরযূর কথা। প্রকাশের এই নির্মম হৃদয়হীন আচরণ কি নিষ্ঠুরভাবে সেই শান্ত-মধুর হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে, অথচ কি সুদৃঢ় সংযমের অন্তরালে সেই গভীর ক্ষত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! মুখের নির্মল হাসির নীচে প্রাণের যে অব্যক্ত যন্ত্রণা নিহিত রহিয়াছে—কাহার সাধ্য সন্দেহের নেত্রেও তাহার সন্ধান পায়? পিতার স্বাস্থ্য-শান্তির নিকট আপনার দুঃখ-গ্লানি একেবারে নীরব! এ কি ঐকান্তিক ভক্তি! এ কি পবিত্র নিষ্ঠা! এই ভক্তি-প্রীতি-স্নিগ্ধ অমূল্য হৃদয়খানির ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াও প্রকাশকে বঞ্চিত হইতে হইল। হায় হতভাগ্য প্রকাশ! বরেন তাহার নিজের হৃদয়ের মাপকাঠি দিয়া প্রকাশের ক্ষতি মাপিয়া দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত হইল।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শশিনাথ কহিল, "সরযূর কথা ভাবছ বরেন?"

চমকিত হইয়া বরেন কহিল, "ঠিক তাই ভাবছি। তার ওপর প্রকাশ কি জুলুমটাই করলে!"

"তার জন্যে প্রকাশের ওপর তোমার খুব রাগ হচ্ছে?"

"অন্তত অনুরাগ তো হচ্ছে না।"

নিরীহভাবে শশিনাথ কহিল, "আমার তো মনে হয় অনুরাগই হচ্ছে।"

"কার ওপর?"

"দুজনেরই ওপর—প্রকাশ সরযূকে ত্যাগ করেছে ব'লে প্রকাশের ওপর, আর সরযূ প্রকাশের দ্বারা ত্যক্ত হয়েছে ব'লে সরযূর ওপর।"

শশিনাথের পৃষ্ঠে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বরেন কহিল "ইষ্টুপিড্, তোমার প্রবৃত্তি ভারি নীচ। একজনের মুখের গ্রাস ছাড়তে না ছাড়তে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ?"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "আমি, না, তুমি?"

কথাটার মধ্যে কিন্তু খানিকটা সত্যও ছিল। মেসে যখন উত্তপ্ত হইয়া বরেন প্রকাশের সহিত বচসা করিতেছিল, তখন সেই ক্রোধের মধ্যেই একটু যেন অতি ক্ষীণ আনন্দের আভাস অকারণে তাহার হৃদয়ের মধ্যে দেখা দিতেছিল। সে আনন্দের মূল যে কোথায়, কোথায় তাহার উৎপত্তি, কিসে তাহার চরিতার্থতা, কেমন করিয়া তাহার জন্ম, তাহা সম্পূর্ণ অগোচর ছিল—গোচর শুধু ছিল তাহার অতি-সূক্ষ্ম অস্তিত্ব হেমন্ত-প্রভাতের অতি-মন্দ শীতল বায়ুর মত যাহা বোঝা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। কিন্তু শশিনাথ যখন পরিহাসের সোনার কাঠি দিয়া বরেনের নিদ্রাচ্ছন্ন হৃদয়কে স্পর্শ করিল, তখন স্বপ্নোত্থিতা রাজকন্যার ন্যায় তাহার হৃদয়ের মধ্যে সেই মুহূর্তে আতুর আনন্দ মূর্তি ধরিয়া একেবারে জাগিয়া বসিল। তখন আর তাহার স্বরূপ কিছু মাত্র অনির্ণীত রহিল না। কলিকাতার রাজপথের উভয়-পার্শ্বস্থিত সৌধশ্রেণী গাড়ি-ঘোড়া লোকজন মুহূর্তের মধ্যে লুপ্ত হইয়া বরেনের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল সেদিনকার বিলাসপুরের প্রত্যুষের সেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ চক্ষে বারান্দা হইতে দেখিতে-পাওয়া সরযূর স্নিগ্ধ সুন্দর মূর্তিখনি। ফোটোগ্রাফের প্লেটে চিত্র যেমন অদৃশ্য হইয়া প্রচ্ছন্ন থাকে, রাসায়নিক-জলে স্নাত হইলেই দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠে—তেমনই সরযূর সৌন্দর্যের যে স্বরূপ এতদিন অসম্ভাব্যতার অন্ধকারে নিদ্রিত হইয়াছিল, আজ তাহা বরেনের চকিত-চেতন-হৃদয়ে সম্ভাবনা-আশায় আর্দ্র হইয়া সুস্পষ্ট রেখায় জাগিয়া উঠিল।

পথের একটা মোড়ে উপস্থিত হইয়া বরেন কহিল, "আমি তা হ'লে চললাম শশি, বৈকালে দেখা দিয়ো।"

দৃঢ়বলে বরেনের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া শশিনাথ কহিল, "তা হচ্ছে না। হরিচরণবাবুর কাছে আমি প্রতিশ্রুত হ'য়ে এসেছি যে, তোমাকে নিয়ে যাব। তা ছাড়া প্রকাশের বিষয়ে খবর দেবার সময়ে তুমি উপস্থিত থাকা দরকার।"

আর একবার চেষ্টা করিয়া বরেন যখন দেখিল যে, শশিনাথ নাছোড়বন্দ, তখন আর আপত্তি না করিয়া বলিল, "চল, যাই।"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "এরই মধ্যে এত লজ্জা কেন হে?"

বরেন কহিল, "তোমার নিলজ্জতা দেখে।"

এতদিন ইচ্ছা করিয়াই বরেন যতটা সম্ভব হরিচরণের বাড়ি যাওয়া বাদ দিয়া চলিতেছিল। গৃহে একমাত্র যুবতী বাগদত্তা কন্যাকে অশ্রয় করিয়া হরিচরণ রহিয়াছেন—সেখানে ঘন ঘন গতিবিধি, বরেন, শুধু অনাবশ্যক নহে, অশোভনও মনে করিত। আজ কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, প্রভাতের অচিন্তনীয় ঘটনা সেই নৈতিক বাধাকে দুরীভূত করিয়া দিয়াছে। মনে হইতেছিল, তাহার সুদুর্লভপূর্বা মুগ্ধকারিণীর সমীপে উপস্থিত হইবার আজ যেন তাহার অনধিকার নাই। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতেছিল, প্রকাশ যেন এতাবৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল,,—আজ তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে।

১১

মুখ ধুইয়া হরিচরণ শয্যার উপর বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। সরযূ এক পেয়ালা গরম দুধ আনিয়া বলিল, "বাবা, দুধ এনেছি।"

হরিচরণ কহিলেন, "টেবিলের উপর রাখ, একটু পরে খাব।" তাহার পর কুঞ্চিত-চক্ষে কন্যার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ সরযূ, প্রকাশের কোন চিঠিপত্র এখানে এসে পেয়েছ?"

দুধের বাটি রাখিতে মুখ ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে সরযূ কহিল, "না, এখানে পাই নি।"

কাল শশিকে প্রকাশের খবর নিতে বলেছিলাম, সে এসে কোন খবর দিয়ে গেছে কি ?"

"না, তিনি আর আসেন নি।"

হরিচরণ শশিনাথকে প্রকাশের সংবাদ লইতে বলিয়াছেন শুনিয়া সরযূ শঙ্কিত হইল। প্রকৃত সংবাদ লইয়া শশিনাথ যখন হরিচরণের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন হরিচরণ মনের মধ্যে কি নিদারুণ আঘাত পাইবেন, তাহা ভাবিয়া সরযূ চিন্তিত হইয়া উঠিল। বেদনা ও বিস্ময়ের বেগকে কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে হরিচরণকে প্রকাশের মত পরিবর্তনের বিষয়ে অল্প একটু জানাইয়া রাখিবার আগ্রহে সরযূ ডাকিল, "বাবা!"

কন্যার বদ্ধ-গভীর স্বরে চকিত হইয়া হরিচরণ কহিলেন, "কি বাবা ?"

"এ বিষয় নিয়ে তাঁকে বেশি পীড়াপীড়ি ক'রে কাজ নেই।"

"কাকে ?"

একটু ইতস্তত করিয়া সুস্পষ্ট কণ্ঠে সরযূ কহিল, "মাস্টার মশায়কে।"

কন্যার বাক্যের ব্যঞ্জনায় বিস্মিত হইয়া হরিচরণ কহিলেন, "আমি তো তোমার কথা বুঝতে পাচ্ছি নে মা! কোন বিষয়ে তাকে পীড়াপীড়ি ক'রে কাজ নেই ?"

মুহূর্তের জন্য সরযূর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু কর্তব্য-বুদ্ধির উপরোধে সঙ্কোচ ও কুণ্ঠাকে অতিক্রম করিয়া সে ধীরভাবে কহিল, "যদি তিনি তাঁর মত বদলে থাকেন, তা হ'লে বিয়ে সম্বন্ধে তাঁকে পীড়াপীড়ি করে কাজ নেই।"

শুনিয়া হরিচরণের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। উদ্বেগ-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, "কেন মা ? সে কি কোন কথা তোমাকে জানিয়েছে ?"

দ্বিধা-কুণ্ঠিতস্বরে সরযূ কহিল, "হ্যাঁ, কতকটা জানিয়েছেন, তবে শেষ-কথা এখনও জানান নি।" তাহার পর হৃদয়ের সমগ্র শক্তিকে আহ্বান করিয়া অবিচলিত-কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু বাবা, তাঁর কাছে থেকে শেষ কথার জন্যে

অপেক্ষা করবারই বা কি আবশ্যক আছে? আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমাদের কোন অমত হবে না।"

হরিচরণ বুঝিলেন, প্রকাশের প্রতি এ উত্তর সরযূর পক্ষে দুর্জয় অভিমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই অভিমানের পিছনে স্নেহময়ী কন্যার বিপুল বেদনা উচ্ছল রহিয়াছে অনুমান করিয়া ঘৃণা, দুঃখ ও অপমানে রোগশীর্ণ হরিচরণের চক্ষু কোটরের মধ্যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিতে লাগিল। মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরিত হইল না; রুদ্ধরোষে সমস্ত দেহ মন কঠিন হইয়া উঠিল। সমাজের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হওয়ার এই পুরস্কার! এই লঘুচিত্তের জন্য কর্তব্যের গুরুভার মস্তকে বহন করিয়া মরিতে হইয়াছে!

হরিচরণের ক্লিষ্ট ভাব দেখিয়া সরযূ অতিশয় ব্যথিত হইল। প্রকাশের এই ব্যবহার তাহার প্রাণে যতটুকু বাজিয়াছে, সেই বেদনাকে হরিচরণ দশ গুণ অনুমান করিয়া মনে মনে যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন ভাবিয়া সরযূ অধীর হইয়া উঠিল। বাহুভরে হরিচরণের শয্যার উপর নত হইয়া হরিচরণের পায়ের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে কহিল, "বাবা, এর জন্যে আর দুঃখ কি আছে? তুমি তো তাঁরই জন্যে রাজি হয়েছিলে, আরও একবার তাঁর কথাতেই রাজি হও।"

পতিহারা জননী শোকাতুর সন্তানকে সান্ত্বনা দিলে সন্তানের হৃদয় যেমন আলোড়িত হইয়া উঠে, সরযূর মুখ হইতে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়া হরিচরণ তেমনি বেদনা অনুভব করিলেন। বৈশাখের তপ্ত খর আকাশের মত ক্রোধ যে-চক্ষুকে এতক্ষণ শুষ্ক করিয়া রাখিয়াছিল, দুঃখের করুণতা তাহাকে আষাঢ়ের নব-নীরদের মত সজল করিয়া আনিল। নিগূঢ় সহানুভূতিভরে সরযূর অনাবৃত মস্তকে হাত রাখিয়া হরিচরণ কহিলেন, "মা, তুমি কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে?"

মাথা তুলিয়া তাহার স্নিগ্ধায়ত চক্ষু সভক্তি-বিশ্বাসভরে পিতার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সরযূ কহিল, "তুমি করলেই আর তুমি বললেই পারব। তুমি

তো বল বাবা, সকল দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই ভগবানের মঙ্গল হাত থাকে, তবে এ ঘটনা আমরা বাদ দোব কেন?"

সংসারের মধ্যে একমাত্র বন্ধন এই কন্যাটির সহিত হরিচরণের এবং অপর পক্ষে হরিচরণের সহিত সরযূর সাধারণত পিতাপুত্রীর মধ্যে যেরূপ আচরণ দেখা যায়, ঠিক সেরূপ ছিল না। অনন্যনির্ভর শ্রদ্ধা ও স্নেহকে অবলম্বন করিয়া উভয়ের মধ্যে এমন একটা সঙ্কোচহীনতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যাহা সাধারণত জননী-কন্যার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু পিতার কর্তব্য পালন করিয়াই হরিচরণ নিরস্ত থাকিতেন না, জননীর অংশও তিনি পূর্ণ করিতেন! সেই জন্য সরযূও জনকের ন্যায় হরিচরণকে সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা করিত এবং জননীর ন্যায় অসঙ্কোচে ভালবাসিত।

কন্যার কথা শুনিয়া হরিচরণ প্রগাঢ় স্নেহভরে কহিলেন, "না মা, কখনই আমরা বাদ দোব না। এ ঘটনার মধ্যেও ভগবানের মঙ্গল-হাত আছে। এ থেকে মঙ্গলই হবে, কোন অমঙ্গল হবে না।" বলিয়া কন্যার মস্তক দুই হস্তের মধ্যে ধারণপূর্বক চক্ষু নিমীলিত করিয়া ঐকান্তিক চিত্তে কন্যাকে আশীর্বাদ করিলেন। পিতার সেই নীরব আশীর্বচন হৃদয়ের মধ্যে পূর্ণভাবে গ্রহণ ও অনুভব করিয়া অন্তরের নিভৃত নিলয়ে যেটুকু মালিন্য ছিল, তাহা হইতে সরযূ মুক্তিলাভ করিল।

পূর্বদিকের জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে নবোদিত সূর্যের স্বর্ণকিরণ নিষ্কলঙ্ক পুণ্যের ন্যায় প্রবেশ করিতেছিল। সেই অনুদীপ্ত স্নিগ্ধ রশ্মিজাল সরযূর হৃদয়ের মধ্যে আশা ও সান্ত্বনার চেতনা সঞ্চার করিল। নিবিড় কুজ্ঝটিকার আবরণে হৃদয় ছিল আচ্ছন্ন, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া সরযূ চিত্তের মধ্যে স্বচ্ছন্দতা বোধ করিল।

সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া হরিচরণ কহিলেন, "শশিনাথ বোধ হয় আসছে।"

বারান্দায় বাহির হইয়া সরযূ দেখিল, শশিনাথ ও তাহার পশ্চাতে বরেন উপরে আসিতেছে।

সহসা সরযূকে সম্মুখে দেখিয়া উভয়েই বিপন্ন বোধ করিল। প্রকাশের মেসে সন্ত-লব্ধ জ্ঞানে তখনও তাহারা চকিত হইয়া ছিল; সরযূর সহিত সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই হইবে জানা থাকিলেও, প্রথমেই সরযূকে সম্মুখে পাইয়া তাহারা কি করিবে বা বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

সুমিষ্ট হাস্যের আহ্বানে তাহাদিগকে বিমূঢ় অবস্থা হইতে মুক্তি দিয়া সরযূ কহিল, "আসুন। বাবা আপনাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

শশিনাথ বা বরেনকে উত্তরের কোন কথা খুঁজিয়া পাইবার অবকাশ না দিয়া সরযূ ঘরে প্রবেশ করিয়া দুইখানি চেয়ার হরিচরণের শয্যার নিকট স্থাপিত করিল, এবং আগন্তুকদ্বয় প্রবেশ করিবামাত্র ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল।

যে দুঃসহ দুঃসংবাদ প্রকাশের নিকট হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিল, সরযূর সম্মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে না দেখিয়া শশিনাথ উৎকণ্ঠার হস্ত হইতে অর্ধবিমুক্ত হইল। আর কালবিলম্ব না করিয়া শশিনাথ বলিল, "আমরা প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে আসছি।" কিন্তু তাহার পর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া সহসা থামিয়া গেল।

মুহূর্তের জন্য হরিচরণের অপ্রসন্ন মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা দিল। কালো মেঘের ভিতর ক্ষীণ বিদ্যুৎস্ফুরণ হইলে যেমন হয়, কতকটা সেইরূপ। কিন্তু তখনই নিজেকে সংযত করিয়া সহজভাবে কহিলেন, "তোমাদের বৃথাই কষ্ট দিলাম। তার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংস্রব নেই।" তাহার পর কিছু পূর্বে সরযূর সহিত যে-সকল কথা হইয়াছিল, তাহা উভয়কে ধীরে ধীরে শুনাইলেন।

নিবিষ্টচিত্তে হরিচরণের সকল কথা শুনিয়া শশিনাথ বলিল, "আমরা সরযূর কি অদ্ভুত হৃদয়ের পরিচয় পেলাম! এ রকম সংযম যে কোন উচ্চশিক্ষিত পুরুষের পক্ষেও গৌরবের কথা।"

বরেন কহিল, "তার এক কণাও যদি প্রকাশের থাকত! আমার মনে হয়,

প্রকাশ সরযূর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ব'লেই ভগবান এ মঙ্গল-বিধান করেছেন, এর মধ্যে দুঃখ করবার কিছু নেই।"

তাহার সহজ—সরল ভঙ্গিতে বরেন আরও কি বলিত বলা যায় না, কিন্তু সহসা বন্ধু শশিনাথের মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। শশিনাথের দুই চক্ষে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের তরল দীপ্তি হাস্য করিতেছিল। তাহার নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিয়া সপ্রতিভ বরেনের মুখও ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

হরিচরণ কহিলেন, "তুমি যা বলছ, বরেন, তা খুবই সত্য, কিন্তু জ্ঞান আমাদের এত সঙ্কীর্ণ, দৃষ্টি এতই ক্ষীণ যে, সব সময়ে আমরা অশুভের মধ্যে শুভের সন্ধান পাই নে। দুঃখ যে অনেক সময়ে সুখের প্রবেশ-পথ—জীবনের পথ চলতে চলতে এ অভিজ্ঞতা তো আমরা বারম্বার লাভ করেছি। প্রকাশের এই ব্যবহারের মধ্যেও যে ভগবানের মঙ্গল-হাত থাকতে পারে তা সরযূও একটু আগে আমাকে বোঝাচ্ছিল।"

কথাটার ঠিক এইখানে সরযূ প্রবেশ করিল। হস্তে তাহার একটি পরিচ্ছন্ন জরমন-সিলভার ট্রের উপর দুউজনের উপযোগী তপ্ত চা ও কিছু খাবার। একটি টিপাই শশিনাথ ও বরেনের নিকট স্থাপিত করিয়া সরযূ তাহার উপর চায়ের পাত্র রাখিল।

সরযূর আকস্মিক আবির্ভাবে প্রসঙ্গটি থামিয়া গেল। হরিচরণ অন্যমনস্ক হইয়া ধূমায়মান চায়ের পেয়ালার প্রতি কুঞ্চিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, বরেন শীতের প্রত্যুষে সমুপাগত সেই স্বর্ণকান্তি তপ্ত চায়ের সুগন্ধে লুব্ধ হইয়া উঠিল এবং শশিনাথ অসঙ্গত মৌনতাকে আর অধিককাল স্থায়ী হইতে দেওয়া অশোভন হইতেছে মনে করিয়া কথা কহিল।

"সরযূ, তুমি চায়ের যা আয়োজন এনেছ, তা দুজনের পক্ষে যথেষ্টের বেশি হলেও একা বরেনের পক্ষে বেশি নয়। আমি বাড়ি থেকে চা খেয়েই বেরিয়েছি অতএব বরেন ওটা সম্পূর্ণই নিতে পারে।"

ব্যস্ত হইয়া সরযূ কহিল, "চায়ের জল তৈরি রয়েছে, আমি আপনার জন্যে চা নিয়ে আসছি।"

সরযূকে লক্ষ্য করিয়া বরেন একটু কাতরভাবে কহিল, "আমি যে অতিমাত্রায় পেটুক, তা আপনি এত সহজে ওর কথায় বিশ্বাস করেন কেন? আপনার কি বাস্তবিকই বিশ্বাস হয় যে এতখানি চা আর খাবার একজনের খোরাক?"

অপ্রতিভ হইয়া সরযূ মৃদুহাস্য করিয়া কহিল, "এ তো তেমন কিছু বেশি নয়! এ বিশ্বাস হবে না কেন?"

সকৌতুকে শশিনাথ কহিল, "বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা তো নয় সরযূ, জ্ঞানের কথা। বিলাসপুরের বরেনের লুচি খাওয়ার কথা আশা করি এখনও তোমার মনে আছে। তিন ডজন লুচি খাওয়ার পর সেই ক্ষীর খাওয়ার প্রস্তাব ভুলে যাও নি নিশ্চয়?"

স্মিতমুখে সরযূ কহিল, "না না অত নয়। আপনি বড় বাড়াচ্ছেন।"

একটু উত্তেজিত হইয়া বরেন কহিল, "তা বাড়ান; কিন্তু ক্ষীর দিয়ে লুচি খাওয়ার প্রস্তাবটা কি অন্যায় শুনি? সুস্থ ভদ্র ব্যক্তি মাত্রেই ক্ষীর দিয়ে লুচি খেয়ে থাকে।"

আহার লইয়া দুই বন্ধুর কপট কলহ ও তন্মধ্যে কন্যার সকুণ্ঠ অবস্থা দেখিয়া হরিচরণ মনে মনে বিশেষ কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন। বরেনের কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ বরেন, সুস্থ ভদ্রব্যক্তি মাত্রেই ক্ষীর দিয়ে লুচি খেয়ে থাকে—ও প্রস্তাব একটুও অন্যায় নয়। খেতে পারায় লজ্জার কথা কিছু নেই—না খেতে পারাই লজ্জার কথা। শশি তোমাকে যে গৌরব দিচ্ছেন, একদিন আমার সামনে তার পরীক্ষা হোক।" তাহার পর কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আজ হতে পারে না কি মা?"

একটু চিন্তা করিয়া সরযূ বলিল, "হ্যাঁ, আজ রাত্রেই হবে।"

তখন হরিচরণ রাত্রে আহার করিবার জন্য শশিনাথ ও বরেনকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

প্রকাশের ঘটনা সকলের মনে যে বিষন্নতা অনিয়াছিল, এই আহার প্রসঙ্গের কৌতুক পরিহাসে তাহা অপসৃত হইয়া সকলের মন আবার লঘু হইয়া গেল।

১২

কয়েক দিন পরে অপরাহ্নে উর্মিলা তাহার ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট-মনে রামায়ণ পড়িতে ছল। লক্ষ্মণ তখন মায়ামৃগের পশ্চাতে নিরুদ্দেশ এবং ছদ্মবেশী রাবণ ভিক্ষার ছলনায় দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময় শশিনাথ ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "বউদি!"

পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া হাস্যমুখে উর্মিলা কহিল, "কি ঠাকুরপো, স্বর্ণমৃগ ধরে এনেছ নাকি?"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "বাস্তবিকই ধরে এনেছি, দেখবে এস।"

উর্মিলা কহিল, "তা হলে এই খানেই নিয়ে এস। গণ্ডীর বাইরে যেতে ভয় হয়।"

একটু ব্যস্ত হইয়া শশিনাথ কহিল, "না বউদি, শিগগির উঠে এস, আমার একটি বন্ধু লীলাকে দেখতে এসেছে। এ যদি বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, অর্থ—সব বিষয়ে আমার চেয়ে ভাল না হয়, তা হ'লে তুমি আমাকে যা করতে বলবে তাই করব।"

লীলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব শশিনাথ প্রত্যাখ্যান করায় উর্মিলার মনে প্রবল অভিমানের বেদনা জাগিয়াছিল। ক্রমশ তাহার প্রবলতা কমিয়া আসিলেও অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে সে বলিল, "ও আমি চাই নে।"

শশিনাথ হাসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে তুলনা করেছি ব'লে মন উঠল না বুঝি? তা হ'লে সেটুকু শুধরে নিচ্ছি। দেখতে দাদার চেয়ে ভাল, লেখাপড়ায় দাদার চেয়ে ভাল, আর অর্থে দাদাকে তিনবার কিনতে পারে! মোটরটা রাস্তায় রয়েছে, দেখলেই বুঝতে পারবে। সাইলেণ্ট মিনার্ভা—আঠার হাজার টাকা দাম।"

কপট-ক্রোধে ঊর্মিলা কহিল, "দাদার উপমা দিলেই মনে করেছ নাকি আমি ভুলে যাব?"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "ভোলা তো উচিত। পতিব্রতাদের লক্ষণই হ'ল তাই।"

ঊর্মিলা হাসিয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল?—কথার ধুকড়ি হচ্ছ তুমি।"

শশিনাথ কহিল, "অতএব কথা-কাটাকাটি না ক'রে শিগগির গিয়ে দাদাকে পাঠিয়ে দাও। বলো, প্রিয় মুখুজ্জের ছেলে সুধীর। তা হ'লেই তিনি ব্যাপারটা বুঝবেন, আর তোমরাও তখন বুঝতে বাকি থাকবে না।"

প্রস্থানোদ্যত হইয়া শশিনাথ কহিল, "কিছু পান বাইরে পাঠিয়ে দাও। আর দেখ, কাল যে গোকুল-পিঠে করেছিলে, আর আজ সকালে যে কাটলেট ভেজেছিলে, তার কিছু আছে কি? তোমার হাতের রান্না খাওয়ালে লোভ আরও একটু বেড়ে যাবে।"

মুখে ব্যঙ্গসূচক শব্দ-বিশেষ বাহির করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ঊর্মিলা কহিল, "কত রঙ্গই জান!"

হাসিতে হাসিতে শশিনাথ প্রস্থান করিল।

সোমনাথ তখন পাশের ঘরে জমাখরচের হিসাবে মগ্ন ছিল। জমার চেয়ে খরচ বেশি অথচ হাতে কিছু টাকা থাকিতেছে এ দুর্ভেদ্য রহস্যের কোন মীমাংসা হইতেছিল না, এমন সময়ে ঊর্মিলা আসিয়া সংবাদ দিল কোন প্রিয় মুখুজ্জের পুত্র কে সুধীর লীলাকে দেখিতে আসিয়াছে।

শশিনাথ যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঠিক। উর্মিলার কথা শুনিয়া সোমনাথের মন এবং সোমনাথের কথা শুনিতে শুনিতে উর্মিলার মন বিস্ময়ে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সুধীর স্বর্গীয় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র, এবং বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী। শুধু তাহাই নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সে একটি উজ্জ্বল রত্ন। অর্থাৎ লক্ষীর বরপুত্র এবং বাণীর প্রিয়পাত্র।

সোমনাথ কহিল, "অনেক পুণ্য থাকলে লীলার এ বিয়ে হবে। আমি বাইরে চললাম। তুমি লীলাকে একটু পরিষ্কার করে রাখ।"

উর্মিলা কহিল, "লীলাকে সাজিয়ে দেখাবার কোন দরকার নেই। চোখে যদি লাগবার হয়, এমনিই লাগবে।"

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, "নিজের ঘটনা থেকে তোমার দুঃসাহস জন্মে গেছে দেখছি। এ চোখ জোড়া চুরি ক'রে ছাতের উপর থেকে যে বস্তু দেখত, তুমি কি মনে কর জগতের সব বস্তু সেই একই রকম দেখতে ?"

অপ্রতিভ হইয়া উর্মিলা কহিল, "সে কথা নয়। চুরি করা জিনিস মিষ্টি লাগে। চুরি ক'রে দেখতে বলে ভাল লাগত, বস্তুর কোন গুণ ছিল না।"

স্নেহভরে পত্নীর নাসিকা নাড়িয়া দিয়া সোমনাথ কহিল, "তা নয় গো, তা নয়। জগতের সব বস্তু এমনিই সুন্দর দেখায়, আবার কোন বস্তু সোনায় মুড়ে দিলেও ভাল দেখায় না।"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "সে তুমি আমাকে ভালবাস বলে ভাল দেখ, নইলে লীলা আমার চেয়ে দেখতে অনেক ভাল।"

গর্বিতস্বরে সোমনাথ কহিল, "তা হলে বুঝতে পাচ্ছ, লোকটা আমি কি রকম খাঁটি ? স্ত্রীর চেয়ে শালীকে সুন্দর দেখে না সংসারে এমন লোক বিরল।"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "ইশ, সাধুপুরুষ ! আর ছাদ থেকে যখন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখতে, তখন কি হত ? তখন তো আমি স্ত্রী ছিলাম না, শালীও ছিলাম না।"

"ছিলে না, কিন্তু হ'লে তো!"

"আর না যদি হতাম?"

"না হলে বুঝতাম, আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ।"

সোমনাথের কথা শুনিয়া ঊর্মিলা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "সত্যি বলছি তুমি যখন তাকিয়ে আমাকে দেখতে তখন আমার লজ্জাও করত, ভয়ও করত আর—"

"আর কি?"

একটু ইতস্তত করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া ঊর্মিলা কহিল, "আর ভালও লাগত।"

বিস্মিতভাবে সোমনাথ কহিল, "ভালও লাগত? তখন তো আমি স্বামী ছিলাম না, যদি আমার সঙ্গে বিয়ে না হ'ত?"

"তা হলে বুঝতাম আমারও অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ।" বলিয়া ঊর্মিলা হাসিয়া ফেলিল।

কিন্তু হাসিয়াই সে গম্ভীর হইয়া গেল। অদৃষ্টের প্রসঙ্গে তাহার পূর্ব-জীবনের ইতিহাস মনে পড়িল। সে যে কি ভীষণ দুঃখ-কষ্টের কাহিনী, তাহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। বাল্যকালে পিতামাতার মৃত্যুর কথা বেশ মনে পড়ে। মাতার মৃত্যুর কথা মনে পড়ে না, কিন্তু পিতার মৃত্যুর কথা বেশ মনে পড়ে। সে হৃদয় বিদারক দৃশ্য ভুলিবার নহে। মৃত্যু-শয্যায় পিতা সজল নেত্রে তাহাদের দুইটি বোনকে মামার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, যতদিন পর্যন্ত তাহারা সৎপাত্রে না পড়ে ততদিন মামা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। পিতার মৃত্যুর পর মামা তাহাদের পিতার বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা ও তাহাদের দুটি বোনকে লইয়া দূর পশ্চিমের এক শহরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি যন্ত্রণার এক নূতন ধারার সূত্রপাত হইল। মামীর কথা মনে পড়িতে ঊর্মিলা শিহরিয়া উঠিল। উঃ, সে তো মানবী নহে, ঠিক যেন

নিগ্রহ-নিপীড়নের রক্তমাংস নির্মিত যন্ত্র। পাঁচ বৎসর তাহার হস্তে কি যন্ত্রণাই না ভোগ করিতে হইয়াছিল—বিশেষত লীলাকে লইয়া! নিজের দুঃখ-কষ্টের জন্য উর্মিলা তত কাতর হইত না, কিন্তু নিরপরাধা লীলাকে সেই সজীব যন্ত্র যখন নির্দয়ভাবে পেষণ করিত তখন যন্ত্রণায় উর্মিলার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইবার উপক্রম করিত। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর নিপীড়িত হইয়া মামার পীড়া উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন। তাহার পর সেই স্মরণীয় শুভ-দিনের কথা মনে পড়িল, যে-দিন পিসীমার সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ, তাহাদের দুঃখ অবসান করিবার জন্য যেন স্বর্গের দেবী ছাদে আবির্ভূত হইলেন। তাহার কয়েক দিন পরেই এই দেবপ্রতিম স্বামীর পদতলে আশ্রয়লাভ। তদবধি কয়েক বৎসর শুধু আনন্দ, সুখ, তৃপ্তি, শান্তি। উর্মিলা মনে মনে সোমনাথের দুইটি পা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

হিসাবের খাতাপত্র বন্ধ করিতে করিতে সোমনাথ কহিল, "হঠাৎ অত গম্ভীর হ'য়ে গেলে কেন? কি ভাবছ?"

সোমনাথের কথায় উর্মিলার চমক ভাঙিল। মৃদু হাসিয়া কহিল, "ভাব-ছিলাম, তুমি যদি দয়া ক'রে আমাকে আশ্রয় না দিতে, তা হ'লে আমার কি দুর্দশা হ'ত।"

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, "এই সহজ কথার জন্য এত ভাবনা? এ আর বুঝতে পারছ না? তুমি কৃপা ক'রে আমার ঘর আলো না করলে যা হ'ত তাই।"

আরও কতক্ষণ এ দুইটি প্রাণীতে এরূপ আলোচনা চলিত বলা যায় না। ত্বরিত চটিজুতার চট্‌পট্ শব্দে উভয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল; এবং পরক্ষণেই শশিনাথ প্রবেশ করিয়া কহিল, "দাদা, সুধীর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না বলছে। তুমি একবার দেখা কর।"

অপ্রতিভ হইয়া সোমনাথ কহিল, "হ্যাঁ, আমি এখনই যাচ্ছিলাম।" তাহার পর প্রস্তাবিত সম্বন্ধের বিষয়ে নিজের পরিপূর্ণ অভিমত জানাইয়া, ও যাহাতে

প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় সে বিষয়ে শশিনাথকে বিশেষ যত্ন করিতে বলিয়া সোমনাথ প্রস্থান করিল।

শশিনাথ কহিল, "বউদি, সত্য ক'রে বল, এ সম্বন্ধ তোমার পছন্দ হয়েছে কি-না ?"

উর্মিলা বলিল, "পছন্দ হয়েছে, তবে সত্য কথা যদি চাও, তা হ'লে বলি, তুমি রাজি হ'লে আমি এ একটুও চাই নে।"

এক মুহূর্ত নির্বাক হইয়া শশিনাথ উর্মিলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, "লীলার বিয়ের হাঙ্গামটা আগে মিটে যাক, তারপর ভাল ক'রে তোমার চিকিৎসা করাতে হবে। তোমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে।"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "যদি বিশ্বাসই না করবে তবে জিজ্ঞাসা করছ কেন ?"

শশিনাথ কহিল, "তোমার কথা বিশ্বাস করছি ব'লেই তো বলছি, তোমার মাথার ঠিক নাই। যাক, এখন সে-সব কথা থাক্, লীলাকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে দাও।"

মৃদু হাসিয়া উর্মিলা কহিল, "পরিষ্কার হ'য়েই আছে। তুমি গিয়ে দেখ, পরিচ্ছন্ন করতে হবে কি না !"

কপট-ক্রোধে শশিনাথ কহিল, "আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল যে, তোমাকে বলতে গিয়েছিলাম। তুমি তো বৈরীর দলে।"

স্মিতমুখে উর্মিলা কহিল, "না গো না, আমি দেখেছি, সে গা ধুয়ে এসে পরিষ্কার হ'য়ে আছে ; সাজাবার দরকার নেই। আমি চললাম তোমার বন্ধুর আর তোমার খাবার সাজাতে। তোমার ঘরের সামনে বারান্দায় খান-চারেক চেয়ার আর একটা ছোট পাথরের টেবিলে তোমাদের দুজনের খাবার রাখছি। সেইখানে লীলাকে দেখিয়ো।"

"তথাস্তু। আমি ততক্ষণ লীলার অবস্থাটা চাক্ষুষ দেখে আসি।" বলিয়া শশিনাথ লীলার উদ্দেশে তাহার ঘরের দিকে চলিল।

লীলা তখন চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্ট-মনে এক খণ্ড মখমলের উপর রেশমের ফুল তুলিতেছিল। পশ্চিম দিকের জানালার ফাঁক দিয়া সূর্যের কিরণ তাহার মুখের এক পাশে পড়িয়া বিচিত্র কাব্য রচনা করিয়াছিল। ঘন কৃষ্ণ কেশের রাশি শিথিল-সম্বন্ধ হইয়া কাঁধের উপর ঝুলিতেছিল, এবং তাহার সদ্য-স্নাত দেহ হইতে একটি অপূর্ব কমনীয় কান্তি নিঃসরিত হইতেছিল। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে সৈনিক যেমন শাণিত অস্ত্রের প্রতি সানন্দ-বিশ্বাস চাহিয়া থাকে, শশিনাথ তেমনই লীলার দীপ্ত সৌন্দর্যের প্রতি সানন্দ বিশ্বাসে চাহিয়া রহিল। নিঃসন্দেহে সে মনে মনে বুঝিল যে-স্থল লক্ষ্য করিয়া আজ এই তীক্ষ্ণধার অস্ত্রটি প্রয়োগ করা হইবে, তথায় তাহা গভীর-ভাবেই বিদ্ধ করিবে।

"লীলা!"

একটু চমকিত হইয়া লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কি শশিদা?"

নিবিষ্টভাবে লীলার আপাদমস্তক দুই-তিন বার নিরীক্ষণ করিয়া শশিনাথ কহিল, "লীলা, তোমার সেই কালো রঙের মাদ্রাজি শাড়িটা আজ একবার পরলে কেমন হয়?"

এ কথার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে একেবারে অক্ষম হইয়া লীলা হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "বাড়িতে শুধু শুধু সে শাড়ি পরে কি হবে?"

শশিনাথ কহিল, "বাড়িতে কেন? ধর যদি একটু বেড়িয়েই আসা যায়! আমাদের বাড়ির সামনে একটা মোটর দাঁড়িয়ে আছে, দেখেছ তো!"

"না।" বলিয়া লীলা জানালার ধারে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, "উঃ, খুব বড় মোটর তো! কার মোটর শশিদা?"

শশিনাথ কহিল, "ধর, মোটরটা আমাদেরই হবার উপক্রম করেছে।"

"কেনা হবে নাকি?"

"হ্যাঁ, একরকম কেনাও বলা যেতে পারে।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া লীলা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "শশিদার কাছ থেকে কখনও যদি কথার সোজা উত্তর পাওয়া যাবে।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া শশিনাথ কহিল, "লীলা, তোমার কানের হীরের ট্যাপটা বার করতে বেশি দেরি হবে কি?"

"সেটাও পরতে হবে নাকি?"

"হ্যাঁ, মোটরের উপযোগী দুই-একটা জিনিস তো দেখানো চাই।"

সহাস্যে লীলা কহিল, "আর কিছু বলবার আছে?"

চিন্তিতভাবে শশিনাথ কহিল, "আর? কাপড়ের সঙ্গে মানান ক'রে সেই কালো ব্লাউসটাও প'রো।"

"দিদি জামাইবাবু এঁরাও যাবেন তো?"

শশিনাথ কহিল, "সে সব পরের কথা পরে হবে। তুমি তৈরি হ'লেই আমরা বউদির কাছে যাব। আমি বারান্দায় দাঁড়াচ্ছি, ঠিক তুমি তিন মিনিটে প্রস্তুত হয়ে এস।" বলিয়া শশিনাথ বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

এক মুহূর্ত লীলা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শশিনাথের আচরণ ও কথাবার্তা তাহাকে সামান্য বিস্মিত করিয়াছিল। কিন্তু তিন মিনিটের মধ্যে ভাবিবার সময় ছিল না, শশিনাথের উপদেশমত সত্বর সজ্জিত হইয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল।

দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে শশিনাথ কহিল, "হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এখন চল বউদির কাছে।"

উভয়ে ঊর্মিলার উদ্দেশে চলিল।

ঊর্মিলা তখন বারান্দায় চেয়ার টেবিল পাতাইয়াছিল। দূর হইতে লীলার বেশপরিবর্তন দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

শশিনাথ ও লীলা নিকটে আসিলে ঊর্মিলা গালে হাত দিয়া কহিল, "ঠাকুরপো তো কম নও! লীলাকে কাপড় বদলিয়েছ! কাপড় বদলালে যে লীলা?"

লীলা কহিল, "শশিদা বললেন, মোটর ক'রে বেড়াতে যাওয়া হবে, আর আমাকে—"

বাধা দিয়া শশিনাথ কহিল, "একটু ভুল হচ্ছে লীলা। মোটর ক'রে বেড়াতে যেতে হবে, তা তো আমি বলি নি। আমি বলছিলাম, বেড়াতে যেতে হবে, আর বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। এ দুটো জিনিসকে তুমি নিজে যোগ করেছ।"

সবিস্ময়ে লীলা কহিল, "তুমি বললে না শশিদা, মোটরটা আমাদেরই হবে ?"

শান্ত কণ্ঠে শশিনাথ বলিল, "আমি এখনও তো বলছি, তার উপক্রম হয়েছে। আমাকে বিশ্বাস না হয়, বউদিকে জিজ্ঞাসা কর।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া ঊর্মিলা কহিল, "উঃ, তুমি কি ঠক্‌ হয়েছ ঠাকুরপো! তুমি সব করতে পার।" তাহার পর টেবিলের উপর একটা খঞ্চিপোশ পাতিয়া কহিল, "তোমরা এখানে একটু দাঁড়াও, আমি খাবার দু'থালা নিয়ে আসি।"

বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত হঠাৎ লীলার মনের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটার একটা সম্ভবপর অর্থ প্রকাশ পাইল। লজ্জা ও বিরক্তি সত্ত্বেও ঔৎসুক্যের উত্তেজনাকে সে রোধ করিতে পারিল না। কহিল, "এখানে কার খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে শশিদা ?"

শশিনাথ গম্ভীর ভাবে কহিল, "জনৈক ভদ্রলোক, যিনি ওই মোটর-কারটির মালিক এবং আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁর জন্য। আমাদের দুজনকে খাওয়ানোর ভার তোমাকে নিতে হবে।"

হঠাৎ কঠিন হইয়া লীলা কহিল, "তা আমি পারব না শশিদা।"

বিস্ময়ময় সুরে শশিনাথ কহিল, "পারবে না তুমি ? কি ক'রে বলছ লীলা—পারবে না ? পুরাকালে—"

দুই হাতে দুই থালা জলখাবার লইয়া উপস্থিত হইয়া ঊর্মিলা শশিনাথকে

কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া কহিল, "আবার পুরাকাল হঠাৎ কি অপরাধ করলে ঠাকুরপো যে, সে বেচারাকে ধরে লেকচার দিতে শুরু করেছ?"

ঊর্মিলার দিকে চাহিয়া শশিনাথ কহিল, "পুরাকালে অতিথি-সৎকার করবার জন্যে লোকে রাস্তা থেকে লোক ধরে আনত। আর, লীলা বলে কিনা, আমার বন্ধুটিকে খাওয়ানোর ভার নিতে পারবে না। আচ্ছা, বল তো বউদি, এটা কি রকম ভদ্রতা?"

অভিনয়ের ভঙ্গিতে গম্ভীরভাবে ঊর্মিলা কহিল, "সত্য বটে, কিন্তু অধুনা রীতিনীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে।"

একমুহূর্ত বিস্মিত-নির্বাক ভাবে থাকিয়া শশিনাথ কহিল, "তোমার মতিগতিরও দেখছি পরিবর্তন ঘটেছে। 'অধুনা'র খাতিরে তুমি লীলাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ।"

ঊর্মিলা কহিল, "তা নয়, পুরাকালের খাতিরে অধুনার কথা তুলেছিলাম। সেই যাই হোক, লীলা কি কখনও তোমার আদেশ অমান্য করেছে যে, আজ করবে?"

এইরূপ এক তরফা তাহার বিষয়ে চূড়ান্ত বিচার হইয়া গেল দেখিয়া লীলা অপ্রসন্নভাবে মুখ বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কলিকাতার সর্বোৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের অপেক্ষাও. যে লীলার মুখ মিষ্ট, জল-যোগ করিবার সময় সুধীরের ভঙ্গি হইতে তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তাহার মুগ্ধ-নেত্র পরাস্ত হইয়া বন্দী হইয়াছে প্রত্যক্ষ হইলেও সর্বত জয়লাভের জন্য শশিনাথ লীলার গুণকীর্তন করিতেছিল। "এই যে টেবলক্লথটা দেখছ, এটা লীলার তৈরি, ওই যে দেওয়ালে রেশমের ছবি টাঙানো রয়েছে, ও লীলা বুনেছে। লী। শুধু ইংরিজী শিখেছে মনে করো না, সংস্কৃতেও রঘুর তিন সর্গ শেষ করেছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শশিনাথের কথা শুনিয়া সুধীরের লীলাকে যথেষ্টেরও অধিক মনে হইতেছিল, এবং তাহার অন্তরের সেই অবস্থা স্বচ্ছ প্রসন্নতায় প্রকাশ 'পাইতেছিল। সফলতার আনন্দে শশিনাথের মন ভরিয়া উঠিয়াছিল, এমন সময়ে লীলার আড়ষ্ট অপ্রসন্ন মুর্তি সহসা লক্ষ্য করিয়া সে বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিল। পাছে সুধীরও তাহা বুঝিতে পারে, সে আশঙ্কায় লীলার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র শশিনাথ তীক্ষ-দৃষ্টির দ্বারা তাহাকে শাসন করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু, অযথা ঔষধের মত লীলার আকৃতিতে তাহার ক্রিয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তখন লীলার সম্মুখে সুধীরকে অধিকক্ষণ রাখা নিরাপদ নহে মনে করিয়া সে সুধীরকে লইয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া সামনাসামনি চেয়ারে বসিয়া শশিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলে বল?"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "কবে দিন স্থির করছ বল?"

প্রসন্নচিত্তে শশিনাথ কহিল, "আর কোন কথা নেই তো?"

"কোন কথা নেই। শুধু একটা অনুরোধ আছে; বিয়ের দিনটা যত শীঘ্র সম্ভব, স্থির ক'রো।"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "লীলার যে এতটা ক্ষমতা আছে, তা জানতাম না। চিরকালের সুধীরকে যে আধ ঘণ্টার মধ্যে অধীর করে দিতে পারে, স্বীকার করিতেই হবে সে অসীম ক্ষমতা ধারণ করে।"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "আমি স্বীকার করছি ভাই, সত্যিই সে অসীম ক্ষমতা ধারণ করে। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। আমার সম্পূর্ণ মত আমি তোমাকে জানিয়ে চললাম, এখন তোমরা আমাকে বাংলা দেশের বরের দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে ওজন ক'রে দেখ—পছন্দ হয় কি-না? তারপর সন্ধ্যার পর তোমাদের মতামত আমাকে জানিয়ে পাঠিয়ো।"

সুধীরের কথা শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া শশিনাথ কহিল, "এ বিনয় প্রকাশ না করলেই ভাল ছিল। কার মতামত তুমি চাও হে? লীলার মত? সেটা ফুলশয্যার রাত্রের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাক। আর আমাদের মতের যদি অপেক্ষা থাকত, তা হ'লে অন্দর মহলে তোমাকে ঢুকিয়ে তোমার সামনে একটা নিরীহ প্রাণীকে আধ ঘণ্টা ধরে পীড়ন করতাম না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে কাল সকালে গোপাল-মামা আর ভট্‌চাজ্জি মশায়কে দিন স্থির করতে পাঠিয়ে দোব।" বলিয়া সুধীর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

অন্তরাল হইতে সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া ঊর্মিলার মনে আর কোন দ্বিধা ছিল না। এই শান্ত, নম্র, প্রিয়দর্শন যুবকটি লীলার স্বামী হইলে লীলাকে বাস্তবিকই সৌভাগ্যবতী বলা চলিবে। শশিনাথ আসিতেই ঊর্মিলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল ঠাকুরপো, পছন্দ হয়েছে?"

গম্ভীর হইয়া শশিনাথ কহিল, "সকলেই কি আমি, যে ফট্‌ ক'রে পছন্দ হবে না?"

ব্যস্ত হইয়া ঊর্মিলা কহিল, "কি বলছ ঠিক বুঝতে পারছি নে। পছন্দ হয়েছে?"

"হয়েছে গো হয়েছে। এত বেশি হয়েছে যে, আর সবুর সইছে না—কাল সকালেই বিয়ের দিন স্থির করতে লোক আসবে।"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিয়ে ঠাকুরপোর এখন মনস্তাপ হচ্ছে না-কি ?"

আরও গম্ভীর হইয়া শশিনাথ কহিল, "বড্ড ! এত বেশি যে ক্ষিদে পেয়ে গেছে। কিছু খেতে দাও।"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "এই না তোমার বন্ধুর সঙ্গে খেলে ?"

শশিনাথ কহিল, "রামচন্দ্রঃ ! ও মেয়ে দেখতে এসে লজ্জায় খাবার নিয়ে খুঁটতে লাগল ; ওর সঙ্গে খেয়ে কি পেট ভরে ?"

শশিনাথের কথা শুনিয়া উর্মিলা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "ও না হয় খুঁটছিল, তুমি তো খোঁট নি। খুঁটলে কি রেকাবগুলো অমন পরিষ্কার হ'য়ে ঝক্‌মক্ করে ?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রেকাবগুলার দিকে চাহিয়া শশিনাথ কহিল, "যা প'ড়ে ছিল, এরই মধ্যে উঠিয়ে নিয়ে গেছ বুঝি ?"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "তার চেয়ে বললেই তো হয় যে, আবার ক্ষিদে পেয়েছে।" বলিয়া খাবার আনিতে প্রস্থানোদ্যত হইল।

বাধা দিয়া শশিনাথ কহিল, "খাবার পরে হবে। আগে সত্যি ক'রে বল বউদি, সুধীরকে পছন্দ হয়েছে কি-না ?"

উর্মিলা অকপটে স্বীকার করিল, তাহার পছন্দ হইয়াছে।

"তা হ'লে ঘটকালি কি দেবে বল ?"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "একটি পরমাসুন্দরী বউ।"

শশিনাথ কহিল, "'এ যে, তৃষার্ত হইয়া আমি চাহিলাম জল, তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল,—তাই হ'ল। বউ নয় বউদি, আমি বর চাই। আমাকে এই বর দাও যে, বউয়ের নেশা যেন কখনও আমাকে মাতাল না করে।"

হাসিতে হাসিতে উর্মিলা বলিল, "বর নয়—আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে, অচিরে যেন তোমাকে বিয়ে-পাগলা হ'য়ে আমাদের সাধাসাধি করতে হয়।"

আড়ম্বরের সহিত শশিনাথ কথাটার উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে সোমনাথ আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কহিল, "তোমরা লীলাকে কি ভয়ানক চটিয়ে দিয়েছ! আমি তাকে একটু ঠাট্টা করতে গিয়েছিলাম, সে কথাই কইলে না—ঘাড় নিচু ক'রে গোঁজ হ'য়ে ব'সে রইল!"

ঊর্মিলা কহিল, "চল বউদি, লীলাকে বায়স্কোপ দেখিয়ে আনা যাক। একটা যা-হোক ক'রে ওকে ঠাণ্ডা করা চাই।"

ঊর্মিলা সম্মত হইয়া সোমনাথকে কহিল, "তুমিও চল।"

সোমনাথ কহিল, "হিসেব না মিলিয়ে আমি এক পা নড়ছি নে। জমার চেয়ে খরচ বেশি, অথচ হাতে আট টাকা থাকছে—এ কি ক'রে হয়?"

শশিনাথ কহিল, "কি হয় দাদা? ঐ আট টাকা আমাদের বায়স্কোপ দেখতে দাও, তা হ'লে আর গোল থাকবে না।

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, "হিসেবের গোলগুলো যদি অমন ক'রে মেলানো যেত, তা হ'লে সংসারটা ভারি মজার জায়গা হ'ত।"

মৃদু হাসিয়া ঊর্মিলা কহিল, "মজার জায়গা তো ক'রে নিলেই পার। কার কাছে তোমার হিসাবনিকাশ করতে হবে যে, আট টাকার গরমিল নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ?"

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, "আমার সেই প্রকৃতির কাছে, যে এই সাতাশ বছর ধ'রে আমার মধ্যে কঠিন হ'য়ে পেকেছে। তোমরা ক্ষমা করলেও সে আমাকে ক্ষমা করবে না।"

শশিনাথ কহিল, "আমার তো মনে হয়, ভুলের পিছনে অনর্থক অতটা সময় নষ্ট না ক'রে, যেখানটা ভুল হ'ল সেখানে গরমিলের একটা হিসাব রেখে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।"

সোমনাথ কহিল, "আমার ঠিক উল্টো মনে হয়। ভুলটা যদি তখনি তখনি শুধরে নিতে চেষ্টা না কর, তা হ'লে সেটা পরের সব হিসেবগুলোকেও পাতায় পাতায় ভুল করতে করতে চলবে। এটা শুধু জমা-খরচের খাতার বিষয়ে নয়,

মানুষের জীবনের খাতাতেও ঠিক খাটে। যখনই একটা ভুল করেছ জানতে পারলে তখনই যদি সেটা শুধরে না নিয়েছ, তা হ'লে পরের সব ঘটনাগুলো ভুল হ'তে চলবে। জীবনের প্রতিদিনগুলো জমাখরচের প্রতি পাতার মত এক-একটা ভুলের অধ্যায় হ'য়ে দাঁড়াবে।"

উত্তরে শশিনাথ কি বলিতে যাইতেছিল, উর্মিলা বাধা দিয়া বলিল, "এই যে তোমরা এ বিষয় নিয়ে এখন তর্ক করছ সেটাও একটা ভুল হচ্ছে। এটা শুধরে না নিলে দেরি ক'রে বায়স্কোপ যাওয়া আমাদের আর একটা ভুল হবে। এখন এক ঘণ্টা সময় আছে—তুমি হিসেব মিলিয়ে নাও, আর আমরাও তৎক্ষণ তৈরি হ'য়ে নিই।"

উর্মিলার কথায় শশিনাথ ও সোমনাথ উভয়ে হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার কথায় যুক্তি আছে স্বীকার করিয়া উভয়ে নিজ নিজ কাজ সারিতে প্রস্থান করিল।

১৪

তিন-চার দিন পরে শশিনাথ তাহার ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট-মনে বই পড়িতেছিল। শীতকালের প্রভাত; বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। কিন্তু রৌদ্রের নিস্তেজ অনুজ্জ্বল ভাব তখনও যায় নাই। কুয়াশা ও ধূমের মিশ্রণে কলিকাতার রাজপথের দৃশ্যাবলী তখনও অস্পষ্ট মলিন। একজন ফিরিওয়ালা শীতকম্পিত কণ্ঠে খেজুর রস হাঁকিয়া যাইতেছিল।

উর্মিলা চায়ের পেয়ালা হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া শশিনাথের টেবিলে চা রাখিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, চা খাও।"

বই হইতে মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "আজ যে বউদি নিজে চা নিয়ে হাজির! কোন মতলব আছে বুঝি?"

মতলব একটা বাস্তবিকই ছিল, এবং সেটা এমনই গুরুতর মতলব যে, উর্মিলা অস্বীকার করিতে পারিল না। সহসা কোন উত্তর দিতে না পারিয়া এবং নীরবে মৃদু হাস্য করিয়া সে ব্যক্ত করিল, মতলব তাহার আছে।

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "বোঝাই গেছে। ব'স।" বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া আর একটা চেয়ার উর্মিলার সম্মুখে স্থাপন করিল।

উর্মিলা বসিলে শশিনাথ কহিল, "সম্ভবত বিয়ে সংক্রান্ত পরামর্শ?"

একটু ইতস্তত করিয়া উর্মিলা কহিল, "হ্যাঁ ঠাকুরপো, বিয়ে সংক্রান্তই বটে। কিন্তু বলতে আমার ভয় হচ্ছে, তুমি হয়তো বিরক্ত হবে।"

অল্প হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "কিন্তু এত ভূমিকার পর এখন না বললে যে আরও বিরক্ত হব।"

উর্মিলা তাহার বক্তব্যটা একবার ভাবিয়া লইয়া সংক্ষেপে কহিল, "আমার মনে হচ্ছে, এ বিয়েতে লীলা সুখী হবে না।"

প্রথমটা বিস্মিত হইয়া শশিনাথ চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটু হাসিয়া কহিল, "তোমার সেটা শুধু মনে হচ্ছে, না, কেউ তোমাকে ব'লেছে?"

"সে এক রকম বলাই ধর।"

"কি-রকম বলেছে, কে বলেছে, না জানলে পরামর্শ দিই কি ক'রে?"

স্মিতমুখে উর্মিলা কহিল, "তুমি যদি অমন ক'রে জেরা কর, তা হ'লে হয়তো বোঝাতে পারব না। অনেক কথা বোঝা যায়, অথচ বোঝানো যায় না। আমি বুঝতে পেরেছি, এ বিয়েতে লীলা সুখী হবে না।"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া শশিনাথ কহিল, "কিন্তু একমাত্র তোমার কথা বিশ্বাস করা ছাড়া, আমি যে অন্য কোন রকমে বুঝতে পারছি নে। লীলা কি তোমাকে কিছু বলেছে?"

"স্পষ্ট কিছু বলে নি। কিন্তু ভাবে-ভঙ্গিতে, আকারে-প্রকারে, এমন কি কথায়-বার্তায় সে এক রকম বলেছে যে, এ বিয়ে সে চায় না।"

ঊর্মিলার কথা শুনিয়া শশিনাথ ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, "কি চায়, তাও বলেছে নাকি?"

"তাও এক রকম বলেছে।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শশিনাথ কহিল, "কি চায়?"

ঊর্মিলার মুখে সভীতি হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "তোমাকেই চায়।"

শুনিয়া শশিনাথ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল ঊর্মিলার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর এক চুমুকে চায়ের পেয়ালা শেষ করিয়া কহিল, "নাঃ, তোমরা সকলে মিলে আমাকে পাগল ক'রে ছাড়বে দেখছি। আমাকে চায়—মানে কি? আমাকে সে ভালবাসে?"

ধীরকণ্ঠে ঊর্মিলা কহিল, "বাসে।"

একটু উত্তেজিতস্বরে শশিনাথ কহিল, "বাসে তো বেশ করে। কিন্তু সে কি স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, সে সুধীরকে বিয়ে করতে চায় না—আর আমাকে বিয়ে করতে চায়?"

ঊর্মিলা কহিল, "স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, সুধীরকে বিয়ে করতে চায় না—আর প্রকারান্তরে জানিয়েছে, তোমাকে বিয়ে করতে চায়।"

ক্ষণকাল চিন্তা ক'রিয়া শশিনাথ কহিল, "দেখ বউদিদি, আগুন নিয়ে খেলা যেমন বিপজ্জনক—মানুষ নিয়ে আর মানুষের মন নিয়ে খেলা করাও তেমনি বিপজ্জনক। লীলার মনে বাস্তবিক যদি কোন রকম বিকার এসে থাকে তো তার জন্যে তুমি আর দাদা দায়ী। আমাকে নিয়ে তোমরা কিছুদিন থেকে এমন হৈ-চৈ লাগিয়েছ যে, লীলারও মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, আমি হয়তো খুব একটা অদ্ভুত পদার্থ।"

ঊর্মিলা হাসিয়া কহিল, "এ মন্দ কথা নয়, ঠাকুরপো! লীলা ভালবাসলে তোমাকে, আর তার জন্যে দায়ী হলাম আমি আর তোমার দাদা। আর তুমি

একেবারে দায় খালাস! চোর যে, সে হ'ল সাধু—আর যাদের কাছে চোর ধরা পড়ল, তারা হ'ল অপরাধী!"

শশিনাথ কহিল, "তা তো নয়। চুরি করবার প্রলোভন দেখিয়ে সাধুকে যারা চোর ক'রে তুলতে চায়, তারাই হ'ল অপরাধী। সে কথা থাক, এখন তোমার মতলব কি বল? সুধীরের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিতে বলছ?"

ক্ষুণ্ণস্বরে উর্মিলা কহিল, "আমি কিছুই ভাঙতে গড়তে বলছি নে। আসল কথা তোমাদের জানালাম, এখন তোমরা যা ভাল বিবেচনা হয় কর। আমি শুধু বলছিলাম, তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে লীলা সুখী হ'ত।"

উর্মিলার সকাতর কথা শুনিয়া শশিনাথ মনের মধ্যে ঈষৎ বেদনা বোধ করিল। লীলার সহিত বিবাহের জন্য বহুবার উর্মিলা তাহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছে। অনুরোধ, উপরোধ, মিনতি, অভিমান কিছুই সে বাকি রাখে নাই। কিন্তু প্রতিবারই শশিনাথ কোন না কোন প্রকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিবার অপ্রিয়তা শশিনাথকে পীড়ন করিলেও উপায়ন্তর ছিল না। সংসারের যে-বন্ধনকে সে সর্বাপেক্ষা ভয় করিত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা বুদ্ধিহীনা কোন বালিকার অবিবেচনাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া সেই অনভিলষণীয় বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করিবার আত্মোৎসর্গের জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কাতরকণ্ঠে সে উর্মিলাকে কহিল, "দোহাই বউদিদি, আমাকে তোমরা দয়া ক'রে ছেড়ে দাও। আমি সন্ন্যাসী, বৈরাগী মানুষ, বিয়ে ক'রে নিজেও বিপদে পড়ব—অপরকেও সুখী করতে পারব না। আমি কবে আছি, কবে নেই, তার কোন ঠিক নেই। শুধু তোমার হাতের রান্নার জোরে সংসারে এতদিন টিকে আছি, নইলে কবে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে যোগ দিতাম।"

হাতের রান্না উপলক্ষ্য করিয়া শশিনাথ যাহা বলিবার চেষ্টা করিল, তাহা বুঝিতে উর্মিলার কিছুমাত্র বাকি রহিল না। প্রথম যে দিন অদৃষ্টের বিচিত্র বিধানে দুঃখ ও যাতনার নির্মম কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে

সৌভাগ্যের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল, সেই দিনই সে বুঝিয়াছিল যে, সৌভাগ্যের সেই পুরীমধ্যে শুধু রামচন্দ্রই বর্তমান ছিল না, লক্ষ্মণও সশরীরে রামচন্দ্রের পার্শ্বে উপস্থিত ছিল। তাই সেই দিন হইতে প্রতিনিয়ত স্বামীর প্রতি বিপুল ভক্তি ও ভালবাসার সহিত দেবরের প্রাত সমানুপাতে প্রীতি ও স্নেহ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। শশিনাথ সেই স্নেহের দাবিতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিতে পারিয়া উর্মিলা নিজেকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। জোর খাটাইলে বাধা পাইবার কথা যেখানে যত অল্প, জোর খাটাইতে সেখানে তত বেশি বাধে। ধরা দেওয়া ভিন্ন যাহার উপায় নাই, তাহাকে ধরিতে আপনা-আপনি সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা ছাড়া, শশিনাথের কথায় উর্মিলার দুই বৎসর পূর্বের কথা সভয়ে মনে পড়িল, যখন রামকৃষ্ণ-মিশনে যোগ দিবার জন্য শশিনাথ প্রবলভাবে ঝুঁকিয়াছিল। তখন কত কষ্টে কত সাধ্য-সাধনা, কত স্নেহ-প্রীতি-ভক্তির দাবিতে সে দেবরের উদ্দাম বাসনাকে ফিরাইয়া সংসারে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহার পর হইতে গত দুই বৎসর ধরিয়া স্নেহ ও ভালবাসার নিত্য নূতন সূত্রে জাল বুনিয়া সে দেবরকে চতুর্দিক হইতে বাঁধিয়া ফেলিতেছিল। একেবারে নিশ্চিন্ত হইবার অভিপ্রায়ে জালের শেষ বাঁধনটি দিবার জন্য যখন সে লীলার সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করিতেছিল, তখন সহসা আবার সেই গৃহত্যাগ ও রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায়, আশঙ্কায় উর্মিলা পিছাইয়া গেল। কে জানে, জাল বাঁধিতে গিয়া যদি ছিঁড়িয়াই যায়—হিতে বিপরীত হয়!

দেবরের মুখের উপর স্নেহপূর্ণ সকরুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উর্মিলা কহিল, "না, না, ঠাকুরপো, আমি তোমার ইচ্ছা বা মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে অনুরোধ করছি নে। লীলার মঙ্গল-কামনা তোমার মনের মধ্যে কতখানি আছে, তা আমি জানি ব'লেই সব কথা তোমাকে খুলে বললাম। এখন ভাই, যাতে লীলা জীবনে সুখী হ'তে পারে, তাই কর। যে কথা আমি তোমাকে জানাতে এসেছি,

তার মূলে কতখানি সত্য আছে, তা তুমি নিজে পরখ ক'রে দেখতে হয় দেখ। তারপর যা ভাল মনে কর, ক'রো।"

ঊর্মিলার এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ কতকটা বুঝিতে পারিয়া, শশিনাথ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "লীলার মঙ্গলের জন্য যদি কোন কাজ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে হয় বউদি, তাও করতে আমি সঙ্কুচিত হব না। আবার, আমি যখন ঠিক বুঝব যে, আমার সঙ্গে বিয়ে না হ'লে লীলার জীবন বাস্তবিকই অসুখের হবে, তখন লীলাকে বিয়ে করতে আমি এক মুহূর্তও দ্বিধা করব না। কিন্তু যা আমি শুধু কর্তব্যের অনুরোধেই করতে পারি, দোহাই তোমার, শখ ক'রে আমাকে তা করতে ব'লো না।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া ঊর্মিলার মন লঘু হইয়া গেল। প্রসন্নমুখে সে কহিল, "আমি আর তোমাকে কিছুই বলব না—এখন থেকে লীলার সব ভার তোমার উপর। তুমি যা ভাল বুঝে করবে তাতেই তার মঙ্গল হবে।"

ঊর্মিলার কথা শুনিয়া শশিনাথের মুখে উদ্বেগের রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এত বড় দায়িত্বের ভার বহন করিবার শক্তি কি আমার আছে বউদি, যে তুমি নিশ্চিন্তমনে লীলার ইষ্টানিষ্টের ভার আমার উপর ছেড়ে দিচ্ছ?"

দ্বিধাশূন্য কণ্ঠে ঊর্মিলা কহিল, "হ্যাঁ, সে শক্তি একমাত্র তোমারই আছে। তুমি লীলাকে দেখ, শোন, বোঝ—তারপর যা ভাল মনে হয় কর।"

প্রত্যুত্তর না দিয়া শশিনাথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শশিনাথের চিন্তাবিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া ঊর্মিলা কহিল, "এর মধ্যে ভাবনার কি আছে ঠাকুরপো? যেমন ভাল বুঝবে, করবে।" বলিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শশিনাথ কহিল, "না, ভাবনার কিছু নেই। লীলা নিজের মনই বা কি বোঝে, আর নিজের ভাল-মন্দই বা কি বোঝে? আমি সব ঠিক ক'রে নেব—তুমি কিছু ভেবো না বউদি।"

"না, আমি কিছুই ভাবছি নে।" বলিয়া ঊর্মিলা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শশিনাথ অল্পক্ষণ চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিল—তাহার পর নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহকে একান্তচিত্তে সঞ্চয় করিয়া সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যাহা শুভ ও সত্য—একমাত্র তাহারই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। তাহার পর ধীরে ধীরে নিজের মনকে সর্বপ্রকার চিন্তা হইতে নির্মুক্ত করিয়া লইয়া বহি খুলিয়া বসিল।

১৫

চারটা বাজিতেই শীতের বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। গা ধুইয়া আসিয়া লীলা তাহার ঘরে শয্যার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় শুইয়া ছিল। পশ্চিম দিকের জানালা দিয়া বাঁকাভাবে খানিকটা রৌদ্র শয্যার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, লীলা সেই রৌদ্রে পা-দুখানি মেলিয়া নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছিল।

কয়েক দিন হইতে তাহার যে কি হইয়াছে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। বই পড়িলে অর্থ বোঝা যায় না, পশম বুনিতে গেলে ঘর ভুল হয়, সেলাইয়ের কল দুই মিনিট চালাইলেই বিরক্তি ধরে, তাহা ছাড়া সর্বদা মনের মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতা, অসুস্থতা লাগিয়া রহিয়াছে। চিত্তের এ অসংযত অবস্থার জন্য তাহার বিবাহের প্রসঙ্গ যে দায়ী, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু কেন যে দায়ী, সেই কথাটাই সে আজ মনের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। যেখানে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, সেখানে বিবাহে তাহার এত অনাসক্তির

কারণ কি? পাত্রকে তো সে নিজে দেখিয়াছে—রূপবান; শুনিয়াছে—গুণবান ও ধনবান; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই বলিতেছে—বহু তপস্যার ফলে এমন পাত্র পাওয়া গিয়াছে, তবে তাহার এ বৈরাগ্য কেন? এখানে বিবাহ হইলে সে অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, গাড়ি ঘোড়া মোটরকার—বহুমূল্য আসবাবপত্র, দাসদাসী প্রভৃতি তাহার সেবা ও ভোগের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে, এবং প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সে হইবে একমাত্র অধিশ্বরী। কিন্তু মন তো সে সব চাহে না! ছয় বৎসর ধরিয়া স্নেহ, প্রীতি, করুণা—নানা রসে পুষ্ট হৃদয়ের অসংখ্য শিকড়গুলি যে-গৃহের ভিত্তির মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়া দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে, সে গৃহ হইতে চিত্ত যে এক মুহূর্তের জন্যও উৎপাটিত হইতে চাহে না! কোনও রাজপ্রাসাদের জন্যই নহে। এই গৃহই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। এই সুখ-দুঃখ-স্মৃতিবিজড়িত গৃহের একটি কক্ষ-বিশেষে প্রবেশলাভের জন্য তাহার চিত্ত যে কেমন করিয়া দিনে দিনে চুপে চুপে তাহার অগোচরে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সে সংবাদ কয়েকদিন পূর্বে সে কিছুই জানিত না; কিন্তু আজ তাহা নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিয়াছে। সর্বদা তাহার প্রলোভন হয়, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরটি আপনার হাতে পরিষ্কার করে, অবিন্যস্ত বইগুলি গুছাইয়া রাখে, টেবিল হইতে ধূলা ঝাড়িয়া জিনিসগুলি সাজাইয়া দেয়, আলনার কাপড়গুলি গুছাইয়া রাখে, জুতাগুলি ধূলা ঝাড়িয়া পরিচ্ছন্ন করে—কিন্তু এমনই আশ্চর্যের কথা, দুই দিন পূর্বে সে এই কাজগুলি অসঙ্কোচে করিতে পারিত, কিন্তু আজ আর তাহার উপায় নাই। এখন দুই বিভিন্ন দিক হইতে দুই বিভিন্ন কারণে যুগপৎ উদ্ভূত সঙ্কোচ তাহার বাসনার পথে অলঙ্ঘ্য অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে শশিনাথের প্রতি তাহার চিত্তের আসক্তির পরিচয়, এবং অপর দিকে সেই অধিকার-বিহীন আসক্তির নিষ্ফলতার জ্ঞান তাহার চিত্তকে অভিমানে ও অপমানে অসাড় করিয়া রাখিয়াছে। এই ব্যর্থ-বিরূপ প্রেমের উন্মাদনা, আজ যাহা তাহার চিত্তকে

উদ্বেলিত করিয়া রাখিয়াছে, দুই দিন পূর্বে তাহার কোন সন্ধান ছিল না। এমন কি, যখন শশিনাথের সহিত তাহার বিবাহের কথা চলিতেছিল, তখনও নয়। তখন শুধু অন্তরের মধ্যে এক সহজ মিষ্ট আনন্দের উপলব্ধি আসিয়াছিল, যাহা হইবে বলিয়া চিত্ত বহু দিন হইতে প্রস্তুত ছিল, তাহা পূর্ণ হইবার অমুগ্র সন্তোষ। যে দিন তাহার অন্যত্র বিবাহ স্থির হইল, সে দিন সে তাহার অন্তরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে দিন হইতে জীবন তিক্ত বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। সে দিন হইতে আর আশার আনন্দ নাই, কল্পনার আসক্তি নাই, চিন্তার শেষ নাই।

"লীলা, ঘরে আছ ?"

শশিনাথের কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া লীলা উঠিয়া বসিয়া কহিল, "আছি।" মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া শয্যা হইতে ভূমিতলে নামিয়া পড়িয়া কহিল, "দোর খোলাই আছে।"

দ্বার ঠেলিয়া শশিনাথ প্রবেশ করিল।

তুমি কি ব্যস্ত আছ লীলা ?"

একবার শশিনাথের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিয়া লীলা কহিল, "না।"

"তা হ'লে একবার আমার সঙ্গে বাজার যেতে হবে। কতকগুলো ব্লাউস আর সেমিজ তোমার জন্যে অর্ডার দেব।"

বিস্মিত হইয়া লীলা মুখ তুলিয়া শশিনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "তা আমাকে যেতে হবে কেন ?"

"মাপ দিতে। একটা নতুন ভাল দোকান হয়েছে, তারা স্ত্রীলোকের দ্বারা মেয়েদের মাপ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।"

যে কারণে ব্লাউস ও সেমিজের ফরমায়েস দেওয়া, তাহা অনুমান করিয়া লীলার যাইতে একেবারেই প্রবৃত্তি হইল না। কহিল, "নমুনা দিলেই তো চলতে পারে, তা ছাড়া এখন ব্লাউস-সেমিজের দরকারও তো নেই।"

একটু হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "দরকার আছে কি নেই, সে বিচার করবার

অধিকার এখনও কিছুদিন আমাদের থাকবে। কিন্তু তুমি এত আপত্তি করছ কেন? যাবার পক্ষে তোমার বাধা কি হচ্ছে?”

একবার লীলা শশিনাথের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর কহিল, “না, বাধা কিছু নেই।”

“তবে তৈয়ের হ’য়ে নাও।” বলিয়া শশিনাথ বাহির হইয়া গেল।

গাড়িতে উঠিয়া লীলা ঘাড় বাঁকাইয়া পথের একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। রাজপথের দৃশ্য-বৈচিত্র্যের উপর তাহার চক্ষু পড়িয়া থাকিলেও সেদিকে তাহার বিন্দুমাত্র চেতনা ছিল না।

অন্তরের তলদেশে নিমজ্জিত হইয়া সে ভাবিতেছিল আপনার অদৃষ্টের কথা। লজ্জা বা বিস্ময় বা বিরক্তি যে তাহার চিত্তকে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করিতেছিল, তাহা নহে; শশিনাথের সহিত গাড়ি করিয়া একা বেড়াইতে যাওয়াও এই তাহার প্রথম নয়। কিন্তু শশিনাথের সহিত এই গাড়ি চড়িয়া সেমিজ ব্লাউস ফরমায়েস দিতে যাওয়া প্রভৃতি সামান্য ঘটনা দিয়া আজ হইতে অদৃষ্টের যে নিষ্ঠুর-বিদ্রূপ আরম্ভ হইল, সে ভাবিতেছিল তাহারই কথা। আশ্চর্য! যে মুহূর্তে শশিনাথের কক্ষ তাহার হৃদয়কে চুম্বকের মত প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে শশিনাথের মন তাহাকে গৃহছাড়া করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। একটা স্থূল বেদনার অনুভূতি লীলার হৃদয়কে চারিদিকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

সম্মুখে বসিয়া শশিনাথ ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া লীলার নিকটে প্রসঙ্গের অবতারণা করিবে! অস্ত্রাঘাতের পূর্বে যেমন অস্ত্র-চিকিৎসক ছুরি কোন্‌খানে বসাইবে, কতখানি বসাইবে প্রভৃতি ধীরভাবে স্থির করিয়া লয়, তেমনি শশিনাথ কোন্ কথাটা প্রথমে বলিবে, কোন্ কথাটা কতখানি বলিবে ইত্যাদি মনে মনে স্থির করিয়া লইতেছিল। ব্যাধি যখন নিরাময় করিতে হইবে, তখন ছুরি বসাইতে সঙ্কোচ করিয়া কোন লাভ নাই; লীলার মনের ভিতর যে কাঁটাটি বিঁধিয়াছে, তাহাকে উৎপাটিত করিতে হইলে যদি গভীর

ভাবেই বিদ্ধ করিতে হয় তো করিতেই হইবে; ব্যাধির কোন অংশ বাকি রাখিবে না। উপস্থিত অল্প যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে গিয়া ভবিষ্যতের অধিক যন্ত্রণার মূল অনুৎপাটিত রাখিবে না।

মাপ দেওয়ার ব্যাপার সহজেই হইয়া গেল। তখনও খানিকটা বেলা বাকি ছিল। গাড়িতে উঠিয়া শশিনাথ কোচ্‌ম্যানকে ইডেনগার্ডেন যাইতে আদেশ করিল। লীলা কোন কথা কহিল না—নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনের তন্ত্রী এমন প্রবলভাবে বাঁধিয়া গিয়াছিল যে ইডেনগার্ডেন যাইবার প্রসঙ্গের আঘাতে আর নূতন কোন উচ্চতর সুর বাজিল না।

ইডেনগার্ডেন পৌঁছিবার পূর্বে শশিনাথ বলিল, "লীলা, আমি যে তোমার একজন হিতৈষী, সব রকমে তোমার মঙ্গল-কামনা করি, সে ধারণা তোমার আছে তো?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া লীলা কহিল, "আছে।"

প্রসন্নকণ্ঠে শশিনাথ কহিল, "বেশ কথা। সে বিশ্বাস কখনও হারিয়ো না। আমার কাছ থেকে তুমি জেনে রাখ, কখনও তোমার সে বিশ্বাস হারাবার কারণ ঘটবে না।"

শশিনাথের প্রতি পূর্ণদৃষ্টিপাত করিয়া লীলা কহিল, "আমি কি এমনই অকৃতজ্ঞ শশিদা, যে আমাকে এ কথা জানিয়ে দিলে তবে আমি জানব? তবে আমার মনে থাকবে?"

লীলার কথায় ব্যথিত হইয়া শশিনাথ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "কৃতজ্ঞতার কথা কেন বলছ লীলা? তুমি নিজের গুণে আর আত্মীয়তার জোরে আমাদের স্নেহ আকর্ষণ কর—তোমার পাওনার বেশি আমরা কিছুই দিই নে, যার জন্যে তুমি কৃতজ্ঞ হ'তে পার।"

গাড়ি উদ্যানের প্রবেশপথে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি হইতে নামিয়া শশিনাথ কহিল, "এস লীলা, বাগানে একটু বসা যাক।"

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া লীলা নীরবে শশিনাথকে অনুসরণ করিল।

বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ থাকিলেও লীলার মন বিস্ময়-কৌতূহলের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। একটু নির্জন স্থানে একটা বেঞ্চে গিয়ে উভয়ে বসিল।

অদূরে ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডে সেদিনের শেষ গৎ বাজিতেছিল। সম্মুখে শ্যামল তৃণরাজির উপর কয়েকটি ইংরেজ বালক-বালিকা খেলা করিতেছিল, এবং পার্শ্বে লতাকুঞ্জের মধ্যে হইতে কোনও ইংরেজ-ললনার উচ্চহাস্য থাকিয়া থাকিয়া শুনা যাইতেছিল, সম্ভবত কোন প্রণয়ী কৌতুকপ্রদ গল্পের সাহায্যে তাহার কিশোরী প্রণয়িনীর মনোরঞ্জন করিতেছিল। কিছু পরে বাগানের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিল। শীতের সন্ধ্যা গাঢ়ভাবে নামিয়া আসিতেছিল। ধীরে ধীরে জনতা বিরল হইতে লাগিল।

একটু ইতস্তত করিয়া শশিনাথ কহিল, "একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করছি। আশা করি, তুমি অসঙ্কোচে তার যথার্থ ও সহজ উত্তর দেবে। একান্ত প্রয়োজন না মনে করলে, তোমাকে কষ্ট দিতাম না।"

নিস্পন্দ হইয়া লীলা সম্মুখে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

শশিনাথ কহিল, "তোমার কাছ থেকে যেমন সহজভাবে উত্তর চাচ্ছি, আমিও ঠিক তেমনি সহজভাবে কথাটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। যে কথাটা একান্তই বলতে হবে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা ব'লে সময় আর ধৈর্য নষ্ট ক'রে কোন লাভ নেই। সুধীরের সঙ্গে তোমার বিয়ে কি তোমার মনঃপূত নয় লীলা? তুমি অসঙ্কোচে এ কথার উত্তর দাও;—কোনো কোনো সময়ে লজ্জা-সঙ্কোচ চেষ্টা ক'রেও দূর করতে হয়।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া লীলার দেহ শক্ত হইয়া উঠিল। এ কথার সে কি উত্তর দিবে? বিশেষ শশিনাথকে। সঙ্কোচ জিনিসটা কি এতই হাতের মধ্যে যে, ইচ্ছা করিলেই দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়! লীলা নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

লীলাকে নীরব দেখিয়া শশিনাথ একটু অধীরভাবে বলিল, "বল লীলা, বল, আমার কথার উত্তর দাও। এ বিয়ে কি তোমার মনঃপূত নয়?"

"না।"—কথাটা বলিয়া লীলা নিজেই অবাক হইয়া গেল। এ তাহার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল?

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া শশিনাথ কহিল, "বেশ কথা। আচ্ছা, আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে কি তুমি সুখী হও? বল, লজ্জা ক'রো না।"

সেই শীতের সন্ধ্যাতেও লীলার ললাট ঘর্মে সিক্ত হইয়া উঠিল। এই নির্দয় ও অন্যায় প্রশ্নের সে কোন উত্তরই দিবে না স্থির করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তীব্র উত্তেজনায় মস্তিষ্কে একটা যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল বলিয়া, সে ঋজুভাবে বসিতে না পারিয়া শশিনাথের বিপরীত দিকে বেঞ্চের পৃষ্ঠদণ্ডে মস্তক স্থাপন করিল।

আরও কয়েকবার প্রশ্ন করিয়া শশিনাথ যখন বুঝিল যে, লীলা এ প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই দিবে না, তখন বলিল, "তুমি যখন কিছুই বলছ না, তখন আমি ধ'রে নিচ্ছি, আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুমি সুখী হও—এই তোমার ধারণা। চায়ের চিনির প্রসঙ্গে সেদিন তোমাকে যে কথা বলেছিলাম তা বোধ হয় তোমার মনে আছে। আমাদের অভাব দুঃখ বাইরে থেকে আসে না—আমরা নিজের চেষ্টাতেই তা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করি। তোমাকে আমি সেদিন সতর্ক ক'রে দিয়েছিলাম, আজও দিচ্ছি। তুমি এখনও ছেলেমানুষ, বুদ্ধি থাকলেও অভিজ্ঞতা নেই ব'লে সব কথা বেশ তলিয়ে বুঝতে হয়তো পার না। এ অবস্থায় শুধু নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা, প্রবৃত্তি মতে না চ'লে, যারা তোমার একান্ত হিতৈষী তাদের পরামর্শমত চলা ভাল নয় কি লীলা? তুমি আমাকে ভালবাস জেনে খুবই সুখী হয়েছি, কিন্তু তুমিও জেনে রাখ যে, আমিও তোমাকে কম ভালবাসি নে।"

এইখানটায় শশিনাথের কণ্ঠস্বর তাহার ইচ্ছা ও চেষ্টার বিরুদ্ধেও একটু গাঢ় হইয়া আসায় ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"কিন্তু আমরা পরস্পরকে ভালবাসি ব'লেই যে আমাদের উভয়ের বিয়ে হওয়া দরকার বা মঙ্গলকর, তা না হ'তে পারে তো লীলা! বিবাহিত জীবন কামনা ক'রে তো আমাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মায় নি; তবে কেন সে ভালবাসাকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে বিবাহ একান্ত প্রয়োজন হবে? তোমার সঙ্গে যার বিয়ের কথা হচ্ছে, সে আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাকে আমি খুব ভাল রকম ক'রেই জানি। বাংলা দেশে এমন একটিও মেয়ে নেই যে, সুধীরকে পেয়ে ধন্য না মনে করবে। বিদ্যে বল, বুদ্ধি বল, রূপ বল, অর্থ বল, সব বিষয়ে সে আমার চেয়ে অনেক উপরে। দাদার ও আমার বিশেষ আগ্রহ, যাতে এ বিয়ে হয়—বউদিদিরও তাই। এ তুমি ঠিক জেনো লীলা, পৃথিবীর মধ্যে যে তিনজন তোমার সবচেয়ে হিতৈষী, তারা তোমার জন্যে যে ব্যবস্থা করবে তাতে তোমার মঙ্গল হবেই। আর আমাকে তো তুমি জান লীলা—আমি এক রকম সন্ন্যাসী বৈরাগী গোছের জীব, কবে দূরে স'রে যেতাম, শুধু তোমাদের স্নেহের দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছ, তাই আছি। আমাকে যতটুকু পেয়েছ ততটুকুই ভাল, তার বেশি পেতে গেলে দেখবে আমি একেবারে অকেজো জিনিস। মন তুমি একেবারে হালকা ক'রে ফেল। এই অনন্ত আকাশ আর গ্রহ তারা নক্ষত্র সাক্ষ্য করে আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে অশীর্বাদ করছি যে, তুমি নিরাময়চিত্তে তোমার নূতন জীবনে প্রবেশ কর, আর তোমার বিবাহিত-জীবন পুণ্যে আনন্দে সার্থক হোক। এর বেশি আমার আর বলবার কিছু নেই।"

বাগান প্রায় জনহীন হইয়া আসিয়াছিল; শীতের কঠিন আবরণে চতুর্দিকের দ্রব্যরাজি মূর্ছাতুরের মত দাঁড়াইয়া ছিল; এমন কি, নীল আকাশে তারকা-শ্রেণীও পাংশু প্রাণহীন বলিয়া মনে হইতেছিল। শশিনাথের অপ্রার্থিত অদ্ভুত আশীর্বচন লীলার নিস্পন্দ হৃদয়ে মৃত্যুশীতলতার মত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া যেন রক্ত-সঞ্চারন বন্ধ করিয়া দিল। সে যেন আশীর্বান নহে, অভিশাপ;—পৌষ-সন্ধ্যার হিমেরই মত শীতল ও নির্মম। মৃতের মত

লীলা বাহুনিবদ্ধ-মুখে পড়িয়া রহিল, দেহ ও মনে তাহার কোনও সাড়া ছিল না।

"লীলা !"

শশিনাথের গভীর স্বরে চকিত হইয়া লীলা চৈতন্য লাভ করিল।

"কি বলছ ?

"আমি যা বললাম বুঝেছ ?"

"বুঝেছি।"

উৎফুল্ল হইয়া শশিনাথ বলিল, "তা হলে সুধীরের সঙ্গে বিয়েতে আর তোমার কোনও অমত নেই তো ?"

দন্তে অধর চাপিয়া অবরুদ্ধ-শ্বাসে লীলা কহিল, "না।"

লীলার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে শশিনাথ কহিল "লক্ষ্মীটি ! আজ তুমি আমাকে যা সুখী করলে ভাই, তা তোমাকে আর কি বলব ? আশীর্বাদ করি, তুমি চির-সৌভাগ্যবতী হও।"

এবার কিন্তু সহের সীমা অতিক্রম করিল। এবার আর বাধা মানিল না, পাথর ফাটিয়া বান নামিল। অশ্রুর প্রবাহে লীলার বাহু ভাসিয়া গেল—শশিনাথ কিন্তু তাহার কিছু জানিল না। লীলার নিষ্পেষিত হৃদয়ে তীব্র অভিমান কণ্টকিত হইয়া বলিতে লাগিল, আমি তোমাকে আজ সুখী করিলাম ! আমি এত হেয়, এত সামান্য, এত অবাঞ্ছনীয় যে, তোমার পরিবর্তে অপরকে বিবাহ করিতে আমি স্বীকৃত হওয়ায়, তুমি এত সুখী হইলে ? তোমার নির্মম নিষ্ঠুর বৈরাগ্যের কাছে আমার হৃদয়ে ঐকান্তিক পূজা এতই তুচ্ছ যে, তাহাকে গ্রহণ করিতে হইল না বলিয়াই তুমি সুখী !

মাথা তুলিয়া লীলা স্তব্ধ গভীর আকাশের দিকে একবার চাহিল, তাহার পর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "শশিদা, বাড়ি চল, রাত হয়েছে।"

শশিনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চল।"

গাড়িতে উঠিয়া শশিনাথ বলিল, "আজ হরিচরণবাবু আমাকে একবার ডেকেছিলেন। পাঁচ মিনিটের জন্যে সেখানে নেবে গেলে তোমার কি অসুবিধা হবে লীলা ?"

মৃদু কণ্ঠে লীলা কহিল, "না।"

হরিচরণের গৃহের সম্মুখে শশিনাথ গাড়ি হইতে অবতরণ করিলে, লীলা তাহাকে অনুসরণ না করিয়া গাড়িতেই বসিয়া রহিল।

শশিনাথ কহিল "তুমি আসবে না লীলা ?"

"আমি গাড়িতেই বসি।"

"না, সেটা ভাল হবে না, জানতে পারলে এঁরা দুঃখিত হবেন।"

অগত্যা লীলা শশিনাথকে অনুসরণ করিল।

উপরের বারান্দায় উঠিয়া শশিনাথ ডাকিল, "সরযূ!"

হরিচরণের পদতলে বসিয়া সরযূ পায়ে হাত বুলাইতেছিল ও হরিচরণের সহিত গল্প করিতেছিল। শশিনাথের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দ্বার খুলিয়া কহিল, "আসুন।" তাহার পর শশিনাথের পশ্চাতে লীলাকে দেখিয়া বলিল, "এই যে লীলা এসেছ! এস, ভাই, এস।"

ঘরে প্রবেশ করিয়া লীলা হরিচরণকে প্রনাম করিতে হরিচরণ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "চিরসুখিনী হও।" শুনিয়া লীলার চক্ষে আবার অশ্রু নামিবার উপক্রম করিল। হায়! চিরসুখিনী হইবার পথ আর কই—চিরদুঃখের ব্যবস্থা যখন পাকা হইয়া গিয়াছে! সেই স্তিমিত আলোকে লীলার মুখ-চক্ষের ভাষা কেহ পাঠ করিল না।

হরিচরণের সহিত শশিনাথের কাজের কথা দুই মিনিটে শেষ হইল।

সরযূ শশিনাথকে কহিল, "একটু চায়ের ব্যবস্থা করব কি ?"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "আমার দরকার নেই, তোমার বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করতে পার।"

মাথা নাড়িয়া লীলা অসম্মতি জানাইল।

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "সরযূ, সে দিন বরেনকে ক্ষীর খাইয়ে তুমি বেশি খুশি হয়েছিলে, না, ক্ষীর খেয়ে বরেন বেশি খুশি হয়েছিল, তা ঠিক বোঝা যায় নি। সের খানেক ক্ষীর বরেন খেয়েছিল বোধ হয় ?"

শশিনাথের কথা শুনিয়া সরযূ স্মিতমুখে কহিল, "না, আপনি খাওয়া নিয়ে বরেনবাবুকে ভারি ঠাট্টা করেন—তিনি এমনই বেশি কি খান ?"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "যাকে ভগবান অতখানি ক্ষীর হজম করবার শক্তি দিয়েছেন, ঠাট্টা হজম করবার শক্তিও তাকে তেমনি দিয়েছেন। ঠাট্টা করলে পর খিদে বাড়ে—হজম করবার শক্তিও বাড়ে।"

শশিনাথের কথায় হরিচরণ হাসিতে লাগিলেন ; কহিলেন, "ছেলেটি একটি রত্ন। হাজারের মধ্যে অমন একটি পাওয়া যায় কি-না সন্দেহ।"

বন্ধু-প্রশংসায় শশিনাথ তৃপ্তি অনুভব করিল, এবং এই প্রশংসার বীজ হরিচরণ ও সরযূর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইলে ভবিষ্যতে তাহার অভিলাষ সফল হইবার সহায়ক হইবে বলিয়া সে সাগ্রহে বরেনের প্রশংসায় যোগ দিল এবং পরিশেষে বলিল, "আমার বন্ধুদের মধ্যে সুধীর আর বরেনের তুলনা নেই। সুধীরকে বন্ধু থেকে আত্মীয় ক'রে নেবার ব্যবস্থা করেছি—বরেনকেও আমার আর একটি বোনের জন্য মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছি।"

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বোন ?" দূর-সম্পর্কীয় ?"

মৃদু হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "না, খুব দূর-সম্পর্কীয় নয়।"

বরেনের সম্বন্ধে একটু সবিস্তার সংবাদ লইবার কথা মাঝে মাঝে হরিচরণের মনে হইত—আজও মনে করিতেছিলেন লইবেন, কিন্তু শশিনাথের কথা শুনিয়া আর নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। শশিনাথও

কথাটা প্রথম দিনেই বেশি খুলিয়া না বলিয়া সুধীরের কথা উথাপন করিল।

"বড়মানুষের ছেলেদের মধ্যে সুধীরের দৃষ্টান্ত বিরল। অপরে তার বিপুল অর্থটাই আগে দেখে; কিন্তু তাকে যারা জানে, তারা জানে যে, টাকাটাই তার কম, অন্য সব গুণের তুলনায়।"

এমন সৎপাত্রের সহিত লীলার বিবাহ হইতেছে বলিয়া হরিচরণ বিশেষ-ভাবে আনন্দ প্রকাশ ও মঙ্গলকামনা করিলেন।

লীলার নিকট প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়া শশিনাথ উঠিয়া পড়িল, কহিল, "রাত হয়েছে, আজ যাই।"

লীলা ও শশিনাথকে সরযূ নীচের তলা পর্যন্ত আগাইয়া দিল। গাড়ি একটু দূরে রাখিয়াছিল; শশিনাথ গাড়ি ডাকিতে যাইলে, সরযূ লীলার হাত ধরিয়া স্মিতমুখে বলিল, "লীলা, এমনি মাঝে মাঝে এস ভাই, বিয়ের আমোদে যেন একেবারে ভুলে যেয়ো না।"

একটু বিরক্তিভরে লীলা কহিল, "বিয়েটা কি এতই অদ্ভুত জিনিস?"

হাস্যমুখে সরযূ কহিল, "আমার পক্ষে তো খুবই ভাই। বিয়েব নামেই যে সুখের আস্বাদ পেয়েছি—আসলে সে জিনিসটা কতই না অদ্ভুত হবে!"

সরযূর কহিনী স্মরণ করিয়া লীলা দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইল। তাহারই মত সরযূরও হৃদয়ে নিদারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছে· তাই এই পরিহাসের ছলনায় আপনাকে ভুলাইবার প্রয়াস। ক্ষণিক উত্তেজনায় তাহার মনে হইল সরযূকে বলে, আমারও পক্ষে জিনিসটা তোমার চেয়ে কম অদ্ভুত নয়। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া কহিল, "সেই অদ্ভুত জিনিসের জন্যে যদি আমাকে সব ভুলতে হয়, তুমি আমাকে ভুলনা সরযূ।"

লীলাকে দুই বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সরযূ কহিল, "কখনো না। তোমার শশিদাদা—"

শশিনাথ আসিয়া ড়ায় কথাটা শেষ হইল না—শশিনাথের কর্ণে কিন্তু

সরযূর শেষ কয়েকটি কথা প্রবেশ করিয়াছিল; হাসিয়া কহিল, "আমি কি, সরযূ?"

প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমটা সরযূ অপ্রতিভ হইয়া গেল; কিন্তু তখনি মৃদু হাসিয়া কহিল, "শুনলে আপনার গর্ব হবে।" মনে মনে বলিল, 'দেবতা'।

"তেমন মিথ্যে কথা তবে শুনে কাজ নেই।" বলিয়া শশিনাথ হাসিতে হাসিতে লীলাকে লইয়া গাড়িতে উঠিল।

উপরে আসিয়া সরযূ দেখিল, হরিচরণ শয্যার উপর বসিয়া নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিতেছেন। সরযূ কহিল, "বাবা, বেশিক্ষণ বসে থাকলে কষ্ট হবে,—শোও।"

মুখ তুলিয়া চাহিয়া হরিচরণ কহিলেন, "কোন কষ্ট হচ্ছে না মা।" তাহার পর তীক্ষ-দৃষ্টিতে কন্যার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া একটু ইতস্ততভাবে কহিলেন, "সরযূ, এরা কি চমৎকার লোক!"

"কারা বাবা?"

"শশিনাথরা।"

"চমৎকার।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হরিচরণ কহিলেন, "শশিনাথের মত আর একটি ছেলে দেখেছি, তা তো মনে হয় না। যেমন উদার—তেমনি পরোপকারী। তোমার কি মনে হয় মা?"

সরযূ কহিল, "আমারও ঠিক তাই মনে হয় বাবা।"

হরিচরণ কহিলেন, "যে বিপদে আমরা পড়েছিলাম, তা থেকে শশিনাথ যদি আমাদের এমন ক'রে উদ্ধার না করত, তা হলে আমাদের কি দুর্দশা হ'ত তা বলা যায় না।"

তাহাতে আর কথা আছে! হরিচরণের এ কথায় সরযূর প্রাণ তড়িৎস্পৃষ্টের মত সাড়া দিয়া উঠিল। বাস্তবিকই শশিনাথ তাহাদের উদ্ধারকর্তা। বিলাসপুরে সমাজ-দৈত্যের সেই নির্দয় উৎপীড়নের সময়ে যদি শশিনাথ দেবতার মত

সেখানে গিয়া না দাঁড়াইত, তাহা হইলে পরিত্রাণ আর কোথায় ছিল! সেই ভীষণ শত্রুসঙ্ঘের মধ্য হইতে বাহির করিয়া মুমূর্ষু পিতাকে রক্ষা করিবার কি উপায় সে করিতে পারিত! ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় সরযূর হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। না চাহিতে এত দয়া, না চাহিয়া এত পাওয়া! সরযূ না-জানা দেবতার চরণে ভক্তির অঞ্জলি দিয়া আসিয়াছে; আজ এই প্রত্যক্ষ জাগ্রত দেবতার চরণোদ্দেশে সে মনে মনে বারম্বার মস্তক নত করিল।

"সরযূ!"

"কি বাবা?"

"শশিনাথ পুণ্যবান, ধার্ম্মিক, বলবান। তার আশ্রয় পেয়ে পর্যন্ত আমরা নিরাপদ নিশ্চিন্ত হয়েছি। এ আশ্রয় আমাদের চিরস্থায়ী হ'লে কেমন হয় মা?"

হরিচরণের কথার সূত্রটি ঠিক ধরিতে না পারিয়া একটু দ্বিধার সহিত সরযূ বলিল, "তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি নে বাবা।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া হরিচরণ কহিলেন, "শশিনাথের হাতে তোমাকে দেওয়ার কথা বলছি মা। তোমার কি কোন অমত আছে?"

হরিচরণের কথা শুনিয়া সরযূ একেবারে নীরব হইয়া গেল, তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। লজ্জা বা সঙ্কোচে নহে, বিবাহের প্রসঙ্গে একটা তীব্র অবমাননার আঘাতে তাহার মুখমণ্ডল রক্তাভ না হইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। এখনও ক্ষত আরোগ্য হয় নাই—পুনরায় অস্ত্রাঘাত!

সরযূকে নীরব থাকিতে দেখিয়া হরিচরণ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠলেন। কহিলেন, "তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কথা বলব না মা; কিন্তু তুমি শশিনাথকে স্বামীরূপে লাভ কর—এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ তোমাকে আমি কি করতে পারি, তা জানি নে।"

কাতর-মিনতি-কণ্ঠে সরযূ কহিল, "তোমার শরীর এখনও তেমন ভাল হয় নি, এখন এসব কথার দরকার কি বাবা?"

হরিচরণ শয্যার উপর সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, "ঠিক সেই জন্যেই দরকার সরযূ। আমার এ কামনা যদি জগদীশ্বর পূর্ণ করেন, তা হ'লে সেই আনন্দই আমার রোগের ধন্বন্তরী হবে। তা ছাড়া আমার এ রোগ যদি সারবার না হয়, তা হ'লে তো এ কথার আরও বেশি দরকার। তুমি তো বুদ্ধিমতী—সব বোঝ মা।"

সরযূর দুই চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। যে নিদারুণ অমঙ্গলের কথা কখন কখন তাহার মনের মধ্যে উদিত হইয়া নিবিড় অন্ধকারের সৃষ্টি করে, আজ পিতার মুখে তাহার ইঙ্গিত শ্রবণ করিয়া সরযূ যেন সহসা চতুর্দিক অন্ধকার দেখিল। তবে কি সেই মহাবিপদের দিন অচিরে উপস্থিত হইবে বলিয়া তাহার আশ্রয় বাঁধিয়া দিতে পিতা এত ব্যগ্র হইয়াছেন!

হরিচরণ বলিতে লাগিলেন, "লীলার বিয়ে স্থির হওয়ার পর আমার এ কথা মনে হয়। এ বিষয়ে সোমনাথের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে; তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস শশিনাথও আমার এ অনুরোধ নিশ্চয়ই রাখবে। এই রোগশয্যায় শুয়ে তোমার এ ব্যবস্থা যদি করতে পারি সরযূ—তা হ'লে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হই। আমি এ বিষয়ে সব কথা ভেবে দেখেছি—এখন মনের মধ্যে বিচার ক'রে দেখ।"

হরিচরণের শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হরিচরণের পদদ্বয়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সরযূ একবার আত্মনিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের সংবাদ লইল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "তোমার আশীর্বাদের ওপর আমার কোন বিচার নেই বাবা।" দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু হরিচরণের পায়ের উপর আশ্রয়লাভ করিল।

পরম স্নেহে সরযুর আনত মস্তক এক হস্তে ধারণ করিয়া হরিচরণ অপর হস্ত কন্যার মস্তকে ধীরে ধীরে একান্ত মঙ্গলকামনার সহিত বুলাইতে লাগিলেন। সরযূর ঘননিবদ্ধ কেশের উপর দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

গভীর নিশীথ। হরিচরণ বহুক্ষণ নিদ্রিত হইয়াছেন, সরযূর চক্ষে কিন্তু নিদ্রা নাই। সে তাহার শয্যায় স্থির নিশ্চল হইয়া শয়ন করিয়া তদ্গতচিত্তে চিন্তা করিতেছিল। বিস্তৃত নদীসৈকত শুভ্র জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইলে যেমন হয়,—আদি নাই, অন্ত নাই, অনির্ণীত, অস্পষ্ট, কিন্তু অবাধ আলোকের খেলা—তেমনি সরযূ অন্তরের মধ্যে আজ সমস্তই অবিন্যস্ত অনিশ্চিত হইলেও একটা তরল আনন্দের প্রবাহ তাহার চিত্তকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। প্রথমে সে নিজ হৃদয়ের পরিচয় জানিত না। তাই সন্ধ্যাকালে পিতার প্রস্তাব তাহাকে শুধু চকিত করে নাই, ক্ষুণ্ণও করিয়াছিল। তখন ভস্মে প্রচ্ছন্ন বহ্নির মত, বিরক্তি ও ঘৃণার মধ্যে প্রেম ছিল অদৃশ্য। যে জিনিসটা মিথ্যা ও ভ্রান্তি বলিয়া প্রকাশ নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল, তাহার বীজ একেবারে নষ্ট না হইয়া তখন যে তাহার হৃদয়ের মধ্যে জীবিত ছিল, তাহা সরযূ জানিত না। শশিনাথ সহসা সে সংবাদ দিয়াছে,—যেখানে চিরান্ধকার ঘিরিয়া ছিল, তথায় চন্দ্রালোক আনিয়াছে—নির্বাণ দীপে রশ্মি সংযোগ করিয়াছে।

সরযূ ভাবিতেছিল শশিনাথের কথা। সেই শান্ত, সৌম্য, সুন্দর শশিনাথ সংযত অথচ অনুরক্ত—নির্বিরোধী অথচ নির্ভীক—তাহাদের আশ্রয়দাতা, পরিত্রাতা, বিপদের বন্ধু শশিনাথ, যাহাকে এতদিন সরযূ দীননাথরূপে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ তিনি হৃদয়নাথরূপে দেখা দিতেছেন। অমিশ্র-ভক্তি আজ প্রেমেস্নিগ্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছে! এ এতই আশাতিরিক্ত এতই সঙ্গতি সম্ভাবনারবহির্ভূত যে, সরযূ পুষ্পের মধ্যে কীটের মত, আনন্দের মধ্যেসংশয়ের পীড়া অনুভব করিতেছিল। এ যে সুস্বপ্নের অধিক কিছু,—কার্যে পরিণত হইবার মত ইহা যে বাস্তব, তাহা বিশ্বাস করিতেসরযূর হৃদয় কাঁপিতেছিল। সে নিশ্চল হইয়া শশিনাথের কথা

চিন্তা করিতে লাগিল ; বিলাসপুরে প্রথম দিনের দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সন্ধ্যায় গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া পর্যন্ত। নিদ্রা সরযুর চক্ষু হইতে বিদায় লইয়াছিল।

অপর একটি গৃহে একটি কক্ষে ঠিক সেই সময়ে আর একটি বালিকা বিনিদ্রচক্ষে শয়ন করিয়া ছিল। কিন্তু সরযুর মত তাহার চক্ষে আনন্দের তড়িৎশিখা খেলা করিতেছিল না। মেঘভারাক্রান্ত বিষণ্ণ আকাশের মত চক্ষুর্দ্বয় হইতে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু স্খলিত হইতেছিল। লীলা নিস্পন্দ হইয়া আপনার অদৃষ্ট-চিন্তা করিতেছিল। শশিনাথ হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তাহার এ অশ্রু নহে। সে কাঁদিতেছিল তাহার ভবিষ্যৎজীবন কল্পনা করিয়া। যে ধনীর গৃহে সে গৃহিণী হইতে চলিয়াছে সে গৃহ তাহার মানসচক্ষে কারাগৃহের মত মনে হইতেছিল, যেখানে তাহার দেহ নিরুপায় হইয়া অবরুদ্ধ থাকিবে, মন থাকিবে না। মন তবে কোথায় থাকিবে? এই গৃহে কি, যেখানে শয়ন করিয়া সে ভবিষ্যৎ জীবনের বিভীষিকা দেখিতেছে? না, না, নিশ্চয়ই তাহা নহে। যাদুকরের মন্ত্রবলে আজ সহসা এই গৃহের প্রতি তাহার মনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এই করুণা-অনুগ্রহের গৃহে তাহার দেহ এখনও পড়িয়া রহিয়াছে বটে কিন্তু মন তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল, গৃহটা যেন কোন ভীষণ দানবের মুখগহ্বর, তাহাকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে ; এবং গৃহের সামগ্রীগুলা যেন দন্তশ্রেণী, তাহাকে নির্দয়ভাবে দংশন করিতেছে। যে গৃহে সে সর্বোচ্চ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে মনে করিয়া এতদিন আত্ম-মর্যাদায় অক্ষুণ্ণ ছিল, আজ সে বুঝিয়াছে তথায় সে নিতান্ত কৃপার পাত্রী ভিন্ন অধিক কিছুই নহে। তথায় দয়া তাহার জন্য উন্মুখ,—প্রেম নহে। সে বড় নিরুপায় বলিয়া তাহাকে দিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত—তাহার নিকট হইতে লইবার কাহারও কিছুই নাই। একটা গ্লানিকর 'দীনতার হীনতায় লীলার মন কঠিন হইয়া উঠিল ; দুঃখের স্থান অভিমান গ্রহণ করিল। সে নিশ্চল হইয়া শশিনাথের কথা চিন্তা করিতে লাগিল, চা-খাওয়ার দিন হইতে

আরম্ভ করিয়া আজ সন্ধ্যায় ইডেন্‌গার্ডেনে উপদেশবর্ষণ পর্যন্ত। নিদ্রা লীলায় চক্ষু হইতে আজ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল।

বরেনও তাহার শয্যায় শুইয়া বিনিদ্র হইয়া চিন্তা করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল বিলাসপুরের কথা, হরিচরণ প্রভৃতিকে কলিকাতা লইয়া আসার কথা, প্রকাশের অদ্ভুত আচরণের কথা, এবং এই সকল ঘটনার পরিণতি তাহার হৃদয়ে বাসনা ও আশার যে প্রবল বন্যা আনিয়াছে—তাহার কথা। প্রথম যেদিন সে সরযূকে দেখে, সেদিন শুধু তাহার চক্ষুই আক্রান্ত হইয়াছিল, একটা সবিস্ময় প্রশংসার প্রলেপ তাহার চক্ষে লাগিয়াছিল, কিন্তু বাসনার দ্বার অসম্ভবতার কঠিন অর্গলে তখন একেবারে রুদ্ধ ছিল। তাহার পর ঘটনার পর ঘটনা অতিক্রম করিয়া যেদিন বহুবাজারের মেসে প্রকাশের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ও কথা-বার্তা হইল, সেইদিন অসম্ভাব্যতার অর্গল মুক্ত হইয়া গেল। হৃদয়ের নিভৃত-প্রদেশে যাহা দুরাশার অস্পষ্ট ছায়ারূপেও বিদ্যমান ছিল না, শশিনাথের রহস্যের ইঙ্গিতে তাহা সহসা মূর্তি ধারণ করিয়া তাহার হৃদয়ে আশার রশ্মিজাল বিস্তার করিল। কিন্তু বাসনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রস্তাব ও প্রয়াস করিতে তাহার মনের মধ্যে একটা কুণ্ঠা আসিয়া জুটিল। সে যেন নিতান্তই লোভীর মত আচরণ হয়; পরের দুঃখ মন্থন করিয়া নিজের সুখসৃষ্টি করিবার একটা নির্লজ্জ উদ্বেগ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাই শশিনাথেরও কাছে কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল।

বরেন ভাবিতেছিল সরযূর কথা। সেই শান্ত সুন্দর স্বপ্নের মত মনোরম অথচ বাস্তবের মত সুখদায়িনী সরযূ! সেই সরযূ আজ আর তাহার আশা-আকাঙ্খার অনধিগম্যা নহে। এখন শুধু সম্ভবকে বাস্তব করা, হৃদয়লক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মীরূপে পাওয়া। ভবিষ্যতের মনোরম কল্পনায় বরেন নিমজ্জিত হইল। নিদ্রা তাহারও চক্ষু হইতে আজ বিদায় লইয়াছিল।

অপর একটি কক্ষে আর একজন শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতেছিল, এই তিন জনেরই কথা। সে শশিনাথ। সে ভাবিতেছিল, তাহার দুই বন্ধু সুধীর ও

বরেনের দ্বারা দুইটি আহত আর্ত বালিকা-হৃদয়ের গ্লানিকে নিরাময় করিতে হইবে। দূষিত বায়ুর প্রভাবে প্রেম যেখানে ফুল না ফুটাইয়া কণ্টক সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে ফুল ফুটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পর জীবনসূত্রে এই যে দুইটি নারী লইয়া কঠিন গ্রন্থি লাগিয়াছে, তাহা বিমুক্ত হইয়া গেলেই সে একেবারে মুক্ত। তখন সে, উন্মুক্ত উদার সাগরবক্ষে নদীর মত নিজেকে নিবেদন করিবে সেই বিরাট-বিপুল কর্ম-সমুদ্রে যাহা চিরদিন তাহার হৃদয়কে লুব্ধ ও চমৎকৃত করিয়া রাখিয়াছে। তখন সে সংসারের সকল প্রকার দেনাপাওনা হিসাবপত্র মিটাইয়া নতমস্তকে সংযতহৃদয়ে উপনীত হইবে সেই চিরবাঞ্ছিত চির-আকাঙ্ক্ষিত রামকৃষ্ণ-কর্মমন্দিরের সিংহদ্বারে।

আজ সন্ধ্যাকালে ইডেন্‌গার্ডেনে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া শশিনাথ মনের মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে লীলার মনে সে যে ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা নিরাময় করিবার আগ্রহ ও শক্তি ভগবান যে তাহাকে দিয়াছেন, তাহার জন্য সে সর্বান্তঃকরণে ভগবৎ–চরণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিল; এবং মনের এই বল ও প্রবৃত্তি ভবিষ্যতে হারাইতে না হয়, সে বিষয়ে মনে মনে প্রার্থনা করিয়া শশিনাথ নিদ্রার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

১৮

কয়েকদিন পরে হরিচরণের গৃহে শশিনাথ ও বরনের নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যার পর দুই বন্ধু একত্রে যখন তথায় উপস্থিত হইল, তখন হরিচরণ নিজ কক্ষে দ্বার বন্ধ করিয়া জপ করিতেছিলেন এবং সরযূ রন্ধনশালায় পাচককে রন্ধন করাইতে ও নিজে রন্ধন করিতে ব্যস্ত ছিল।

শশিনাথ ও বরেনকে দেখিয়া সরযূ রন্ধনকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "বাবা বোধ হয় জপ করছেন, আপনারা উপরে গিয়ে বস্থন।"

শশিনাথ কহিল তা আমরা বসছি কিন্তু তুমি নিজে এত কষ্ট করছ কেন? আমাদের দুজনের পক্ষে তোমার রাঁধুনি-বামুনই তো যথেষ্ট।"

মৃদু হাসিয়া সরযূ বলিল, "এতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।" তাহার পর বরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "আপনি সকালে লিখেছিলেন, শরীর ভাল নেই—কোন অসুখ করেছিল কি?"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বরেন কহিল, "না, বিশেষ কিছু নয়, শরীরটা বেশ ভাল বোধ হচ্ছিল না।"

বিস্মিতকণ্ঠ শশিনাথ কহিল, "তাই লিখেছিলে না কি হে? সকাল-বেলা উঠে সে মিছে কথাটা লেখবার কি দরকার ছিল, সন্ধ্যাবেলা খেতে ব'সে যার কোন প্রমাণ দিতে পারবে না?"

বরেন হাসিয়া কহিল, "তা তুমি যাই বল না কেন, সকালবেলা যে সত্যি কথা বলেছি, খেতে ব'সে তার প্রমাণ দেবার একটুও চেষ্টা করব না; বরং এমন বিপরীত আচরণ করব, যাতে আজকের মত কাল সকালেও বলতে পারি—শরীরটা ভাল নেই।" বলিয়া বরেন হাসিতে লাগিল।

"তা হলে আজ তোমার কতটা আয়োজন করতে হবে, বুঝতে পারছ তো সরযূ?" বলিয়া শশিনাথ সহাস্যে সরযূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

বরেনের দিকে চাহিয়া সরযূ একটু হাসিল; তাহার পর মৃদুস্বরে কহিল, "এ দুর্নামটুকু আপনি শুধু মেনে নেন ব'লেই আছে, নইলে আর কোন কারণ নেই।"

শশিনাথ কহিল, "এ দুর্নাম নয় তো সরযূ, এ সুনাম। শুনেছ তো সুস্থ ভদ্রব্যক্তি মাত্রেই তিন পোয়া ক্ষীর দিয়ে চার ডজন লুচি খেয়ে থাকেন। অসুস্থ ভদ্রব্যক্তি ক-ডজন খান, আজ সেটা জানা যাবে!"

শশিনাথ ও বরেন উভয়েই হাসিয়া উঠিল, এবং এবার সরযূও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

উপরে আসিয়া দুই বন্ধু হরিচরণের ঘরের পাশের ঘরে দুইটা চেয়ারে মুখোমুখি হইয়া বসিল। শীতকাল হইলেও পথের দিকের দুইটা জানালা খোলা ছিল, তাহা দিয়া পথের অপর পার্শ্বস্থিত একটা গৃহ হইতে সঙ্গীতের অস্পষ্ট ধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

সঙ্গীতের উপর এক মুহূর্ত মন নিবিষ্ট করিয়া শশিনাথ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তুমি যদি সঙ্গে না থাকতে তা হ'লে আজ তোমার বিয়ের কথাটা তুলে একেবারে পাকা ক'রে দিতাম।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া একবার ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া চাপা গলায় বরেন কহিল, "না না, শশি, ছেলেমানুষি করো না। কাল সন্ধ্যাবেলা তোমার সঙ্গে ওসব কথা হওয়ার পর আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, এখন হরিচরণবাবুর কাছে এসব কথা তোলা একেবারেই ভাল হবে না, যতদিন না তাঁদের দিক থেকে সরযূর বিয়ের কথা উঠছে, ততদিন বুঝতে হবে সে কথাটা তুললে তাঁদের মনে কষ্ট দেওয়াই হবে। বর্মা থেকে আমার ফিরে আসবার আগে এ কথা তুলো না।"

রেঙ্গুনে বরেনের এক ভগ্নীপতি থাকিতেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া ভগ্নীকে লইয়া পরবর্তী জাহাজে বরেনের রেঙ্গুন যাওয়া স্থির হইয়াছিল।

শশিনাথ কহিল, "ছেলেমানুষি তুমিই করছ। যদি আমাদের কাছে কথাটা তোলবার আগে তিনি অন্য জায়গায় সরযূর বিয়ে স্থির ক'রে ফেলেন, তখন কি হবে!"

একমুহূর্ত ভাবিয়া বরেন কহিল, "না, সে রকম কখনই হবে না। তোমার অজানায় এঁরা কোন কাজ করবেন না, তা একেবারে নিশ্চয়।" তাহার পর শশিনাথের দিকে ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আর একটা কথা, তোমার আমার

দাবি উপেক্ষা করে এঁরা অন্য জায়গায় যাবেন না। প্রথমে আমাদেরই কাছে প্রস্তাব আসবে।"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "এ সিদ্ধান্ত তুমি কেমন করে করছ? তুমি কি মনে কর, আমাদের চেয়ে সৎপাত্র বাংলাদেশে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না?"

হরিচরণের ঘরের দরজা খোলার শব্দ পাইয়া বরেন তাড়াতাড়ি মৃদুস্বরে কহিল, "চট করে পাওয়া যাবে না—অন্তত আমার বর্মা থেকে ফিরে আসবার আগে পাওয়া যাবে না। আগে আমি ফিরে আসি, তারপর পরামর্শ ক'রে যা হয় করা যাবে।"

শশিনাথ ও বরেনের আগমন হরিচরণ তাহাদের পদশব্দে এবং কণ্ঠ স্বরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাদিগকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন।

আহার প্রস্তুত হইলে পাশের ঘরে তিনখানি আসন প্রস্তুত করিয়া সরযূ আহারের জন্য সকলকে আহ্বান করিল।

আহার আরম্ভ হওয়ার পর শশিনাথ ও বরেনের মধ্যে যথারীতি কৌতুক কলহ আরম্ভ হইল এবং সেই বিবাদের মধ্যে সময়ে সময়ে সরযূ শশিনাথ কর্তৃক সাক্ষ্যরূপে আহূত হইয়া বিপন্ন হইতে লাগিল। সেদিন শশিনাথের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তার পর আজ সরযূ পিতার সম্মুখে শশিনাথের সহিত পূর্বের মত সহজ ভাবে কথা কহিতে পারিতেছিল না। শুধু বাক্যেই নহে, পরিবেশনেও সে মনে মনে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। তাই মাছের কালিয়ার পাত্র মন্থন করিয়া যখন সুবৃহৎ মুড়াটা তাহার হাতায় উঠিয়া আসিল তখন বিপরীত ইচ্ছা সত্ত্বেও, আহার্যের সেই পরম উপাদেয় বস্তুটি বরেনের পাত্রেই নিক্ষেপ করিল। বরেন কিন্তু সহসা তাহার চিত্তহারিণীর নিকট হইতে পক্ষপাতিত্বের এমন পুষ্ট প্রমাণ পাইয়া বিড়ম্বিত হইয়া উঠিল, এবং সেই অনুপেক্ষণীয় বৃহৎ বস্তুটি, যাহাকে তৎক্ষণাৎ বা অল্প সময়ে অদৃশ্য করিবার কোন উপায়ই ছিল না শশিনাথের

দৃষ্টিতে পড়িয়াছে কি না দেখিবার জন্য নেত্রোত্তোলন করিতেই বরেনের চক্ষুর সহিত শশিনাথের চক্ষু মিলিত হইল।

বরেনের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া শশিনাথ দুষ্ট-হাসি হাসিয়া কহিল, "লজ্জা ক'রো না বরেন, মুড়োটা পাত্রেই পড়েছে।"

ক্ষণিকের জন্য সরযূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বরেন দেখিল, শান্ত সপুলকহাস্যে সরযূ তাহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রথমটা তাহার মুখে কোন কথা আসিল না, তাহার পর শশিনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি যে অপাত্র, তা নয়; কিন্তু এর মধ্যেও ভাগ্যের খেলা আছে, তাই তোমার পাতে না প'ড়ে আমার পাতেই পড়ল।"

শশিনাথ মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, ভাগ্যের খেলা একটুও নয়—এ সরযূর একান্তই বিবেচনার ক্রিয়া। তোমাকে অতিক্রম ক'রে আর কারো অধিকার নেই, সরযূর এই ধারণার জন্যই তুমি পেয়েছ। এ তোমার ভাগ্য নয়, ভাগ। কি বল সরযূ, তাই না?"

একটিবার মাত্র মৃদু হাস্যের সহিত শশিনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সরযূ বরেনের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি ওসব কথায় কান দেবেন না। আমি এই মনে ক'রে দিয়েছি যে, আপনাকে দিলে ওটা নষ্ট হবে না।'

সরযূর কৈফিয়ৎ শুনিয়া শশিনাথ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "অর্থাৎ তোমার এই ধারণা ছিল যে, আর কাউকে দিলে ওটা নষ্ট হবে।" আমিও তো তাই বলছি যে, শক্তি পরিমাণ বিবেচনা ক'রে দিয়েছ।"

অমিশ্র পুলকের সহিত হরিচরণ বন্ধুদ্বয়ের এই পরিহাস-কৌতুক উপভোগ করিতেছিলেন। এই শিক্ষিত ও মার্জিত যুবকদ্বয়ের কপট কলহ দেখিতে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন বলিয়া সর্বদাই ইহাদিগকে আহ্বান করিতেন। সেই বৃহৎ এবং কঠিন মুড়াটা আয়ত্ত করিতে বরেন একটু বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া হরিচরণ সরযূকে কহিলেন, "শক্তির পরিমাণ কিন্তু তুমি বিবেচনা কর

নি মা। তা হ'লে অত শক্ত মুড়াটা আস্ত পাতে দিয়ে কখনই বরেনকে বিব্রত করতে না।"

বরেনের বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সরযূ অপ্রতিভ ও অনুতপ্ত হইয়া অবিলম্বে একটা পাত্র ও একটা রন্ধনযন্ত্র লইয়া আসিল, এবং বরেনের সনির্বন্ধ নিষেধ-সত্ত্বেও সেই ভুক্তাবশিষ্ট মাছের মুড়া পাত হইতে তুলিয়া লইয়া চূর্ণ করিয়া চামচের সাহায্যে কঠিন আবরণের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যপদার্থ যথাসম্ভব বাহির করিয়া সযত্নে বরেনের পাত্রে দিতে লাগিল। নিজের অন্তর্নিহিত সঙ্কোচের তাড়নায় এবং শশিনাথের নিগূঢ় পরিহাসের আশঙ্কায় সেই অতি-কোমল পদার্থ আহার করাই বরেনের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

আহারান্তে আরও কিছুক্ষণ গল্পের পর শশিনাথ ও বরেন বিদায়-প্রার্থনা করিল।

হরিচরণ মনে করিয়াছিলেন, শশিনাথের সহিত সরযূর বিবাহের কথা প্রথমে বরেনের দ্বারাই শশিনাথের নিকট উত্থাপিত করাইবেন। সুযোগ হইলে অদ্যই এ বিষয়ে বরেনের সহিত পরামর্শ করিবেন—এ সংকল্প তাঁহার ছিল, কিন্তু শশিনাথ সর্বদা উপস্থিত থাকায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। প্রস্থানকালে সরযূর সহিত কথা কহিতে কহিতে শশিনাথ একটু আগাইয়া যাওয়ায় হরিচরণ বরেনকে মৃদু-কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটু পরামর্শ ছিল বরেন, কিন্তু আজ আর তা হয় না। তুমি বর্মা থেকে ফিরে এলেই হবে।"

বরেন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যদি বিশেষ দরকার হয়, তা হ'লে আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি, কিংবা কাল কোন সময়ে একবার—"

হরিচরণ কহিলেন, "না না, আজ রাত হয়ে গিয়েছে, কালও তোমাকে বিব্রত করা ঠিক হবে না। তুমি ফিরে এলেই হবে। কথাটা দরকারী বটে, তবে তাড়াতাড়িও নেই। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, সরযূর বিয়ের বিষয়ে তোমার

কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। কিন্তু এসব কথা তো সংক্ষেপে হবার নয়। তুমি ফিরে এস, তারপর হবে।"

হরিচরণের কথা শুনিয়া বরেনের হৃদয় উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। এ অনুরোধ যে সরযূকে বিবাহ করিবার জন্য তাহারই প্রতি অনুরোধ, হরিচরণের কথার মধ্যে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও, বরেনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিভ্রান্ত-হৃদয় একেবারে অসংশয়ে তাহা মানিয়া বসিল। এ কথা তাহার একবারও মনে হইল না যে, এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিবাহ-সম্বন্ধে পরামর্শ অধিকাংশ স্থলে পাত্র অপেক্ষা পাত্রের অভিভাবক এবং আত্মীয়-বন্ধুগণেরই সহিত হইয়া থাকে, এবং এ ক্ষেত্রে সে পাত্র না হইয়া পাত্রের নিকটতম বন্ধুও হইতে পারে। অতি সংক্ষেপে একটি মাত্র "আচ্ছা" বলিয়া সে হর্ষোদ্বেলিত-হৃদয়ে শশিনাথ ও সরযূকে অনুসরণ করিল।

পথে আসিয়া শশিনাথ কহিল, "মিছে তুমি বাধা দিলে, নইলে আজ তোমার বিয়ের কথাটা পাকা ক'রে ফিরতাম। কি জান? এসব কাজ ফেলে রাখতে নেই; লোকে কথায় বলে—শুভস্য শীঘ্রং।"

বরেন হাসিয়া কহিল, "লোকের কথা শুনো না ভাই, সবুরে মেওয়া ফলে লোকে তাও তো বলে।"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "মেওয়া ফলে বটে, কিন্তু কার মেওয়া ফলে, সেই হচ্ছে কথা। তুমি সবুর করলে যদি আমার মেওয়া ফলে, তা হ'লেই তো বিপদ!"

বরেন হাসিয়া কহিল, "সে ভয় করি নে; বৈরাগ্যের আগুনে ঝলসানো তোমার শুকনো গাছে মেওয়া ফলবে, তার সম্ভাবনা নেই।"

দক্ষিণ বাহুর দ্বারা বরেনকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া শশিনাথ বলিল, "অতটা দুঃসাহস ভাল নয়, শিগগির শিগগির ফিরে এসো। দেরি ক'রে এসে যদি দেখ সেই অল্প সম্ভাবনার ফলটিই ফলেছে, তখন আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না।"

বরেন কহিল, "তা নিশ্চয়ই থাকবে না, কেন না বিস্ময়টাই সমস্ত জায়গা জুড়ে থাকবে।"

সহসা অতিশয় আগ্রহের ভাব দেখাইয়া শশিনাথ কহিল, "আচ্ছা বরেন রেঙ্গুন থেকে ফিরে তুমি যদি দেখ যে, ইত্যবসরে সরযুর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছি, তখন আমার উপর তোমার মনের অবস্থা কেমন হয়, সত্যি ক'রে বলবে ?"

হাস্যমুখে বরেন কহিল, "বেশ রোমাঞ্চকর ক'রে বলব ?"

"বল না।"

"তোমাকে হত্যা করবার জন্যে দোকান থেকে ছোরা কিনে এনেছি শুনলে তোমার মনের অবস্থা যেমন হয়, ঠিক সেই রকম।"

দুই বন্ধুর উচ্চ হাস্যে শীতের স্তব্ধ পল্লী চকিত হইয়া উঠিল।

১৯

বরেন রেঙ্গুন যাইবার কয়েক দিন পরে লীলার বিবাহে পিসীমাকে আনিবার জন্য শশিনাথ কাশীতে উপস্থিত হইল। পিসিমা কিন্তু সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি কিছুতেই যাব না। এ যদি তোর সঙ্গে লীলার বিয়ে হ'ত, তা হ'লে যে-রকমেই হোক এই পঙ্গু দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতাম। হ্যাঁ রে শশি, এ ব্যাপার তো শুধু তোর মতেই হচ্ছে ?"

প্রথমটা শশিনাথ অপ্রতিভ হইয়া গেল, তাহার পর হাসিয়া কহিল, "এখন তো সকলেরই মতে হচ্ছে। তুমি যদি সব কথা একটু ধৈর্য ধ'রে শোন পিসিমা, তা হ'লে তোমারও মত হবে।"

"আমার ধৈর্য নেই যে, ব'সে ব'সে এই অবিচারের কৈফিয়ৎ শুনব। আমি যে ওর মামার কাছে কথা দিয়ে ওকে নিয়ে এসেছিলাম, আর তোরা

এমন লক্ষ্মীকে মিছামিছি ঘরের বার ক'রে দিচ্ছিস? কেন, তুই কি মনে করিস লীলা তোর অনুপযুক্ত?"

ব্যস্ত হইয়া শশিনাথ কহিল, "আমি তা একবারও মনে করি নে পিসিমা। কি রকম পাত্রের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়েছে, শুনলে তুমি বুঝতে পারবে যে লীলারই ভালর দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এ ব্যবস্থা করেছি।"

অপ্রসন্ন-মুখে পিসিমা কহিলেন, "একটুও না। তুই যে তার কত বড় মন্দ করলি, তা যদি একবার বুঝতিস, তা হ'লে এ ব্যাপার কখনই করতিস নে।"

ব্যগ্রভাবে শশিনাথ কহিল, "কিন্তু পিসিমা, লীলার মত করিয়ে মুখ থেকে কথা নিয়ে তবে আমি এ বিয়ে স্থির করেছি।"

পিসিমা কহিলেন, "সে যে তার কত বড় দুঃখের, কত বড় অভিমানের কথা তা তুই কি বুঝিবি! সে সব কথা তো আর তোদের পাস করবার বইয়ে লেখা থাকে না!'

আগ্রহভরে শশিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "সে তোমাকে কিছু লিখেছিল না-কি? বউদি কিছু লিখে ছিলেন?"

শশিনাথের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া পিসিমা কহিলেন, "জোর ক'রে যা করছিস কর, বিশ্বনাথের কৃপায় সব যেন মঙ্গলই হয়। কিন্তু আমাকে রেহাই দে। যাকে আমি বুকে ক'রে নিয়ে এসেছিলাম, তাকে বিদায় করবার জন্য আমাকে টেনে নিয়ে যাস নে—আমার শরীরও ভাল নেই, মনও ভাল নেই।"

দুই দিন অবস্থান করিয়া, নানা প্রকার অনুরোধ উপরোধ সাধ্য সাধনা করিয়াও শশিনাথ পিসিমাকে কলিকাতা যাইতে স্বীকৃত করিতে পারিল না। আরও একদিন অপেক্ষা করিবে, না, ফিরিয়া যাইবে,—স্থির করিতে পারিতেছিল না, এমন সময়ে সোমনাথের নিকট হইতে তার পাইল—হরিচরণ সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত, সে যেন অবিলম্বে কলিকাতা রওনা হয়। অগত্যা শশিনাথ একাকীই কলিকাতা যাত্রা করিল।

সে যখন কলিকাতায় পৌছিল, তখন কলিকাতার একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের

মতে হরিচরণের জীবন-সীমা দুই তিন ঘণ্টার অধিক অতিক্রম করিবার কথা ছিল না। রোগীর শিয়রে শশিনাথ যখন উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। সোমনাথ, উর্মিলা ও লীলা—তিন জনেই তথায় উপস্থিত ছিল। রোগীকে দেখিয়া যত না হউক, সরযূর আকৃতি দেখিয়া শশিনাথ শিহরিয়া উঠিল। কয়েক দিন ধরিয়া পিতার অসুখের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবার বিনিময়ে কোন ফল না পাইলা উদ্বেক ও নৈরাশ্যে সরযূ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। পিতার বিলীয়মান জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য সে যে তাহার কতখানি জীবনীশক্তি উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহা তাহার পাণ্ডুর মুখ ও কৃশ দেহ দেখিয়া শশিনাথের বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

ধীরে ধীরে শশিনাথ হরিচরণের পার্শ্বে উপবেশন করিল। হরিচরণ তখন আসন্ন মহানিদ্রার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন। বিলুপ্তপ্রায় চৈতন্যকে জড়তা তখন ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছিল। সোমনাথ হরিচরণের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "কাকা, শশি এসেছে।"

দুই-তিনবার বলার পর হরিচরণ ব্যগ্রভাবে চক্ষু উন্মীলন করিলেন, "কই—কই ?"

হরিচরণের এক হস্ত নিজ হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিয়া শশিনাথ কহিল, "এই যে, আমি আপনার কাছে রয়েছি।"

"সর—সরযূ ?"

শশিনাথ কহিল, "সরযূ আপনার ও-পাশে রয়েছে।"

ক্ষীণ-কম্পিত-হস্তে সরযূর দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া শশিনাথ ও সরযূর হস্ত আপনার বক্ষের উপর স্থাপিত করিয়া শশিনাথের দিকে অবসন্ন-চক্ষে চাহিয়া হরিচরণ কহিলেন, "বল ?"

অবনত হইয়া শশিনাথ কহিল, "কি বলব বলুন ?"

গতপ্রায় চৈতন্য ও শক্তি কোন প্রকারে একবার সঞ্চিত করিয়া হরিচরণ

শশিনাথের মুখের উপর স্থির ও দৃঢ় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "বল, গ্রহণ করলে ?"

মুহূর্তমাত্র চিন্তা করিয়া শশিনাথ কহিল, "সরযুর সব ভার আমি নিলাম, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।"

শশিনাথ কি উত্তর দেয় তাহা শুনিবার জন্য কক্ষস্থ সকলেই উৎকর্ণ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। কিন্তু শশিনাথের উত্তরের উপর যাহার আর কিছুমাত্র লাভ-লোকসান ভাল-মন্দ নির্ভর করিবার কথা নহে, সকলের আগ্রহকে অতিক্রম করিয়া সে কেন নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে এবং অপলক-নেত্রে শশিনাথের দিকে চাহিয়া ছিল, এবং শশিনাথের উত্তর শুনিয়া তাহার রক্তোচ্ছ্বাসিত মুখ মুহূর্তের মধ্যে সীসার মত কঠিন ও ফিকা কেন হইয়া গেল, সে রহস্য কম কৌতুকপ্রদ নহে। অভিমান ও অপমান পীড়িত হৃদয়ের মধ্যে লীলা একবিন্দুও আশা ধরিয়া রাখে নাই, ঈর্ষা অথবা দ্বেষেরও কোন কথা তথায় ছিল না,—যে ক্ষতি পূর্বেই হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিমাণ আর একটুও বাড়িল না,—অথচ মৃত্যু-শয্যার উপর শশিনাথের এই প্রতিশ্রুতিতে কোনো অজ্ঞাত অনির্দেশ্য স্থান আহত হইয়া আজ তাহার যেমন বেদনা বাজিল, ইতিপূর্বে সর্বহারা হইয়াও যেন কোন দিন তেমন বাজে নাই। নিজ অধিকার হইতে যাহা বাহির হইয়া গিয়াছে, অপরের অধিকারে তাহাকে আসিতে দেখিয়া যে সূক্ষ্মাবশিষ্ট অধিকারবোধ পুনর্বার এমন ভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তাহা এতদিন কোন্ ছলে হৃদয়ের মধ্যে টিকিয়া ছিল, ইহা মনস্তত্ত্বের একটি নিগূঢ় রহস্য।

শশিনাথের আশ্বাসে মৃত্যু-আহত রোগীর নিষ্প্রভ নেত্র মুহূর্তের জন্য দীপ্ত হইয়া উঠিল। শক্তিহীন বিবর্ণ ওষ্ঠাধর মৃদুভাবে কম্পিত হইয়া অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইল। বাক্য বুঝা গেল না, কিন্তু তাহা যে মুমূর্ষুর স্তব্ধতায় হৃদয়ের উপর মিলিত দুইটি প্রাণীর প্রতি ঐকান্তিক আশীর্বচন, তাহা সকলেই বুঝিল।

রাত্রি তিনটার মধ্যে কয়েকবার ডাক্তারও আসিল, এবং কয়েকবার হরিচরণকে ঔষধ খাওয়ানোও হইল, কিন্তু শশিনাথের মুখের উপর একবার

সকৃতজ্ঞ আনন্দ-দীপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরিচরণ সেই যে চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন, তাহা আর কিছুতেই উন্মীলিত হয় নাই—উত্তেজক ঔষধের ক্রিয়াতেও নহে এবং কন্যা সরযুর কাতর আহ্বানেও নহে। সংসারের সুখদুঃখ-জটিলতা সমস্যার বন্ধন ছিন্ন করিয়া হরিচরণের বিক্ষুব্ধ আত্মা যখন রোগজীর্ণ দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিল, তখন সরযু ইহজগতের একমাত্র আশ্রয় বিগতপ্রাণ পিতার পদদ্বয় সবলে চাপিয়া ধরিয়া পিতারই মত মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। শশিনাথ মৃতের শিয়রে বসিয়া উদাস অপলক নেত্রে তাহার সম্মুখস্থিত জীবিত ও মৃতের এই অনির্বচনীয় চিত্র দেখিতেছিল। অদূরে ভূমির উপর বসিয়া উর্মিলা ও লীলা অশ্রুপাত করিতেছিল ; এবং সোমনাথ শূন্য-বিহঙ্গ পিঞ্জরের শেষ ব্যবস্থা করিবার জন্য নীচে নামিয়া গিয়াছিল।

২০

সাত দিন হইল হরিচরণের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ কয়েক দিন সরযু জগৎ সুরের লেনের বাটিতে রহিয়াছে। জীবনের শেষ দিনগুলি যে গৃহে পিতা যাপন করিয়াছেন, মৃত্যুর পরে শুধু স্মৃতি ছাড়া সে গৃহে পিতার আরও যে কিছু অবশিষ্ট ছিল না, তাহা সরযুর ব্যথিত-বিহ্বল হৃদয় কিছুতেই মানিতে চাহিতেছিল না। এই গৃহে সে তাঁহাকে অন্তিমশয্যায় সেবা করিয়াছে, এই গৃহে সে তাঁহার নিকট হইতে শেষ আশীর্বচন লাভ করিয়াছে, তাই শ্রাদ্ধের পরই সহসা এ গৃহ ছাড়িয়া যাইতে তাহার প্রাণ চাহিতেছিল না।

সরযুর অন্তরের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া শশিনাথ সরযুর সে ইচ্ছায় বাধা দেয় নাই। সঙ্গিনীস্বরূপ লীলা কয়েকদিন এই গৃহে বাস করিতেছে, এবং তরুণীদ্বয়ের রক্ষক হইয়া রাত্রে শশিনাথ পার্শ্বের ঘরে শয়ন করে।

বেলা তিনটা, স্কুলের ছুটি হইয়া গিয়াছে—এক দল ছেলে সার বাঁধিয়া স্কুল

হইতে গলির পথে গৃহে ফিরিতেছে। সরযূ ও লীলা জানালার নিকট বসিয়া তাহাদের উদ্দাম আবাধ গতি নিরীক্ষণ করিতেছে ও গল্প করিতেছে।

লীলা কহিল, "আমার বিশ্বাস সরযূ, তোমার দুঃখের পালা ভগবান আগেই সেরে দিচ্ছেন। সুখের দিন তোমার শীঘ্রই আসবে।"

গলির পথে দৃষ্টি-নিবদ্ধ রাখিয়াই সরযূ কহিল, "কি জানি ভাই, সে ভরসা তো আমার একটুও হয় না। কত রকমের দুঃখ আর দণ্ড আমাকে এরই মধ্যে ভোগ করতে হয়েছে—তা তুমি একটু একটু জেনেছ। শেষ আশ্রয় আর অবলম্বন ছিলেন বাবা। তাও তো আমার দুরদৃষ্টে সইল না।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া লীলা বলিল, "কাকা তোমাকে নিরাশ্রয় ক'রে যান নি সরযূ। আশ্রয় ভাঙবার ঠিক আগেই তিনি তোমার আশ্রয় গড়ে দিয়ে গেছেন।" তাহার পর সরযূকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই বলিল, "তুমি ছেলেবেলায় শিবপূজো করেছিলে সরযূ?"

একটু বিস্মিত হইয়া সরযূ লীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "না। কেন ভাই?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া লীলা কহিল, "আর কোনো ব্রত পূজা, যাতে—" সহসা মনের মধ্যে চমকিত হইয়া লীলা একেবারে থামিয়া গেল। তাহার মনের নিগূঢ় ব্যথা কোন সময়ে অলক্ষিতে মুখের কথায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই—যখন বুঝিতে পারিল, তখন দ্রুতগামী ঘোড়া যেমন সহসা পর্বত প্রান্তে খাদের সম্মুখে আসিয়া একেবারে দাঁড়াইয়া পড়ে, তেমনি কথাটা একেবারে খুলিয়া বলিবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই সে সহসা থামিয়া গেল।

কথাটা অর্ধে'ক বলা হইলেও সরযূ অর্ধে'কের অধিকই বুঝিতে পারিল, কিন্তু তথাপি লীলার অসমাপ্ত বাক্য অনুবৃত্তি করিয়া কহিল, "যাতে কি হয় লীলা?"

কথাটাকে শেষ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া লীলা ঈষৎ আরক্ত মুখে বলিল, "যাতে শশিদাদা তোমার স্বামী হ'তে পারেন?"

লীলার মুখের সরক্ত ক্ষীণ হাস্যটুকুই সরযূ লক্ষ্য করিল, চোখের কোণের অতি সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি তাহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িল না। কহিল, "এ জন্মে তো কিছু করি নি ভাই, পূর্বজন্মে যদি কিছু ক'রে থাকি।"

অনবধানতার ফলে লীলার প্রণয়-বঞ্চিত মনে অল্পক্ষণের জন্য যে দুর্বলতা আসিয়াছিল, কষ্টসঞ্চিত শক্তির সাহায্যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া লীলা নিজেকে সহজ করিয়া লইল। কহিল, "এ জন্মে যদি না করে থাক, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো পূর্বজন্মের তোমার অনেক পুণ্য ছিল—তা না হ'লে এমন কখনও হ'তে পারে না। শশিদার আশ্রয়ে তোমার সব দুঃখ শেষ হবে সরযূ।"

এই দৃঢ় ও উদার আশ্বাসের স্নিগ্ধতায় সরযূ তাহার অশান্ত-বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের মধ্যে একটু শান্তি পাইল। তাহার মনে হইল, একমাত্র অবলম্বন হইতে রিক্ত হইয়াও সে বোধ হয় একবারে নিরাশ্রয় হয় নাই। কিন্তু আলোর পাশে ছায়ার মত আশ্বাসের পাশেই সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা যে এই প্রথম আসিল, তাহা নয়। হরিচরণের মৃত্যুর পর হইতে যখনই সরযূ নিজের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়াছে, তখনই তাহার ভবিষ্যতের আশ্রয় শশিনাথের কথা মনে পড়িয়াছে, কিন্তু প্রতিবারই সংশয় তাহার আশ্বাসের মূলে আঘাত করিয়াছে। শশিনাথ যদি সাধারণ লোকের মত দোষে-গুণে অতুর্লভ হইত, এবং সরযূর ভাগ্য যদি সাধারণ ভাগ্যের মত সুখ-দুঃখে সহজ হইত, তাহা হইলে, এ তীব্র সংশয়ের কোন কথা থাকিত না। তাই লীলার আশ্বাস-বচনের উত্তরে সরযূ বলিল, "ভয় হয় ভাই, কপাল আমায় এত মন্দ যে, এতটা সুখ আমার ভাগ্যে সম্ভব ব'লে মনে হয় না। তোমার শশিদাদা মানুষ তো নন লীলা, তিনি দেবতা। আমি এমন কি করেছি ভাই যে, তাঁর পায়ে চিরদিনের মত আশ্রয় পাব?"

"তাঁর নিজের দয়ায় পাবে। তিনি করুণা ক'রে তোমাকে আশ্রয় দেবেন। তুমি তাঁকে খুব বেশি না জেনেও ঠিক বলেছ সরযূ, তিনি দেবতার মত দয়ালু। ঠিক বলেছ তুমি, বাস্তবিকই তিনি মানুষ নন। তিনি মানুষের

অনেক ওপরে—মানুষের সঙ্গে তার দেওয়া-নেওয়ার কারবার নেই, তিনি শুধু দিতেই জানেন, নিতে তিনি কিছু চান না।"

হায়, বিচিত্র মানব-হৃদয়! শরৎকালের আকাশের মত তুমিও সর্বদাই পরিবর্তনশীল। কিন্তু আকাশে শুধু মেঘ-রৌদ্রের খেলার মত তুমি কেবল হাসি-কান্নার খেলাতেই বিচিত্র নও—তোমার বৈচিত্র্য বহুল। একটু পূর্বে শশিনাথের প্রসঙ্গে যখন লীলা শিব-পূজার কথা তুলিয়াছিল, তখন তাহার হৃদয়-নভে দুঃখের আর্দ্র ও করুণ মেঘ তাহাকে বিমর্ষ ও ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সরযূ শশিনাথকে দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন হৃদয়-আকাশ আর দুঃখে অবসাদে উদাস রহিল না, নিমেষের মধ্যে বেদনার মেঘে অভিমানের বিদ্যুৎ ঝলসিয়া সংযমকে বিদীর্ণ করিয়া দিল।

লীলা বলিল, "কিন্তু এ কথাও ঠিক ভাই, চাইতে তাঁকে কিছু হয় না—না চাইতেই তিনি সব পান। এই যে তোমার ভালবাসা, যেটা নিতান্ত সামান্য জিনিস নয়, সেটা কি তিনি চেয়ে পেয়েছেন? না চেয়েই তা পেয়েছেন।"

ভালবাসার কথায় সরযূর মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং তাহার শোক-পাংশু অধর-কোণে অতি মৃদু হাস্য দিগন্তে দিনান্ত-ক্ষীণ বিদ্যুতের মত মুহূর্তের জন্য ঝলকিয়া উঠিল।

"ভালবাসার কথা বলতে পারি নে ভাই, কিন্তু আমার ভক্তিটি তো তিনি অমনি পান নি। প্রথমে তাঁরই কাছ থেকে অনেক দয়া পেয়েছি, তারপর তিনি আমার ভক্তি পেয়েছেন।"

লীলা হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে আমি যা বলছিলাম তাই ঠিক কিনা? না চাইতেই তিনি দিয়েছেন, আর না চেয়েই তিনি পেয়েছেন। এ ছাড়া আর দেবতা কাকে বলে ভাই?"

মৃদু হাসিয়া সরযূ কহিল, "তোমার শশিদাকে দেবতা বলতে তোমার কোন দ্বিধা আছে কি লীলা?"

হাস্য-মুখে লীলা কহিল, "কিছু না। কিন্তু একটা কথা বলবে সরযূ? তোমার এই দেবতাটিকে তুমি শুধু ভক্তিই কর, না, ভালও বাস?"

একটু চিন্তা করিয়া সরযূ কহিল, "দুয়ে কি বিশেষ তফাত আছে?"

"বিশেষ না হ'লেও একটু যে তফাত আছে, আমি তারই কথা জিজ্ঞাসা করছি। ভক্তির পাশে ভালবাসা কবে এসে জুটল?"

মৃদু হাসিয়া সরযূ কহিল, "জুটেছে যে তাই কি ক'রে জানলে?"

"তুমি বললেই জানব।"

কিছুক্ষণ হইতে লীলার কথোপকথনের ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া সরযূ মনে মনে ঈষৎ কৌতূহল বোধ করিতেছিল, এখন তাহার একটা সম্ভবপর অর্থ সহসা তাহার মনে উদয় হওয়াতে তাহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং তদুদ্দেশ্যে সঙ্গতি-অসঙ্গতির কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া লীলাকে একেবারে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আচ্ছা লীলা, তোমার শশিদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত, না?"

সরযূর এই উদ্ভট ও আকস্মিক প্রশ্নে লীলা প্রথমে ঈষৎ বিহ্বল হইয়া গেল; কিন্তু তখনই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, "ছি ভাই, ভাইয়ের সঙ্গে বোনের কি বিয়ে হয়!" তারপর ক্ষণমাত্র নীরব থাকিয়া ঈষৎ গাঢ়স্বরে কহিল, "তা ছাড়া সরযূ, একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে স্থির হ'য়ে গিয়েছে—এখন এ সব কথা বলতে নেই ভাই।"

সরযূর মনে যেমন সহসা সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, লীলার এ কথায় তেমনি তৎক্ষণাৎ তাহা অপসৃত হইয়া গেল; এবং লীলার মৃদু ভর্ৎসনায় সে একটু লজ্জিত হইয়া একেবারে অন্য কথার অবতারণা করিল, "সুধীর-বাবুকে তুমি দেখেছ লীলা?"

"দেখেছি।"

"শুনেছি, রূপে গুণে ধনে সব বিষয়ে তিনি সমান।"

"আমিও তাই শুনেছি।"

"তিনি তোমাকে প্রথম দিন দেখে, শুনলাম, মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন ?"

"আমিও সেই রকম শুনেছি।"

"আচ্ছা লীলা ?"

সরযূর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া লীলা কহিল, "কি ?"

"তোমার মনটা ভাই কোথায় থাকে, কিছুতেই তার নাগাল পাব না কি ?"

সরযূর কথা শুনিয়া লীলা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "আমার মনের নাগাল পাবার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত ? আচ্ছা, তোমার কি আন্দাজ সরযূ, আমার মন কোথায় থাকে ?"

"সেটা আমি আন্দাজও করতে পারি নে—একবার যা মনে করি, পর মুহূর্তেই তা ভুল ব'লে মনে হয়।"

"কিন্তু তোমার মনের সন্ধান আমি ঠিক জানি—আন্দাজ নয়, একেবারে ঠিক কথা। বলব কোথায় থাকে ?"

একটু দ্বিধাভরে সরযূ বলিল, "বল।"

নীচে শশিনাথের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া সরযূ ও লীলার আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল। শশিনাথ উপরে আসিয়া উভয়কে জানাইল, পরদিন প্রাতে বাসা উঠাইয়া বাড়ি যাইতে হইবে। এ সংবাদে লীলা বিশেষ খুশি হইল—এই পৃথক বাস তাহার ক্রমশ বিরক্তিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। সরযূ কিন্তু আরও কয়েকদিন থাকিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল।

হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "কয়েকদিন কেন ? তোমার যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারতে, কিন্তু বাবার এক বন্ধু সপরিবারে এখানে আসছেন মেয়ের বিয়ে দিতে। তাঁরা কাল বিকেলে পৌঁছবেন—কাজেই কাল সকালে যেতে হয়। তা ছাড়া সব চেয়ে মুশকিল হয়েছে বউদিদিকে নিয়ে। তিনি তোমাদের দুজনের জন্য এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত থাকেন না, আর আমাকে এমনভাবে তাগিদ করেন, যেন আমিই তোমাদের এখানে আটকে রেখেছি।"

অতঃপর সরযূ আর কোন আপত্তি করিল না, এবং স্থির হইয়া গেল পরদিন প্রাতে সকলে দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া বাড়ি যাইবে।

শশিনাথের জন্য চা প্রস্তুত করিবার নাম করিয়া লীলা উঠিয়া গেল।

শশিনাথের সহিত একা এক ঘরে বসিয়া থাকিতে সরযূর মনে আজ ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। শশিনাথের প্রতি তাহার যে প্রেম পিতার মৃত্যুশোকে এ কয়েকদিন বিষাদের ঘন অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আজ লীলার সহিত কথোপকথনের পর বর্ষাদিনান্তের মেঘ-নির্মুক্ত সূর্যকিরণের মত তাহা পুনরায় স্নিগ্ধ-সজল মাধুর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই অশ্রু-বিধৌত প্রেমের অচপল আনন্দে সে হৃদয়ের মধ্যে এক সকুণ্ঠ কিন্তু সুমিষ্ট তৃপ্তিরস আস্বাদন করিতে লাগিল।

শশিনাথ কহিল, "লীলার ঘরের পাশের ঘরটি তোমার জন্যে বউদিদি আজ সমস্ত দিন ধ'রে সাজাচ্ছেন। তোমার পড়বার জন্যে রামায়ণ মহা ভারত থেকে আরম্ভ করে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত কুড়ি- পঁচিশখানা বই কিনে আনিয়াছেন। তোমার সেখানে কোন্ অসুবিধা হবে না সরযূ।"

উপস্থিত অবস্থায় শশিনাথদেরই গৃহে বাস করা বিচার-বিবেচনার উচিত বোধ হইলেও কয়েকদিন হইতে সরযূ হৃদয়ের মধ্যে তাহা ঠিক পছন্দ করিতেছিল না। কলিকাতায় স্বতন্ত্র গৃহে অথবা বিলাসপুরের বাটিতে একাকী বাস করার মধ্যে কোনটাই যুক্তিযুক্ত মনে না হইলেও শশিনাথ-দের গহে বাস করা তাহার হৃদয়ের কোন অতিসূক্ষ্ম অনির্ণীত চেতনায় ঈষৎ বাধিতেছিল।

তাই শশিনাথের কথার উত্তরে সে কহিল, "আপনাদের ওখানে গিয়ে আমার কোন অসুবিধা হবে না তা জানি, কিন্তু আমিই সকলকে বিব্রত করব। তার চেয়ে আমি কিছুদিনের জন্য বিলাসপুরে—" সরযূর মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না।"

শশিনাথের মুখে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "কিন্তু তাতে যদি আমরা আরও বিব্রত মনে করি? কিসে আমরা বেশি বিব্রত হব সেটা তোমার

চেয়ে আমরা বেশি বুঝি নে কি? তা ছাড়া, শুধু আমাদের বিব্রত হবার কথাই এর মধ্যে নেই। তুমি কোথায় বেশি বিব্রত হবে? একা বিলাসপুরে, না, লীলা আর বউদিদির কাছে আমাদের বাড়িতে?"

এই স্পষ্ট এবং প্রবল কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া সরযূ চুপ করিয়া রহিল। তাহার অতিসূক্ষ্ম আত্মমর্যাদার জ্ঞান শশিনাথের সরল অথচ সবল আত্মীয়তার বর্ম ভেদ করিবার প্রবেশ পথ পাইল না।

তাহার মনের প্রকৃত কথাটি অনুমান করিয়া শশিনাথ কহিল, "কাকার কাছ থেকে আমি যে অধিকার পেয়েছি, সে কি ভুলে গেছ সরযূ? এখন এ পৃথিবীর মধ্যে তোমার ওপর আমার অধিকার সকলের চেয়ে বেশি; আমার সেই অধিকার খাটাতে তুমি যদি বাধা দাও, তাহ'লে বুঝব আমার অধিকার তুমি অস্বীকার করতে চাও। তুমি নিজের বিষয়ে সব রকম ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে আমার ওপর একান্ত নিশ্চিন্তভাবে সব ছেড়ে দাও। আমি তোমার যা ব্যবস্থা করব, তাতে তোমার নিজের কাছে বা জগতের আর কারও কাছে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবার কারণ হবে না।"

এ কথার পর মনের মধ্যে আর কিছুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না রাখিয়া সরযূ শশিনাথের গৃহে যাওয়াই স্থির করিল; এবং অন্যত্র বাসের প্রস্তাব করিয়া শশিনাথের সহিত যে অনাত্মীয়ের মত আচরণ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া কহিল, "আমি নিজের বিবেচনা আর কোন বিষয়ে খাটাব না—আপনি যা করবেন তাই হবে। আপনাদের বাড়িই যাব।"

"শুধু আমাদের বাড়ি কেন সরযূ, সে তো তোমারও বাড়ি। তুমি নিজের বাড়িই যাবে।"

এ কথার দ্বারা যে শশিনাথ তাহাদের আসন্ন মিলনের আভাসই ব্যক্ত করিল, তাহা মনে করিয়া সরযূ আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, শশিনাথ যেন, শুধু তাহার বাড়িতেই নহে, তাহার উদার উন্মুক্ত হৃদয়ের শান্ত আশ্রয়ে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। বলিতেছে, ওরে আমার ক্লান্ত ঝঞ্ঝাক্লিষ্ট

বিহঙ্গ, আমার হৃদয়ের নিভৃত-প্রদেশে তুমি একান্ত নির্ভরতায় বাসা বাঁধ। তুমি আমার একান্ত আপনার—এস, অসঙ্কোচে এস। এক অনির্বচনীয় মধুরতায় সরযূর অন্তর সিক্ত হইয়া গেল, কিন্তু মুখে তাহার কোনও কথা বাহির হইল না।

সরযূকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া শশিনাথ কহিল, "তাতে কি তোমার সন্দেহ আছে সরযু?"

"কিসে?"

"আমাদের বাড়ি যে তোমার নিজেরই বাড়ি, তাতে?"

"একটুও না।"

সন্তুষ্ট হইয়া শশিনাথ কহিল, "তবে শুধু আমার কথায় নয়—তুমি তোমার নিজের বিবেচনায় কাল আমাদের বাড়ি যাবে।"

চা লইয়া লীলা প্রবেশ করিল। তাহার হস্ত হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া শশিনাথ কহিল, "নীচে রাজমিস্ত্রি এসেছে—আমি গিয়ে তাকে বাড়িটা চুনকাম করবার কথা বলিগে—তোমরাও ততক্ষণে কিছু কিছু জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও।" বলিয়া শশিনাথ নামিয়া গেল।

ক্ষণকাল চিন্তাবিষ্ট থাকিয়া সরযূ ডাকিল, "লীলা!"

"কি ভাই?"

"তোমার শশিদাদা বাস্তবিকই দেবতা।"

"মানুষ নন?"

"না।"

"অমানুষ?"

লীলার কথায় মনে মনে বিরক্ত হইয়া সরযূ কহিল, "ছি ভাই! তাঁর সম্বন্ধে ও কথা মুখে আনলেও পাপ হয়।"

লীলা কোন উত্তর না দিয়া শুধু মৃদু হাস্য করিল। যে কথা দিবারাত্র তাহার মনের মধ্যে জাগ্রত রহিয়াছে, তাহা একবার মুখে আনিলেই কি পাপ

হয়? এ কথা তো সে তাহার জীবনের সমস্ত সুখ-সৌভাগ্যের বিনিময়ে বুঝিয়াছে যে, শশিনাথকে দেবতাও বলা চলে, অমানুষও বলা চলে, শুধু মানুষ বলাই চলে না। জীবনের মধ্যে সে যে ইহার মত ধ্রুব এবং নির্মম সত্য আর দ্বিতীয় অবগত নহে।

২১

মাঘ মাসের অপরাহ্ণ। শশিনাথদের গৃহে রাস্তার ধারে ফটকের উপর সানাইয়ের মঞ্চ হইতে করুণ ও মধুর মালবী রাগিণীর স্বর-লহরী নিপুণ যন্ত্রীর অঙ্গুলিচালনায় নির্গত হইয়া সমগ্র পল্লীকে অলস আনন্দধারায় সিক্ত করিতেছিল। মধ্যাহ্নে লীলার গাত্র-হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে, এবং কিছু পূর্বে সুধীরের গৃহ হইতে গাত্র-হরিদ্রার তত্ত্ব আসিয়াছে।

উর্মিলা আজ উৎসব-লক্ষ্মীর মত চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিল। হৃদয়ের অনাবিল আনন্দের শান্ত তৃপ্তিটুকু তাহার চক্ষের দীপ্তি এবং মুখের মৃদু-মধুর হাস্যে প্রকট হইয়াছিল, এবং তাহার অমল মূর্তিখানি যাহারই চক্ষে প্রতিভাত হইতেছিল, তাহারই হৃদয়ে আনন্দের দীপশিখাটুকু নব-স্নেহ-নিষিক্ত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

একটা পরামর্শের জন্য শশিনাথ উর্মিলাকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল। অবশেষে যখন তাহাকে আবিষ্কার করিল, তখন উর্মিলা কুটুম্ব-গৃহ হইতে আগত ব্যক্তিদের আহারের ব্যবস্থায় রন্ধনশালায় ব্যস্ত। নিরলস পরিশ্রমে শীতের দিনেও তাহার মুখে স্বেদবিন্দুজল ভরিয়া গিয়াছিল, এবং স্বেদসিক্ত অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্য, বর্ষণবিধৌত দিনান্তরম্য সূর্যরশ্মির মত শান্ত-ধারায় ক্ষরিত হইতেছিল।

হাস্যমুখে শশিনাথ কহিল, "এ আন্দাজ আজ কোথায় থাকত বউদি, যদি তোমার একগুঁয়েমিকে প্রশ্রয় দিতাম ?"

অঞ্চলে মুখ মুছিয়া স্মিতমুখে ঊর্মিলা বলিল, "এ আনন্দ ঠিক এই রকমই থাকত তবে ফাল্গুন মাসের আনন্দটা বাদ পড়ত। তা যা হয়েছে, ভালই হয়েছে ঠাকুরপো—আমার আর কোন দুঃখ নেই। সরযূকে পেয়ে আমি বুঝেছি যে, আমরা যখন দুর্ভাবনায় আকুল হয়েছিলাম, ভগবান তখন মঙ্গল করতেই ব্যস্ত ছিলেন। সরযূ মেয়েটি—ঠাকুরপো, একটি অদ্ভুত জিনিস। একেবারে আসল হীরে, যত মাজবে ঘষবে তত চকচকে হবে—কোনখানে একটুও ময়লা নেই। তোমার ভাগ্য ভাল ঠাকুরপো।"

হরিচরণের মৃত্যুশয্যায় শশিনাথের প্রতিশ্রুতি যাহারা শুনিয়াছিল, তাহারা সকলেই বুঝিয়াছিল, শশিনাথ সরযূকে বিবাহ করিবে বলিয়াই অঙ্গীকার করিল, এবং সে অঙ্গীকার যে কিছুতেই স্খলিত হইবে না, শশিনাথের চরিত্র ও চিত্তের দৃঢ়তার সহিত যাহাদের পরিচয় ছিল, তাহারা তাহাও বুঝিয়াছিল। নানা প্রকার উপরোধ অনুরোধ চেষ্টা ও কৌশলে যে অঘটন ঘটাইতে ঊর্মিলা ও সোমনাথ সক্ষম হয় নাই, হরিচরণের মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া নিয়তি কত অবলীলাক্রমে তাহা ঘটাইল দেখিয়া ঊর্মিলা ও সোমনাথ যেমন বিস্মিত, তেমনি আনন্দিত হইয়াছিল, এবং সংসারের এই মঙ্গল-বিধানের জন্য কতবার যে তাহারা ভগবৎ-চরণে তাহাদের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিল, তাহার সংখ্যা ছিল না। শশিনাথই শুধু জানিত, সেদিনকার তাহার মুখের কথা ও মনের অভিপ্রায়ের একটা ব্যবধানের প্রাচীর ছিল। মুমূর্ষু হরিচরণ যখন শশিনাথের ও সরযূর হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'বল, গ্রহণ করলে ?' তখন শশিনাথের এ কথা বুঝিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় নাই যে, সরযূকে বিবাহ করিতেই তিনি অনুরোধ করিতেছেন, এবং প্রত্যুত্তরে সে যখন বলিয়াছিল, "সরযূর সব ভার আমি নিলাম, আপনি নিশ্চিন্ত হোন", তখন হরিচরণের হর্ষোদ্দীপ্ত নেত্র দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া-ছিল. সে সরযূকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল ভাবিয়াই হরিচরণ নিশ্চিন্ত

হইলেন। অথচ শশিনাথ তখন আপনার মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানিত, সরযূকে সে বিবাহ করিবে না, বরেনের কথা তাহার মন হইতে সে সময়ে মুহূর্তের জন্যও লুপ্ত হয় নাই।

কপটতা বল, ছলনা বল বা অন্য যে কোন নামই দাও না কেন, হৃদয়ের এই দুর্বলতাটুকুকে সে সময়ে প্রশ্রয় দিতে শশিনাথ দ্বিধা করে নাই। প্রকৃতপক্ষে যাহা ঠিক সত্য নহে, সে কথা বলিবে কি না, তাহা শশিনাথ মুহূর্তের জন্য ভাবিয়াছিল বটে—কিন্তু সে নিতান্ত মুহূর্তের জন্য। কঠোর সত্যের নিষ্ঠুর নিষ্ঠা রাখিতে গিয়া মুমূর্ষুর চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ের শেষ সকরুণ তৃপ্তিটুকু অপহরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই—এ বিষয়ে তাহার সত্যের মর্যাদাজ্ঞান মহাভারতের যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম না করিয়া অনুসরণই করিয়াছিল।

কিন্তু শুধু মরণাপন্নেরই সান্ত্বনার জন্য মিথ্যার যে অংশটুকু শশিনাথ পরিহার করিতে পারে নাই, কোনও জীবিত ব্যক্তির চিত্তে মিথ্যার সেই বীজকণাটি বাঁচাইয়া রাখিবার বা বাক্যের সলিলে বা ব্যবহারের সারে তাহাকে ক্রমশ অঙ্কুরিত ও বর্ধিত করিয়া তুলিবার তাহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। তাই ঊর্মিলার পরিহাসবচনের প্রত্যুত্তরে শশিনাথ কহিল, "আমার ভাগ্য নিশ্চয়ই ভাল বউদিদি, তোমাকে যখন প্রসন্ন করতে পেরেছি। ফাল্গুন মাসেও তোমাকে ঠিক এই রকম প্রসন্ন করতে পারব, কারণ সৎপাত্রের ভাণ্ডার আমার ফুরিয়ে যায় নি। কিন্তু সে সব পরের কথা পরে হবে, উপস্থিত তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। তোমরা যে ব্যবস্থা করেছ—পুরুত লীলাকে দান করবে, তা আমার একটুও ভাল বোধ হচ্ছে না। বাড়ির লোক থাকতে পুরুতে দান করবে কেন?"

ঊর্মিলা কহিল, "কে করবে বল? তোমার দাদার যে শরীর, তিনি তো পারবেন না।"

"কেন, আমি করব।"

"তুমি?" শশিনাথের এই অতি সহজ কয়েকটি কথা তীক্ষ্ণ শরের মত

উর্মিলার হৃদয়ে অকস্মাৎ নিষ্ঠুরভাবে বিদ্ধ হইল। "না ঠাকুরপো, তোমার দান করা ভাল দেখায় না। আর যে কেউ করে করবে, তুমি না।"

শশিনাথের প্রস্তাবের মধ্যে অদৃষ্টের এক সকরুণ পরিহাস উপলব্ধি করিয়া উর্মিলা ব্যথিত হইল। সময়ে সকল দুঃখ অপসৃত হইয়া যাইবে, মনের মধ্যে সে বিশ্বাস থাকিলেও উর্মিলা নিঃসংশয়ে জানিত তখন পর্যন্ত যে লীলা মুখে নির্বাক ও আচরণে স্তব্ধ হইয়া ছিল, তাহা শুধু দুর্নিবার অভিমানের উত্তেজনায়, অদৃষ্টের সহিত একটা অবস্থানুযায়ী মিটমাট করিয়া লইয়া নহে। শশিনাথ দান করিলে সে ঘটনা লীলার কঠোর আত্মোৎসর্গ-ব্রতের কি ভীষণ দক্ষিণান্ত হইবে তাহা উপলব্ধি করিয়া উর্মিলা প্রবলভাবে শশিনাথের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল।

উর্মিলার কথার ভঙ্গীতে তাহার প্রতিবাদের মর্ম বুঝিতে পারিয়া শশিনাথ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তা হ'লে তুমি দান কর না?"

উর্মিলা কহিল, "শাস্ত্র কি, তা তোমরা জান, আমার মনে হয়, দান করার অধিকার আমার নেই।"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "না থাকলে, কিনে নিলেই তো হবে। পয়সা দিলে তোমাদের শাস্ত্রে সবই তো কিনতে পাওয়া যায়।"

এ প্রসঙ্গের একটা কোনও মীমাংসা হইবার পূর্বেই ভৃত্য কালীচরণ আসিয়া শশিনাথকে এমন একটা জরুরী সংবাদ দিল যে, কথাটা সেইখানেই অসমাপ্ত রাখিয়া শশিনাথকে বহির্বাটিতে যাইতে হইল।

রন্ধন-শালা পরিত্যাগ করিয়া উর্মিলা লীলার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বার ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ।

উর্মিলার কণ্ঠের স্বর পাইয়া ঘরের ভিতর হইতে সুবাসিনী কহিল, "দরকার আছে বউদি, দোর খুলে দোব?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া উর্মিলা কহিল, "না। থাক্, একটু পরে আসব।" বলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

সুবাসিনী ছাড়া সে ঘরে তখন আরও দুইটি প্রাণী ছিল—লীলা এবং সরযূ। সুবাসিনী একটি রেশমী রুমালের এক কোণে রেশমের সুতা দিয়া পত্রে পুষ্পে জড়িত করিয়া লীলা ও সুধীরের যুক্ত-নাম বুনিয়া তুলিতেছিল, অন্যান্য উপহারের মধ্যে এটিও সে কাল লীলাকে উপহার দিবে। সরযূ একটা গদি-আঁটা নীচু চেয়ারে বসিয়া সুবাসিনীর শিল্প-নৈপুণ্য দেখিতেছিল। নিপুণ অঙ্গুলির তাড়নায় যন্ত্রের মত সূচিকা বিঁধিয়া বিঁধিয়া নিমেষের মধ্যে পত্রের অংশ, নীল পুষ্পের পাপড়ি এবং লাল অক্ষরের দেহ অবলীলাক্রমে ফুটাইয়া তুলিতেছিল।

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লীলা এই বিষদগ্ধ নেত্রনিপীড়ক দৃশ্য হইতে নিজের চক্ষুকে কোন প্রকারে রক্ষা করিতেছিল, কিন্তু পরিহাস-রসিকতার আকারে সুবাসিনীর মুখ হইতে নির্গত তপ্ত তরল লৌহধারা হইতে কর্ণকে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সে নির্বাক নিরুত্তর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। সুবাসিনী তাহার এই দৃঢ় মৌনকে স্বাভাবিক লজ্জা বলিয়া মনে মনে ভুল করিয়া পরিহাসের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়াইয়া চলিতেছিল, এবং সরযূও, অন্যথা অন্যায় হইবে ভাবিয়া, যথাসাধ্য দুই-একটি অতি সহজ এবং সরল মাত্রার রসিকতা করিতে ছাড়িতেছিল না। সে ভাবিতেছিল, সুবাসিনীর সহিত রঙ্গ- রহস্যে যোগদান না করিলে, কাল এবং পাত্রের মর্যাদা রাখিয়া ঠিক চলা হইবে না।

কিন্তু বাক্যের সবগুলি বাণ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও লীলার কোন সাড়া না পাইয়া অবশেষে সুবাসিনী যখন ঈষৎ অভিমানের সুরে বলিল, "কথা কইছ না কেন লীলা? আমার উপর রাগ করেছ বুঝি?" তখন কথা কওয়া ভিন্ন লীলার আর উপায়ান্তর রহিল না।

সে তাহার দুঃখপাংশু আকৃতিকে যথাসম্ভব প্রফুল্ল করিয়া কহিল, "রাগ করব কেন সুবা'দিদি? তোমাদের আনন্দে আমার রাগ করবার কি থাকতে পারে?"

সুবাসিনী তাহার ফুল-তোলা বন্ধ করিয়া হাস্যমুখে কহিল, "কিন্তু আমাদের আনন্দে তুমি যদি যোগ না দাও, তা হ'লে আমাদের তো রাগ করবার থাকতে পারে? আমরা তো তোমার আনন্দে যোগ দিয়েছি।"

সুবাসিনীর কথায় এত দুঃখেও লীলার হাসি পাইল। কহিল, "আমার আনন্দে যদি যোগ দিতে, তা হ'লে আর এমন করে ঠাট্টা করতে না। কিন্তু তোমাদের ঠাট্টায় আমি কি ক'রে যোগ দিই? বিয়ে যে আমার!"

"হ্যাঁ ভাই, বিয়ে তোমার, বরও তোমার,—সে সব বিষয়ে আমরা ভাগ বসাতে চাই নে। কিন্তু তোমার বিয়ে বলে ঠাট্টায় যোগ দিতে কে তোমাকে বারণ করেছে—আর রাতদিন মুখ বুজে ব'সে ব'সে সুধীরবাবুর ধ্যান করতেই বা কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে?"

এমন ধরনের অনেক কথা সুবাসিনী ইতিপূর্বেই লীলাকে বলিয়াছিল, তাই এ কথায় আর 'সে নূতন করিয়া বেদনা বোধ করিল না। মুখে তাহার ম্লান হাসির অস্পষ্ট রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল, "বিয়ের পর তো আর ধ্যান করব না, তাই বিয়ের আগেই ক'রে নিচ্ছি।"

সুবাসিনী কহিল, "তোমার তো আর ধ্যান করবার দরকার নেই লীলা, তুমি তো বর পেয়েছ। লোকে ধ্যান ক'রে তারপর বর পায়—বর পেয়ে ধ্যান করে না।"

ম্লান হাসি হাসিয়া লীলা কহিল, "আমিও বর পেলে আর ধ্যান করব না। এখনো তো পাই নি।"

মৃদুস্বরে সরযু কহিল, "কাল তো পাবে।"

সুবাসিনী রুমালে পুনরায় মনঃসংযোগ করিয়া কহিল, "এত অধীর হয়ে উঠেছ?"

ফিকা হাসি হাসিয়া লীলা কহিল, "তাই তো দেখছি।"

সরযু হাসিয়া বলিল, "এই তো বেশ কথা কইছ লীলা, এতক্ষণ চুপ ক'রে কেন ছিলে ভাই?"

লীলা কহিল, "শেষ পর্যন্ত তোমাদের আনন্দে যোগ না দিয়ে থাকতে পারলাম না।"

এতক্ষণে আড্ডাটি জমিয়া আসায় সুবাসিনী মনে মনে খুশি হইয়াছিল। কিন্তু শুধু লীলার উপরই সব ভার চাপাইলে 'পাছে ব্যাপারটা অসময়ে ভাঙিয়া পড়ে, সেইজন্য সরযূর উপরেও কতকটা ভার দিবার অভিপ্রায়ে সে কহিল, "তুমি বর পেয়েছ, না, এখনও তোমার ধ্যানের পালা চলছে সরযূ?"

সুবাসিনীর প্রশ্নে সরযূর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। স্মিতমুখে সে বলিল, "ধ্যান না করলে কি বর পাওয়া যায় না সুবাদিদি?"

বিস্ময়ের ভঙ্গিতে সুবাসিনী কহিল, "তা কি ক'রে পাওয়া যাবে?"

"তা হ'লে তুমিও ধ্যান করেছিলে?"

"নিশ্চয়ই। তা নইলে বর পেলাম কেমন করে!"

সুবাসিনীর কথা শুনিয়া সরযূ হাসিতে লাগিল।

লীলা বলিল, "বেশি ধ্যান করলে আবার সময়ে সময়ে উল্টো বর পাওয়া যায় সুবাদিদি।"

সুবাসিনী হাসিয়া বলিল, "একটা যা হোক বর পেলেই হ'ল—তারপর তাকে সোজা করে নিতে আর কতক্ষণ লাগে বল? তোমার কোন ভয় নেই লীলা, সুধীর দিব্যি সোজা বর হবে,—তবে যদি উল্টো ব'লে কখনও মনে হয়, তখন আমাকে ব'লো, আমি তার তুক ব'লে দেব, উল্টো দুদিনে সোজা হয়ে যাবে।"

সরযূ হাসিয়া বলিল, "সে বিদ্যেও তোমার জানা আছে নাকি সুবাদিদি, তুক-তাকও জান? কি ক'রে উল্টোকে সোজা করতে হয়, বল না শুনি?"

সরযূর দিকে চাহিয়া হাসিয়া সুবাসিনী কহিল, "তুমি বুঝি আগে থেকেই শিখে রাখতে চাও? তা মেজদাদা যে -রকম বাঁকা, একটু সোজা করবার দরকার হ'তে পারে। তবে মন দিয়ে শোন। বাঁকা লাঠি, বাঁকা

কাঠি, এ সব সোজা করবার উপায় জান তো? যে দিকে বাঁকা, তার উল্টো দিকে আরও বেশী জোরে বেঁকিয়ে দিতে হয়। বাঁকা বর সোজা করবারও ঠিক তাই নিয়ম। সে যে-দিকে বাঁকা দেখবে—তুমি তার উল্টো দিকে আরও বেশী ক'রে বেঁকবে। সে যদি হাসে, তুমি কাঁদবে; সে যদি মুখ ভার ক'রে থাকে, তুমি হাসিমুখে ঘুরে বেড়াবে; সে যদি কথা বন্ধ করে, তুমি বাড়ির বাজে লোকদের সঙ্গে অনর্গল কথা কইবে; সে যদি বন্ধুর বাড়ি গিয়ে বসে, তুমি একেবারে সোজা বাপের বাড়ি গিয়ে উঠবে। এই রকম কিছুদিন করলেই দেখবে, উল্টো বর দিব্যি সোজা হয়েছে।"

সুবাসিনীর কথা শুনিয়া সরযূ হাসিতে হাসিতে বলিল, "সুবাদিদি এটা তোমার ঠেকে-শেখা বিদ্যে, না, পুঁথিপড়া-বিদ্যে?"

এ কথার উত্তর দিবার পূর্বেই ঘরের বাহির হইতে ঊর্মিলার আহ্বানে সুবাসিনীকে চলিয়া যাইতে হইল।

সুবাসিনী চলিয়া গেলে লীলা ডাকিল, "সরযূ!"

"কি ভ'ই?"

"তোমার বিয়ে কবে হবে?"

লজ্জিতমুখে সরযূ কহিল, "তা কি ক'রে বলব ভাই?"

"শশিদাদা কিছু বলেন নি?"

মৃদু হাস্য করিয়া ইতস্ততভাবে সরযূ কহিল, "বিশেষ কিছু নয়।"

নিরুদ্ধ- নিশ্বাসে লীলা কহিল, "তবু,—কি শুনি?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া লজ্জানত নেত্র মুহূর্তের জন্য লীলার মুখে স্থাপিত করিয়া সরযূ কহিল, "বলেছেন, তোমার বিয়ে হ'য়ে গেলে আমাকে একবার বিলাসপুরে নিয়ে যাবেন।"

"সেখান থেকে তোমার বিয়ে হবে?"

"না। সেখানে সব ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ক'রে এখানে ফিরে আসবেন।"

"এখানে এসে তোমাকে বিয়ে করবেন?"

সলজ্জ-স্মিতমুখে সরযূ কহিল, "বোধ হয়।"

"সরযূ!"

"বল।"

"পাখাটা একবার খুলে দেবে ভাই?"

"এই শীতকালে পাখা খুলবে?"

"আমার শরীরটা আজ বড় খারাপ বোধ হচ্ছে—পাখাটা খুলে দাও ভাই। বড় হাঁফ ধরেছে।"

তাড়াতাড়ি সরযূ পাখা খুলিয়া দিয়া বলিল, "বউদিদিকে ডাকব?"

বিবর্ণমুখে অতি কষ্টে কোন প্রকারে ক্ষীণ হাসি আনিয়া লীলা কহিল "না না, কাউকে ডাকতে হবে না। আমার এ রকম মাঝে মাঝে হয়।"

পাখার হাওয়ায় সুবাসিনীর প্রস্তুত রুমালখানি উড়িয়া টেবিলের উপর খুলিয়া পড়িয়া ছিল। অকস্মাৎ তাহার উপর দৃষ্টি পড়ায় লীলা দেখিল, রক্তবর্ণ রেশমি সুতায় বোনা তাহার ও সুধীরের নাম যেন কতকগুলা শোনিতরেখার ন্যায় দেখাইতেছে। তাহার মনে হইল, সে অক্ষরগুলা যেন লাল রেশমি সুতার বোনা নহে—তাহারই হৃদয়ের রক্তবিন্দুতে অঙ্কিত। সভয়ে সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

২২

সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে আপনার ঘরে একাকী বসিয়া লীলা অভিমানসমুদ্রের ফেনোচ্ছ্বাসিত প্রদেশ হইতে গভীর নিম্নতম স্তরে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছিল, যেখানে তাহার বিপুল দুঃখ, বাক্য এবং ব্যবহারের অতীত হইয়া থাকিবে কেহ জানিবে না, বুঝিবে না,—এমন সময় তাহার দ্বারে আঘাত পড়িল, "লীলা আছ?"

এই লীলা মেয়েটির প্রকৃতি কেমন, উপমা দিয়া কাহাকেও যদি বুঝাইতে হয় তো বলা যাইতে পারে, ঠিক জলের মত—স্বভাবত তেমনি শীতল, কোমল ঢলঢলে ; অভিমান বা ক্রোধের ক্রিয়ায় সে জলেরই মত, নিমেষের মধ্যে বরফের মত কঠিন কিংবা বাষ্পের মত প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। অভিমানে বরফের মত কঠিন হইলে তখন সে আসাড়, স্থির ; কিন্তু উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পের আকার ধারণ করিলেই বিপদ ; তখন সে আর কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিবে না,—টানিবে ছিঁড়িবে ভাঙিবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। যে মূহূর্তে সে নিজের অশান্ত-হৃদয়কে নিজের আয়ত্তের মধ্যে প্রায় লইয়া অসিয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে শশিনাথের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে একেবারে কঠিন হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। প্রথমে মনে করিল, দৌড়িয়া গিয়া দ্বারের অর্গলটা বন্ধ করিয়া দিবে ; কিন্তু কি ভাবিয়া তাহা করিল না। কহিল, "আছি।" কিন্তু আহবান করিল না শুধু শয্যা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার ঠেলিয়া শশিনাথ লীলার সম্মুখে আসিয়া লীলার আকৃতি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

"তোমার কি শরীর ভাল নেই লীলা ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া শুষ্কভাবে লীলা কহিল, "কেন ডাকছিলে শশিদা ?"

লীলার শরীরের বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন না তুলিয়া একটু ইতস্তত ভাবে শশিনাথ কহিল, "কাল তোমাকে এটা আমি উপহার দোব,—তোমার গলায় ঠিক হবে কি না তাই দেখতে এলাম।" বলিয়া একটা মখমলের খাপের মধ্য হইতে একটি বহুমূল্য মুক্তার কণ্ঠি বাহির করিল। ইলেকট্রিক আলোয় হীরকের বৃহৎ ধুকধুকিটা জলজল করিয়া উঠিল।

মনের মধ্যে অকস্মাৎ যে উত্তেজনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, লীলা অতি কষ্টে তাহাকে প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু এই কণ্ঠি-উপহারের সহজ ও সাধারণ ব্যাপারটা তাহার নিকট তীব্র প্ররোচনার মত বোধ হইয়া সে

একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পাংশু-বিবর্ণ মুখ নিমেষের মধ্যে কঠিন ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং নিষ্প্রভ স্তিমিত নেত্রের মধ্যে শশিনাথের কণ্ঠিরই মত দুইটি হীরক-ধুকধুকি জ্বলিয়া উঠিল।

"আমাকে আর কত রকমে অপমান করবার শখ আছে শশিদা? মিটিয়ে নাও, মিটিয়ে নাও। আর কত রকম করে শাস্তি দেবার আছে, দাও।"

মুহূর্তের মধ্যে শশিনাথের মুখে কে যেন একরাশি কালি ঢালিয়া দিল। "আমি তোমাকে অপমান করছি, তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি? আমি?" সম্মুখে খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া উত্তেজিত হইয়া কিন্তু চাপা গলায় লীলা কহিল, "হ্যাঁ, তুমি আমাকে অপমান করছ, তুমি আমাকে শাস্তি দিচ্ছ। শুনলে? এখন যাও আমি আর পারছিনে!"

পিছন ফিরিয়া শয্যার দিকে এক পদ অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তুমি কি মনে করেছ, আমি একটা কাঠের পুতুল যে, তুমি যে খানে রাখবে সেই খানেই থাকব,—যেমন সাজাবে তেমনি সাজব? আমার শরীরে কি রক্ত-মাংস নেই যে, তুমি যত আঘাতই দাও না কেন, আমি চুপ ক'রে থাকব?"

বিবর্ণমুখে শশিনাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—সেই চিরদিনের শান্ত, লজ্জা-নম্র স্বল্পভাষিণী লীলা যে কোনো অবস্থাতেই এমন অদ্ভুতভাবে অভিনয় করিতে পারে—এই বিস্ময়টাই তাহার বেদনার চেয়েও বড় হইয়া উঠিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, তাহা প্রথমে ভাবিয়াই পাইল না, এতই সে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর বিস্ময়ের প্রথম আঘাতটা যখন সামলাইয়া উঠিল, তখন মুহূর্তের জন্য তাহার দুঃখ চিহ্নিত মুখে গভীর যন্ত্রণার ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

লীলার উদ্দীপ্ত নেত্রে ক্লিষ্ট-করুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শশিনাথ কহিল, "এমনই ভুল বুঝলে লীলা? কেবল আঘাত, কেবল অপমান, কেবল শাস্তি? ছ-বছর

আগে যেদিন প্রথম এ বাড়িতে এসে ঢুকেছিলে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কি তাই পেয়েছ—আর কিছু নয়?"

এই করুণার ইতিহাসের উল্লেখে লীলার মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল। কিন্তু তখনি নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া সে কহিল, "জানি, জানি তোমরা অনেক দয়া করেছ,—এই আবর্জনার পেছনে তোমরা অনেক টাকা নষ্ট করেছ, কিন্তু এখন তার ব্যবস্থাও তো হয়েছে। বড়লোকের ঘরে আমার বিয়ে দিচ্ছ; চক্রবৃদ্ধি-সুদে তোমাদের ঋণ শোধ দিলেও চলবে না কি?"

নিমেষের জন্য শশিনাথের দুঃখ-বিষণ্ণ চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তখনই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, "তা হয়তো চলবে, কিন্তু টাকার ঋণটাই তো ঋণ নয় লীলা, ঋণ পাওয়ারও তো একটা ঋণ আছে, সেটা কি এই মুহূর্তে এমনি ক'রে শোধ করছ?"

দৃঢ়ভাবে লীলা কহিল, "হ্যাঁ, এমনি করেই তা শোধ করছি—এমনি ক'রে তোমাদের দাসীত্ব ক'রে—তোমাদের সব হুকুম, সব জবরদস্তি মাথায় তুলে নিয়ে। এখনও যদি বাকি কিছু থাকে তো বল, আর কি করতে হবে?"

শবের মত শশিনাথের মুখ সাদা হইয়া গেল। গভীর-বদ্ধস্বরে সে কহিল, "তোমারও যা বলবার বাকি আছে ব'লে নাও লীলা, যত ভীষণ কথা, যত কঠিন শব্দ,—তা সে যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন। উঃ! তুমি কি করছ লীলা!"

সহসা শশিনাথ দেখিল, নিমেষের মধ্যে লীলার রক্তোদ্ভাসিত মুখ হইতে সমস্ত রক্ত কে যেন টানিয়া লইয়া তাহাকে একেবারে পাংশু করিয়া দিল, এবং তাহার পর-মুহূর্তে শাখাচ্যুত লতার মত লীলার উত্তেজনা ক্লান্ত দেহ শশিনাথের পদপ্রান্তে ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িল।

ত্বরিতপদে শশিনাথ দ্বারের অর্গল লাগাইয়া দিয়া লীলার বিকল লঘু দেহ ধীরে ধীরে দুই বাহুর মধ্যে উঠাইয়া লইয়া শয্যার উপর স্থাপন করিল—তাহার পর পাখা খুলিয়া দিয়া তাহার মুখে চোখে অল্প অল্প জলের ছিটা দিতে লাগিল।

দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই চক্ষু উন্মীলিত করিয়া লীলা শয্যার উপর উঠে বসিল।

একটু দূরে সরিয়া গিয়া শশিনাথ কহিল, "কাউকে ডাকব? এখন কি শরীর দুর্বল বোধ হচ্ছে?"

মুখ নত করিয়া লীলা কহিল, "না।" তাহার পর রুদ্ধ দ্বারের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাড়াতাড়ি কহিল, "দোরটা খুলে দাও শশিদা।"

শশিনাথ দ্বার খুলিয়া দিল, তাহার পর লীলার শয্যার কাছে ফিরিয়া আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "আমি এখন চললাম লীলা, তুমি নিজের মনকে শান্ত ক'রে নাও। আমি আর বেশী কি বলব—ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন। না জেনে না বুঝে যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি ভাই, ক্ষমা ক'রো। এর বেশী আমার কিছু বলবার নেই।"

আর অপেক্ষা না করিয়া শশিনাথ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন লীলার মনে তপ্ত গ্রীষ্মের গাঢ় বর্ষা নামিয়াছিল। চক্ষু হইতে টপ টপ করিয়া ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া শয্যা ভিজিয়া যাইতেছিল।

শশিনাথ বাহির হইয়া যাইবার পর লীলা উঠিয়া দ্বার লাগাইয়া দিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়া খুব খানিকটা রোদন করিল, তাহার পর বর্ষণ-লঘু মেঘের মত মনটা কতক হাল্কা হইয়া গেলে, শয্যা ত্যাগ করিয়া একটা আলমারির মাথা হইতে বহু যত্নে লুকায়িত কি একটা গুপ্ত-ধন বাহির করিয়া পরম আবেগে একবার বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল—খানিকটা তাহার উপর অশ্রু-বর্ষণ করিল, তাহার পর একবার তাহাতে ওষ্ঠাধার স্থাপিত করিয়া একটা বড় ট্রাঙ্কের একেবারে তলদেশে লুকাইয়া রাখিল।

২৩

লীলার ঘর হইতে বাহির হইয়া শশিনাথ উর্মিলাকে সন্ধান করিতে লাগিল। উর্মিলা তখন লক্ষ্মীর ঘরে গলবস্ত্র হইয়া সন্ধ্যা-প্রণাম করিতেছিল। শশিনাথ আসিয়া নিকটে উপবেশন করিল। প্রণামান্তে শশিনাথের দিকে ফিরিয়া চাহিতেই তাহার মুখ দেখিয়া উর্মিলা চমকিয়া উঠিল।

"কি হয়েছে তোমার ঠাকুরপো?"

অল্প হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "কিছু হয় নি তো।"

"তবে মুখ অমন শুকনো কেন?"

"ভাবনা চিন্তা কি কম বউদিদি? একটা বিয়ের কথা, সোজা নয় তো! এ উত্তরে নিশ্চিন্ত না হইয়া উর্মিলা পুনরায় প্রশ্ন করিবার পূর্বেই শশিনাথ কহিল, "বউদি!"

শশিনাথের কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্ন হইয়া উর্মিলা কহিল, "কি বল দেখি?"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া শশিনাথ কহিল, "তোমার কথা না শুনে কি জানি হয়তো ভাল হল না।"

"আমি তো বুঝতে পারছি নে ঠাকুরপো, কি ভাল হ'ল না!"

একটু ভাবিয়া শশিনাথ ধীরে ধীরে কহিল, "সুধীরের সঙ্গে বিয়ে হ'লে লীলা যদি সুখী না হয় বউদিদি? এখন কি সে কথা ভেবে দেখবার সময় নেই?"

শশিনাথের কথা শুনিয়া উর্মিলা চিন্তিত হইয়া উঠিল। চিরদিন ঠিক বিপরীত কথা বলিয়া আসিয়া আজ কত দুঃখে কত আশঙ্কায় শশিনাথ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া এ কথা বলিতেছে, তাহা কথাটা না জানিয়াও সে বুঝিতে পারিল। নিমেষের মধ্যে ভাল-মন্দ যতটা সম্ভব ভাবিয়া লইয়া উর্মিলা দেখিল, সে পথ আর উন্মুক্ত নাই। চারিদিক হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এতদূর অগ্রসর

হইয়াছে যে, বাকি যতটুকু আছে ততটুকু নগণ্য। এখন সমস্ত ব্যাপারটাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিবার সাহস ও সমীচীনতা ঊর্মিলা মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। তাহা ছাড়া ইহার মধ্যে আর একটি প্রাণীর সুখ-দুঃখের সমস্যা এমনভাবে জড়িত রহিয়াছে যে, উপস্থিত অবস্থা লইয়া কোন প্রকারে নাড়া-চাড়া করিতে ঊর্মিলার সাহস হইল না। প্রবৃত্তিও হইল না। সরযূ মনে মনে শশিনাথকে কতখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, সে কথা ঊর্মিলার অবিদিত ছিল না। একটি লতা, যাহাকে এক শাখা হইতে বিচ্যুত করিয়া অন্য শাখায় সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় পূর্বশাখায় লইয়া আসিবার জন্য ইত্যবসরে যে লতাটি সে শাখাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, তাহাকে ছিন্ন করিতে ঊর্মিলা মনের মধ্যে একটা হীনতা বোধ করিল। তাহা ছাড়া সাধারণ হিন্দু-নারীর প্রকৃতি বিষয়ে ঊর্মিলার যে ধারণা ছিল, তাহাতে মনের মধ্যে তাহার এ বিশ্বাস ছিল যে, প্রথমে মনে মনে বিমুখ ভাব বহন করিলেও, অল্পদিনের মধ্যেই লীলা তাহার বিবাহিত জীবনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবে; স্বামী চিনিয়া লইবে।

এই সকল কথা নিমিষের মধ্যে ভাবিয়া লইয়া ঊর্মিলা কহিল, "না ঠাকুরপো এখন আর সময় নেই। এখন উল্টোপাল্টা করতে গেলে, একটা ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হবে।"

"কিন্তু লীলা যদি অসুখী হয়?"

"হবে না।"

"আন্দাজ করছ?"

"না, আমার বিশ্বাস তাই।"

অন্যমনস্ক হইয়া শশিনাথ মৃদুস্বরে কহিল, "তা হ'লেই ভাল, কিন্তু এখন—"

কথাটা অসমাপ্ত রহিয়া গেল, "কই, শশি কোথায়?—এই যে বউ-দিদিও এখানে রয়েছে।" বলিয়া বরেন প্রবেশ করিল এবং শশিনাথের পৃষ্ঠে দুম করিয়া একটা মুষ্ট্যাঘাত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঊর্মিলার পদধূলি গ্রহণ করিল। যুক্তকর

কপালে স্পর্শ করিয়া ঊর্মিলা মনে মনে আশীর্বাদ করিয়া কহিল, "বাঁচলুম বরেন ঠাকুরপো, তোমার আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে আমার এমনি ভাবনা হচ্ছিল! জাহাজ আসতে এত দেরি হ'ল কেন? শরীর বেশ ভাল আছে তো?"

সহাস্যে ঊর্মিলার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বরেন কহিল, "লীলার বিয়ের লুচিটা প্রায় ফস্কে ছিল বউদিদি। শশির টেলিগ্রাম পেয়েই প্যাসেজ বুক করতে গেলাম; কিন্তু তখন একটিও বার্থ ছিল না—অগত্যা ডেক্ প্যাসেঞ্জার হ'য়ে এলাম। তাই আসতে দেরি হ'ল—ভাঁটার জন্য মেটে-বুরুজে জাহাজ আটকে ছিল; ফার্স্ট সেকেণ্ড্ ক্লাস প্যাসেঞ্জাররা লঞ্চে ক'রে আগেই চ'লে এসেছিল।"

শশিনাথ বলিল, "বউদি, বরেনের খাবার ব্যবস্থা শীঘ্র কর—ওর বোধ হয় সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয় নি।"

ব্যস্ত হইয়া ঊর্মিলা কহিল, "আমি এখনই চললাম। বরেন ঠাকুরপো, তুমি বাথ-রুমে হাত মুখ ধুয়ে নাও।"

ঊর্মিলাকে বাধা দিয়া বরেন কহিল, "ব্যস্ত হ'য়ো না বউদিদি, জাহাজ থেকে নেমে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে স্নান ক'রে, খাবার খেয়ে এখানে আসছি। এখানে এসে মেজ-বউদিদির সঙ্গে প্রথমে দেখা হ'ল, তাঁর মুখে তোমরা এদিকে আছ শুনে এলাম। রাত্রে একসঙ্গে খাব অখন। আমাকে খাইয়ে তো কোন দিন অসুখী হও নি বউদি—আজও হবে না। কার দোকানে সন্দেশ তৈরি করিয়েছ? সেই আদি ও অকৃত্রিম জগৎবিখ্যাতর দোকানের, না, তস্য ভ্রাতার দোকানের?"

সহাস্যমুখে ঊর্মিলা কহিল, "সে তোমাকে এখন বলা হবে না—সন্দেশ খেয়ে তোমাকে বলতে হবে, কোন্ দোকানের তৈরি!"

উৎফুল্লভাবে বরেন কহিল, "সে পরীক্ষা যদি দিতে হয়, তা হ'লে দশ-গণ্ডার কমে তো হবে না। আচ্ছা, বউদি, তোমার খাওয়াতে ভাল লাগে, না, খেতে ভাল লাগে?"

ঊর্মিলা স্মিতমুখে কহিল, "খাওয়াতে।"

"আর আমার ঠিক উল্টো—আমার খেতে ভাল লাগে। তুমি কোন্ দলের শশি? বউদিদির দলের, না, আমার দলের?"

শশিনাথ হাসিয়া বলিল, "বউদিদির তুলনায় তোমার দলের, আর তোমার তুলনায় বউদিদির দলের।"

বরেন কহিল, "বউদি, শশির কথাটা শুনে রাখলে, রাত্রে খাওয়ার সময়ে কিন্তু একবার পরখ ক'রে দেখো, উনি কোন্ দলের।"

কিছু পূর্বে শশিনাথ ও ঊর্মিলার মধ্যে যে গুরুতর চিন্তা দুষ্ট-বাষ্পের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, দম্‌কা হাওয়ার মত তাহার মধ্যে বরেন আসিয়া পড়িয়া অন্তত ক্ষণকালের জন্যও তাহাকে উড়াইয়া দিল! দুশ্চিন্তার বদ্ধ-ঘন চাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরিহাস-হাস্যের অনাবিল লঘু বায়ুতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শশিনাথ ও ঊর্মিলা উভয়েই একটু আরাম পাইল। কথায় কথায় হরিচরণের মৃত্যুর কথা আসিয়া পড়িল।

ঊর্মিলা কহিল, "বেচারা সরযূর চোটটা বড় বেশি রকমই লেগেছিল—এই বিয়ের গোলমালে একটু সামলে উঠেছে মনে হয়। তুমি সরযূর সঙ্গে দেখা করবে না বরেন-ঠাকুরপো?"

সরযূকে দেখিবার জন্য বরেনের মনে যে প্রবল বাসনা ছিল, শুধু লজ্জা তাহাকে সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিল। পথে আসিতে তিন দিন সে শুধু সরযূর কথাই চিন্তা করিয়াছে, এবং জাহাজের ডেক হইতে অন্তহীন জলরাশি দেখিয়া দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছিল শুধু সরযূর কথাই ভাবিয়া। তাহার পর যেদিন দিক্‌প্রান্তে ঊর্মিমালার পরে মসীরেখার ন্যায় বাংলার তটভূমি প্রথম দৃষ্টিগোচর হইল, তখন তাহার মনটা যে বিপুল পুলকে নাচিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও সরযূরই কথা স্মরণ করিয়া। আজ এ বাড়িতে আসিয়া পর্যন্ত তাহার মনে সব কথার উপরে সরযূর কথাটাই উচু হইয়া ছিল। তাহার সহিত সরযূর বিবাহের কথা এতদিনে যে শশিনাথ সকলকে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। সাক্ষাৎ হইলে সরযূ শোক ও

সঙ্কোচের যুক্ত ক্রিয়ায় কিরূপ বিব্রত হইয়া উঠিবে, এবং সে নিজে এই দুইটি বিভিন্ন হৃদয়-বৃত্তির সহিত কি প্রকারে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে—ইহাও তাহার নিকট একটা কম সমস্যা ছিল না। কিন্তু শোকের প্রসঙ্গে উর্মিলা যখন কথাটা অমন সহজভাবে উত্থাপিত করিল, তখন সে কথার সেই রকমই সহজ উত্তর দেওয়া ভিন্ন বরেনের উপায়ান্তর রহিল না।

সে তাড়াতাড়ি কহিল, "নিশ্চয় দেখা করব।"

"তবে চল, তোমাকে সরযূর কাছে নিয়ে যাই।"

"চল যাই।" বলিয়া বরেন শশিনাথের মুখে কৌতুক হাস্যের রেখা কতখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং চক্ষু দুইটি বিদ্রুপের দুষ্ট ভাষায় অর্থময় হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল।

বরেনের মনের কথা অনুমানে বুঝিয়া শশিনাথ মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "সরযূর সঙ্গে দেখা সেরে একেবারে আমার ঘরে এসো বরেন। আমি ঘরেই থাকব।"

দাঁড়াইয়া বরেন কহিল, "তুমিও চল না।"

শশিনাথ কহিল, "না, না। আমি আমার ঘরে চললাম, তুমি দেখা করে এস।"

শশিনাথ প্রস্থান করিল।

শশিনাথ যে কেন সঙ্গে গেল না, তাহার অর্থ উর্মিলাও বুঝিল—বরেনও বুঝিল; কিন্তু দুইজনে দুই বিভিন্ন ভাবে।

২৪

সরযূ আপনার ঘরেই ছিল। "বরেন-ঠাকুরপো এসেছেন সরযূ।" বলিয়া উর্মিলা ঘরে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল, "এস বরেন-ঠাকুরপো।"

সরযূ আসিয়া বরেনকে প্রথম প্রণাম করিল, তাহার পর দুঃখ-মলিন মুখ বরেনের দৃষ্টিপথে তুলিয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "ভাল আছেন? আপনার ভগ্নীপতি বেশ সেরে উঠেছেন?"

শোকের দংশন হইতে তখনও সরযূ একেবারে মুক্ত হইতে পারে নাই, তাহা বরেন সরযূর কৃশ-পাণ্ডুর মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল। তাহার হৃদয়ের বহু-পিপাসিত, বহু-অপেক্ষিত প্রেম নিগূঢ়-করুণায় দ্রবীভূত হইয়া নিমেষের মধ্যে গভীর সমবেদনায় পর্যবসিত হইল।

সরযূর প্রশ্নের অতি সংক্ষেপে উত্তর দিয়া বরেন চুপ করিয়া রহিল; তাহার মনের মধ্যে সান্ত্বনার যে সংখ্যাহীন বাণী উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল, মুখে তাহার একটিও বাহির হইল না। কিন্তু যে নিগূঢ় বেদনা ও সমবেদনায় তাহার উদার উন্মুক্ত চিত্ত মথিত হইতেছিল, তাহার ব্যথিত ব্যাকুল দৃষ্টি সরযূর নিকট অসংশয়িতরূপে তাহা ব্যক্ত করিল। ঘনায়িত মেঘে শীতল বায়ু আসিয়া লাগিলে তাহা যেমন টপ টপ করিয়া ঝরিতে থাকে, বরেনের নিকট হইতে এই নিঃশব্দ কিন্তু নির্বিকল্প করুণা লাভ করিয়া তেমনি সরযূর চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু শুভদিনে চক্ষের জল ফেলিলে পাছে অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় সে তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিল।

আর্দ্রকণ্ঠে উর্মিলা কহিল, "এই ছেলেমানুষের উপর দিয়ে বরেন-ঠাকুরপো, এরই মধ্যে এত ঝড় বয়েছে যে, একে যেন ভগবানের কৃপায় আর কখনো দুঃখের মুখ না দেখতে হয়।"

উর্মিলার কথা শুনিয়া সরযূর আর্তহৃদয় কিয়ৎ পরিমাণেও সুস্থ করিবার জন্য বরেনের সমস্ত চিত্ত উদ্যত হইয়া উঠিল। কাতর-কণ্ঠে সে কহিল, "এইটেই বউদিদি, কিছুতে বুঝতে পারি নে যে, ভগবান যদি আছেন তো এ অবিচার-অন্যায়ের রাজত্ব গ'ড়ে তাঁর কি উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে? যে নিষ্পাপ, পবিত্র, তার প্রাণে আগুন জ্বেলে তিনি কি পোড়ান—আর যার হৃদয় অন্যায় অনাচার

পাপের কারখানা, তাকে সুখ আর ঐশ্বর্যের সিংহাসনে বসিয়ে রেখে তিনি কি ইষ্ট সাধন করেন?"

ঊর্মিলা কহিল, "এ সব বড় বড় কথার মীমাংসা আমরা মেয়েমানুষ হ'য়ে তোমাদের কাছে কি করব বরেন-ঠাকুরপো? তবে এটা তো আমরা নিয়ত দেখতে পাই যে, ঘর টাকে পরিষ্কার করতে হ'লে তার বড় বড় আবর্জনা-গুলোকেই পরিষ্কার ক'রে ফেলা খুব সহজ কাজ—এমন কি, হাত দিয়েও ফেলে দেওয়া চলে, কিন্তু ঝাঁট দেওয়ার পর যে ধুলো থেকে যায়, তা চোখে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তা থেকে ঘর পরিষ্কার করতে হ'লে জল দিয়ে ধুতে হয়। তেমনি সহজে যে ময়লা চোখে পড়ে না, চোখের জলে তা হয়তো কাটে।"

ঊর্মিলার কথা শুনিয়া বরেন একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, "তোমার বউদিদি যেমন মন, তেমনি কথা বলেছ। এ হ'ল বিশ্বাসের কথা, যুক্তির কথা নয়। এই রকম উপমা দিয়ে যত কথা বলবে সবই হবে বিশ্বাসের কথা। এ অবশ্য মন্দ নয়; এতে প্রাণে একটা ভারি আরাম পাওয়া যায়; কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর তো সর্বশক্তিমান—তবে তাঁকে মানুষের মন, এমন ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে পুড়িয়ে পরিষ্কার করতে হয় কেন? তিনি তো শুধু ইচ্ছা করলেই পরিষ্কার করতে পারেন। যেটা তিনি আজই করতে পারেন, সেটা তিনি এমন ক'রে জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে ধীরে ধীরে জলে ভাসিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, আঘাত দিয়ে করেন কেন? তাতে কার ইষ্ট সাধন হয়? তাঁর নিজের, না, মানুষের?"

এ কথার বিরুদ্ধে ঊর্মিলা বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি ঠিক বলেছ বরেন-ঠাকুরপো—এ সবই অনুমানের কথা, ঠিক ক'রে কিছুই বোঝবার উপায় নেই।"

যুক্তির কুঠার দিয়া ঊর্মিলার বিশ্বাসের মূলে আঘাত করিয়া বরেন মনে মনে অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "কিন্তু যুক্তি যখন আমাদের বেশি কিছুই দিতে

পারে না বউদিদি, আর এই বিশ্বাসের কথাগুলিই চিরদিন ধ'রে জগতের সব মহৎ ও জ্ঞানী লোকেরা অনুমান ক'রে গেছেন, তখন এই অনুমানের কথা-গুলিকেই মেনে নিতে হবে। সোনার মত, দুঃখের আগুনে মানুষের মন গলিয়ে ভগবান ময়লা পরিষ্কার করেন, এটা শুধু উপমা নয়—এটা সত্যের মতই আমাদের ধ'রে নিতে হবে।"

নানাবিধ কর্মের ভিড়ে আজ ঊর্মিলার বেশিক্ষণ কোথাও বসিবার সময় বা সুযোগ ছিল না। কালীচরণ আসিয়া কহিল, "মা, বড়বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন।"

"তোমরা গল্প কর—আমি এখনি আসছি।" বলিয়া ঊর্মিলা প্রস্থান করিল।

ঊর্মিলা সহসা চলিয়া যাওয়ায় বরেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল,—কথা চালাইবার উপযুক্ত কোনও কথাই সে খুঁজিয়া পাইল না। রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা পর্যন্ত সে বিশেষ হৃদয়-বৃত্তিটি তাহাকে চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল, সুযোগ বুঝিয়া সেইটিই তাহার চিত্তমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সরযূই কথা কহিল, "বাবার মৃত্যুর পর রেঙ্গুন থেকে আপনি আমাকে যে চিঠিখানি দিয়েছিলেন, সেখানি প'ড়ে প'ড়ে দুঃখের মধ্যে অনেকটা শান্ত পেতাম। আপনার সে চিঠিখানি আমি বোধ হয় কুড়িবার পড়েছি।"

আগ্রহসহকারে বরেন কহিল, "আর সেই চিঠির উত্তরে আপনি যে চিঠি আমাকে লিখেছিলেন, তা বোধ হয় আমি পঞ্চাশবার পড়েছি।" কথাটা এমন ভাবে বলিয়া ফেলিয়া বরেনের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। ঠিক এমন করিয়াই কথাটা বলিবার তাহার উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কথার উপর মনের ঝোঁকে সত্যটা একেবারে অনাবৃত দেহেই বাহির হইয়া আসিল। তাই অপর পক্ষ হইতে কৈফিয়তের কোন তলব না থাকিলেও অপরাধীর মত বরেন সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ৎ প্রদান করিল। "আপনার সে চিঠিখানিতে পিতৃভক্তি আর

স্থির-বুদ্ধির এমন সুন্দর পরিচয় পেতাম যে, প্রতিবারই প'ড়ে আমি মুগ্ধ হতাম।"

কৈফিয়ৎটা খুব সুবিধামত হইল না—এমন কি, তাহার মধ্যেও নূতন দুই-একটা আপত্তির গোলমেলে কথা আসিয়া জুটিল। একজন অবিবাহিতা কিশোরীর নিকট হইতে একজন অবিবাহিত যুবক পত্র পাইয়া একবার নয়, পঞ্চাশবার তাহা পাঠ করে এবং প্রতিবারই মুগ্ধ হয় তাহা শুধু পিতৃভক্তি আর স্থির-বুদ্ধির জন্য, ইহা বরেনের নিজেরই বিশ্বাসযোগ্য মনে হইল না।

কথাটা খুব সরলভাবে গ্রহণ করিলেও তাহার মধ্যে নিজের অপরিমিত স্তুতি বর্তমান থাকায় সরযূ একটু সঙ্কোচ বোধ করিল এবং প্রসঙ্গটা একেবারে পরিবর্তন করিবার অভিপ্রায়ে সে এমন একটা কথা উত্থাপিত করিল,যাহা বরেনের উপস্থিত মানসিক অবস্থায় যে ভাবে ক্রিয়া করিল, তাহা জানিতে পারিলে সে কদাচ করিত না।

সরযূ বলিল, "আর আমাকে 'আপনি' ব'লে ডাকা আপনার উচিত হয় না।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বরেন কহিল, "কেন?"

একটু ইতস্তত করিয়া স্মিতমুখে সরযূ কহিল, "এখনও কি আপনি মনে করেন, আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার আপনার হয় নি? বিলাসপুরের আপনার সে কথা আমার মনে আছে।"

পুলকিত হইয়া বরেন মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, কথাটা খুবই ঠিক। ভবিষ্য স্বামী 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিলে কোন সহৃদয়া স্ত্রীলোকের ভাল লাগে? আচরণটা নিতান্তই সম্পর্ক-বিগর্হিত হয়,—মনে ব্যথা লাগিবারই কথা।

হাসিয়া কহিল, "'আপনি' শব্দটা কি এতই কর্কশ?"

সরযূ কহিল, "সম্পর্কের হিসাবে কর্কশ লাগে। আগে যখন আপনি প্রতিদিন আমাকে 'আপনি' ব'লে ডাকতেন, অভ্যাসের জন্যে তত খারাপ লাগত না—আজ রেঙ্গুন থেকে এতদিনের পর এসে 'আপনি' বলাতে কানে বড লাগছে।"

বরেন কহিল, "আমারও তো ঠিক সেই রকম লাগতে পারে!"

ঈষৎ হাসিয়া সরযূ কহিল, "তা পারে; কিন্তু আপনাকে আমি 'আপনি' বললে অন্যায় হয় না—কিন্তু আপনি যদি আমাকে 'আপনি' বলেন তা হ'লে হয়।"

বরেন ভাবিয়া দেখিল, এ কথাও যথার্থ বটে। ভবিষ্য স্ত্রীর পক্ষে বিবাহের পূর্বে ভাবি স্বামীকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করা সময়বিশেষে কঠিন হইতে পারে। সরযূর মুখ হইতে 'তুমি' সম্বোধন শুনিবার আনন্দ অদূরভবিষ্যতের কোন মোহ-মদ-বিহবল রজনীর জন্য সঞ্চিত রাখিয়া ঈষৎ আবেগকম্পিত কণ্ঠে বরেন কহিল, "তুমি যখন আমার অধিকার অস্বীকার করছ, তখন আজ থেকে তোমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করব আর তোমাকে ডাকতে হ'লে 'সরযূ' ব'লেই ডাকব। কি বল?"

ঈষৎ লজ্জা-রঞ্জিত মুখে সরযূ কহিল, "নিশ্চয়ই। এর অনেক আগেই তাই করা উচিত ছিল। আপনি যখন আপনার কর্তব্য কিছুতেই করলেন না, তখন কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে আমি আপনাকে কর্তব্য পালন করাতে বাধ্য করলাম।"

সরযূকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে বরেনের একটু বাধিতেছিল; কিন্তু এই অজ্ঞাতপূর্ব নূতন সঙ্কোচটুকু এমন-একটু তরল স্নিগ্ধ মাধুর্যে মণ্ডিত ছিল যে, সেই বাধাটাই তাহার নিকট উপভোগের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। সরযূ যে স্বতঃপ্রবৃত্তি হইয়া 'তুমি' সম্বোধন করিবার হুকুম দিয়াছে, তাহা বরেনের নিকট আজ তাহার অধিকার স্বত্বের পরওয়ানা বলিয়া মনে হইল—এখন যে কোন শুভলগ্নে এই বহুমূল্য সম্পত্তিটির উপর দখল জারি করিয়া বসিলেই চলিবে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে স্মিতমুখে বরেন কহিল, "ভাগ্যে কর্তব্যটা নিজ থেকে করি নি, তা হ'লে তোমার দ্বারা বাধ্য হবার এ সুখটুকু তো পেতাম না সরযূ।"

এবার সরযূ শুধু রক্তিমই হইল না—একটা যেন ক্ষীণ অস্পষ্ট সন্দেহ তাহার পায়ের এক কোণে খচ করিয়া বিঁধিল।

কিন্তু সেটাও সে বুঝিবারই ভুল মনে করিয়া একেবারে অপেক্ষা করিল এবং

সহজভাবে স্মিতমুখে কথাটার উত্তর দিল, "কর্তব্য ক'রে আপনার সুখ হয় না! কেউ করিয়ে দিলে তবে সুখ!"

বালির বাঁধ এবং প্রেমিকের পণ উভয়ই ঠিক একপ্রকৃতির জিনিস, খুবসহজেই ভাঙে এবং যখন ভাঙে একেবারে অকস্মাৎ ভাঙে—তাহার পর উচ্ছ্বাসের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। এক মুহূর্ত আগে বরেন মনে মনে সংযমের যে দৃঢ় পণ করিতেছিল, সে-যে পর-মুহূর্তেই একেবারে ভাঙিয়া পড়িতে পারে, সে সন্দেহ বরেনেরও বোধহয় একেবারেই ছিল না। সরযূর কথার মধ্যে এমনই কি একটা উত্তেজনা লাভ করিয়া সে অকস্মাৎ এমন কথা বলিয়া বসিল যে, সরযূ একেবারে কাঠ হইয়া গেল ;—লজ্জায়, বিস্ময়ে, দুঃখে, না, আরও অন্যান্য কারণে, তাহা বলা কঠিন।

বরেন কহিল, "সকলে নয় সরযূ। তুমি করিয়ে দিলেই হয়। তুমি এমনি ক'রে আমার সকল কর্তব্যের কার্যকরী শক্তি হ'য়ো—আমার তুচ্ছ জীবনকে সফল ক'রো, আমার জীবনের ধ্রুবতারা হ'য়ো সরযূ। এ আমার আজকের তৈরি কল্পনা নয় সরযূ—এ অনেক দুঃখ অনেক সুখ অনেক দিনের গড়া আশা। বল একবার, এ আমার শুধু স্বপন নয়?"

বরেনের উচ্ছ্বসিত চিত্ত আরও কতদূর অগ্রসর হইত বলা যায় না, যদি না সেই মুহূর্তে ঘরে ঊর্মিলা আসিয়া প্রবেশ করিত।

ঊর্মিলা আসিয়া পুনরায় পূর্বকথা পাড়িল। "তুমি বলছিলে বরেন-ঠাকুরপো, বিশ্বাসের কথা। আমার মনে হয়, সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসের এত বেশি যোগ আছে যে, যা আমরা ঠিক বিশ্বাস করি, সেটা অনেক সময়েই সত্যি হয়। ভগবান আছেন ব'লে যখন চিরদিন ধ'রে প্রায় সকল মানুষেরই বিশ্বাস, তখন বুঝতেই হবে সত্য-সত্যই ভগবান আছেন।" ইতিমধ্যে সম্ভবত বরেন ও সরযূ প্রসঙ্গান্তরে গিয়াছিল এবং পুনরায় পূর্বকথা উত্থাপিত করায় তাহার শৃঙ্খল ভাঙিয়া গেল মনে করিয়া ঊর্মিলা তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি চ'লে যাওয়ার পর তোমাদের কি এই কথাই হচ্ছিল বরেন-ঠাকুরপো?"

তত্ত্বকথা ছাড়িয়া ইত্যবসরে বরেন ও সময় কোন্ প্রসঙ্গের ভয়াবহ উচ্চ-শিখরে উপনীত হইয়াছিল এবং তথা হইতে বিস্ময়-বিপর্যয়ের কোন্ অতলে একজন পতিত এবং অপর জন পতনোন্মুখ হইয়াছে, তাহা উর্মিলা একেবারেই জানিত না।

উর্মিলার প্রশ্নে মনে মনে লজ্জিত হইয়া বরেন কহিল, "না, আমাদের সে কথা হচ্ছিল না। কিন্তু তুমি যা বলছ, তাই ঠিক বউদিদি ; বিশ্বাস ঠিক যেন আলো। যুক্তি যেখানে মাথা ঠুকে মরে—বিশ্বাস সেখানে একেবারে সব পরিষ্কার ক'রে দেয়।"

ভক্তি ও যুক্তির প্রসঙ্গটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া উর্মিলা হঠাৎ হাস্যোচ্ছ্বসিত মুখে কহিল, "বরেন-ঠাকুরপো, বোশেখ মাসের লগ্নটাও আমাদের ফাঁক যাবে না।" কিছু পূর্বে সুবাসিনীর নিকট উর্মিলা শুনিয়াছিল যে, বৈশাখ মাসে বরেনের বিবাহের কথা হইতেছে।

বরেন কহিল, "কেন বল দেখি ?"

"বোশেখ মাসে তোমার বিয়ে।"

বৈশাখ মাস শুনিয়া বরেন একটু দুঃখিত হইল। এত দেরি ! কিন্তু সরযূর চিত্তের বর্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া সেটা সঙ্গত বলিয়াই মনে করিল।

কহিল, "এত ধৈর্য আমার থাকবে কি ? কেন, ফাল্গুন মাস কি অপরাধ করলে বউদি ?"

বক্র-দৃষ্টিতে বরেন সরযূর লজ্জারক্ত মুখখানি দেখিবার চেষ্টা করিল।

একটা আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গেই অন্ধ নিয়তি যে আরও একটা গুরুতর আঘাত লইয়া আসিতেছে, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়া সরযূ অসাড় হইয়া গিয়াছিল। যে আঘাত বরেনের নিকট হইতে পাইয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে—উর্মিলার নিকট হইতে তদপেক্ষা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া বরেন যে কি হইবে তাহা ভাবিয়া সরযূ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

বরেনের পরিহাসের উত্তরে উর্মিলা সহাস্যে কহিল, "এত অধীর হ'রে পড়েছ বরেন-ঠাকুরপো ? কিন্তু আর একজন যদি তোমার চেয়েও বেশি অধীর হ'য়ে থাকে ?" বলিয়া সরযূর দিকে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

সে একজন যে সরযূ ভিন্ন আর কেহ নহে, তাহা অসংশয়ে বুঝিয়া বরেন উৎফুল্ল-কণ্ঠে কহিল, "তা হ'লে সে একজনকে ব'লো বউদিদি, তেমন অবস্থায় এই মাঘ মাসেও আমার আপত্তি নেই।"

উর্মিলা হাসিয়া কহিল, "এ বিবাদ কি আমার দ্বারা মিটবে বরেন-ঠাকুরপো ? তোমরা দুজনে মিলে এর যা হয় একটা মীমাংসা ক'রো। আচ্ছা, বসো, ঠাকুরপোকে আমি ডেকে নিয়ে আসি।" বলিয়া উর্মিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বরেন কহিল, "শশি এর কি মীমাংসা করবে সরযূ ! এ মীমাংসা তোমাতে আমাতে করব। কিন্তু এ বিষয়ে তুমি যা বলবে তাই হবে সরযূ। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি বলব, কালকেরই লগ্নে। নিজের সৌভাগ্য থেকে কে দূরে থাকতে চায় সরযূ ?"

এ কথার উত্তরে সরযূর বলিবার কিছু থাকিলেও, বলিবার শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছিল, এবার কিন্তু তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া আসিল, দৃষ্টিপথে কুজ্‌ঝটিকা দেখা দিল।

এবারও তাহাকে রক্ষা করিল উর্মিলা। কিছু পূর্বে শশিনাথের সহিত যে-সকল গুরুতর কথা হইয়াছিল তাহা, এবং শশিনাথের বর্তমান মানসিক অবস্থা, ঘর হইতে বাহির হইয়াই স্মরণ করিয়া উর্মিলা মনে করিল, এ পরিহাসের প্রসঙ্গে শশিনাথকে আহ্বান করা এখন সমীচীন হইবে না। এ কথা মনে হইতেই সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করিল এবং পর্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

"কি হ'ল বউদিদি ?"

"ঠাকুরপো আবার তার নিজের বিয়ের দিন নিজে ঠিক করবে! কোন রকম করে তার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে এই ঢের !"

দুঃসহ বিস্ময়ে বরেন কহিল, "শশির বিয়ে নাকি?"

ঈষৎ বিস্মিত-কণ্ঠে উর্মিলা কহিল, "কেন, তুমি জান না, ফাল্গুন মাসে ঠাকুরপোর সঙ্গে সরযূর বিয়ে?"

"না।"

"জানবেই বা কেমন ক'রে, মনের দুঃখে তো কোন কথা কোথাও লেখা হয় নি।"

তাহার পর কেমন করিয়া, কি অবস্থায়, কি করুণ উপরোধে নিরুপায় হইয়া শশিনাথ সরযূকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা উর্মিলা সবিস্তারে বলিয়া গেল। সে উদ্দেশ্য উর্মিলার একেবারেই না থাকিলেও তাহার কাহিনী হইতে এই কথাটাই যেন ফুটিয়া উঠিল যে, শশিনাথের এই সম্মতির ভিত্তি দয়া হউক, করুণা হউক, উপায়বিহীনতা হউক অথবা আর যাই হউক, প্রেম নিশ্চয়ই নহে। যে ব্যর্থ-বিপুল প্রেম কিছু পূর্বে ব্যক্ত হইয়া প্রভাত-আকাশের মত সমস্ত ঘরটাকে প্রদীপ্ত করিয়াছিল, তাহার নিকট শশিনাথের এই শুষ্ক করুণা অতিশয় ম্লান হইতে লাগিল।

কাহিনী শেষ করিয়া উর্মিলা কহিল, "খুব সু-খবর নয় বরেন-ঠাকুরপো?"

যে হাসি অপেক্ষা অশ্রু অনেক অকরুণ, সেই হাসিতে বরেনের মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কহিল, "খুব।"

তাহার পর আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "বউদি, আজ আমি এখন বাড়ি চললাম—কাল আবার আসব।"

ব্যস্ত হইয়া উর্মিলা কহিল, "সে কি! তুমি খাবে না?"

"না বউদি, কয়েকদিন ঘুম হয় নি—আজ একটু ভাল ক'রে ঘুমোব। তুমি তো জান, আমি সহজে খাওয়া বাদ দিই নে। কাল আবার যজ্ঞিবাড়ি—অনেক পরিশ্রম আছে।"

"তবে একটু মিষ্টি খেয়ে যাও।"

"তাও আজ থাক্ বউদি। আচ্ছা বউদিদি, না জেনে অপরাধ করলে—ক্ষমা পাওয়া যায় না কি ?"

একটু ভাবিয়া ঊর্মিলা বলিল, "নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা বলছ কেন বরেন-ঠাকুরপো ?"

"সে আর একদিন বলব। বড্ড ঘুম পাচ্ছে বউদি—চললাম।"

"ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করবে না ?"

"দেখা ক'রে যাচ্ছি।"

টলিতে টলিতে বরেন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শশিনাথের ঘরের সম্মুখে গিয়া দ্বারে হাত দিয়া—একটু কি ভাবিল, তাহার পর দ্বার না খুলিয়া অন্যের অলক্ষিতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

২৫

জগতে মানুষের অজ্ঞেয় যতগুলি ব্যাপার আছে—তন্মধ্যে একটি নিরন্তর মানুষের সহিতই বাস করিতেছে—অর্থাৎ তাহার মন। এই মন দিয়া মানুষ তাহার সকল বিষয় জানিয়া লয় ; কিন্তু মনটা যে কি, তাহাই শুধু সে জানে না—পরের নয়, নিজেরও নয়।

এই কথাটাই আজ শশিনাথ ঘটনার মধ্য দিয়া প্রমাণ করিতেছিল। তাহার মনোরাজ্যে যে জিনিসটা একেবারে নাই বলিয়া আজ সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত তাহার বিশ্বাস ছিল, সে জিনিসটা, অর্থাৎ লীলার প্রতি তাহার প্রেম, চিরদিনই যে তথায় ছিল, শুধু তাহাই নহে,—অপরিমিত মাত্রায় ছিল। আবার এমনই বিচিত্র ব্যাপার,—এই প্রেমের সে পরিচয় পাইয়াছিল তখন, যখন দলিতা ফণিনীর ন্যায়

লীলা তাহাকে দংশন করিয়া বিষে জর্জরিত করিতেছিল। সহজ অবস্থায় যে একেবারে সুপ্ত ছিল, আঘাত তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। সুখের দিনে, আদরে-সোহাগে, আরাধনা সাধনায় যাহার সাড়া পাওয়া যায় নাই—সর্বনাশের দিনে দুঃখ-অপমান তাহাকে হাত ধরিয়া সঁপিয়া দিয়া গেল। শশিনাথ সবিস্ময়ে দেখিল এ প্রেম সদ্যোজাত শিশু নহে—বহুদিন হইতেই এ তাহার বক্ষের মাঝে বাসা বাঁধিয়া দিনে দিনে তাহার অগোচরে বাড়িয়াছে।

ঘড়িতে একটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে সকলে নিদ্রিত—কোথাও একটু সাড়াশব্দ নাই, শুধু শশিনাথের বিনিদ্র চক্ষে ঘুম ছিল না। সে তাহার শয্যায় শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সন্ধ্যাবেলাকার কথা ভাবিতেছিল। আজ সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছে! মাধবীলতা আজ সর্প হইয়া দংশন করিয়াছে; চন্দন অঙ্গার হইয়া দগ্ধ করিয়াছে; পুষ্প আজ প্রস্তর হইয়া আঘাত দিয়াছে! মুগ্ধ-বিস্ময়ে মনে মনে সে স্মরণ করিতেছিল লীলার সেই অধীর উত্তপ্ত ভঙ্গী, সেই অভিমান-স্ফুরিত ওষ্ঠাধর, সেই বেদনারক্ত মুখ আর সেই রোষ-প্রজ্জ্বলিত চক্ষু। সে কি ভীষণ অথচ চিত্তাকর্ষক! তাহার চতুর্বিংশ বর্ষের উন্মিষিত চক্ষে একদিনও তো এমন একটি চিত্র ধরা পড়ে নাই, যাহা একই কালে এমন প্রবলভাবে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করে। আজ রজনীগন্ধা গোলাপফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু ইহা তো গেল বাহিরের কথা। তাহার অন্তরের কথাটা যে আরও অনেক বিস্ময়াবহ। যেখানে কোন দিন জলের শীর্ণ ধারাও দেখা যায় নাই, সেখানে আজ এ কিসের আকর্ষণে একেবারে জোয়ার আসিয়া ভাসাইয়া দিল? অগ্নি আজ দগ্ধ না করিয়া সিক্ত করিল, এবং আঘাত আজ নষ্ট না করিয়া সৃষ্ট করিল কেমন করিয়া? শশিনাথ মনে মনে আজিকার ঘটনা এবং তাহার মানসিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিল যে, গভীর আঘাতের দ্বারা লীলা আজ তাহার হৃদয়ের কঠিন আবরণটি ভাঙিয়া যে বীজ-কণিকাটি প্রকাশ করিয়াছে, পরিণত করিবার পথ এবং উপায় আর না থাকিলে তাহাকে

অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে হইবে—নতুবা বর্ধিত হইলে সে নিশ্চয়ই বিষময় ফল উৎপাদন করিবে। কিন্তু যাহা দিয়া ইহাকে রোধ করিতে হইবে, সে সংযম আজ কোথায় গেল, শশিনাথ তাহাই ভাবিতেছিল। সে সংযম তো তাহার চেষ্টার সামগ্রী বা সাধনার ধন নহে; চিরদিন সে অবিচ্ছেদ্য সঙ্গীরূপে অতি সহজে তাহার হৃদয়ে বাস করিয়াছে; কোন দিন তাহার ডাকিয়া সাড়া লইতে হয় নাই; শামুকের পৃষ্ঠাবরণের মত যখনই আবশ্যক হইয়াছে, তখনই সে বিনা প্রয়াসে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার সাড়া লইতে হইতেছে, তাহাকে টানিয়া বাহির করিতে হইতেছে। মূর্ছাতুর লীলাকে শয্যায় শুয়াইয়া দিবার সময়ে তাহার পাংশু-বিবর্ণ ওষ্ঠাধরের প্রতি শশিনাথের মুখ যখন একটা দুর্নিবার আকর্ষণে ঝুঁকিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার নিত্য-সহচর সংযমকে অনেক সন্ধানে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল।

তাহার সংযম তাহাকে সে সময়ে রক্ষা না করিলে ঘটনাটা কি প্রকার দাঁড়াইতে পারিত, নিশ্চল হইয়া শশিনাথ সেই রকম একটা অনির্দিষ্ট অবস্থার কল্পনায় নিমগ্ন হইল; এমন কি, সেই কল্পনা হইতে একটা যেন তরল মিষ্টরস ক্ষরিত হইয়া তাহার উৎসুক চিত্তকে সিক্ত করিতে লাগিল।

খুট্ করিয়া দ্বারে একটা শব্দ হইল। উৎকর্ণ হইয়া শশিনাথ দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল।

"শশিদাদা!"

এক লম্ফে শয্যা হইতে অবতরণ করিয়া দ্বার খুলিয়া শশিনাথ দেখিল, দ্বার-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া লীলা।

"তুমি যে এত রাত্রে লীলা?"

"একটা কথা বলতে এসেছি।"

"আচ্ছা, ভেতরে এস।" বলিয়া লীলাকে ভিতরে লইয়া শশিনাথ দ্বারটা ভেজাইয়া দিল।

হস্ত-সঙ্কেতে একটা চেয়ার নির্দেশ করিয়া শশিনাথ কহিল, "ব'স।"

"বসবার আগে তোমাকে—" বলিয়া লীলার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল; তাহার পর নিমেষের মধ্যে ভূমিষ্ট হইয়া শশিনাথের নগ্ন-পদদ্বয়ে মুখ গুঁজিয়া প্রণামের মত একটা কি করিল। বহু কষ্টে অবরুদ্ধ এক রাশি অশ্রু আর কোনরূপেই তাহাদের উচ্ছ্বসিত আগারে আটকাইয়া রহিল না—শশিনাথের পায়ের উপর একেবারে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি লীলার বাহু ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া স্নিগ্ধ-ব্যথিত কণ্ঠে শশিনাথ কহিল, "ছিঃ লীলা, এত অধীর হচ্ছ কেন? স্থির হও। চুপ ক'রে একটু বসো, এখন কিছুক্ষণ কথা ক'য়ো না।"

এ উপদেশ না দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ লীলার কথা কহিবার শক্তিই লুপ্ত হইয়াছিল। সে চেয়ারের হাতলের উপর দুই বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া নিঃশব্দে কিন্তু উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বক্র রোদন কম্পিত পৃষ্ঠের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শশিনাথ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিতে বা করিতে তাহার সাহস হইল না। প্রতিমুহূর্তেই তাহার মনের শক্তি কমিয়া আসিতেছিল উপলব্ধি করিয়া, কি বলিতে কি বলিবে, কি করিতে কি করিবে, এই আশঙ্কায় সে কোনরূপে নিজেকে সম্বৃত করিয়া এই ভাবের আতস-বাজির দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

অশ্রুর বন্যায় রুদ্ধ আবেগের প্রাবল্য কতকটা কমিয়া গেলে, লীলা তাহার অশ্রু-সিক্ত মুখ শশিনাথের দৃষ্টিপথে তুলিয়া দুঃখকরুণ কণ্ঠে কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর শশিদা। আমি তখন বড় অন্যায় করেছি।"

কি বলিবে এবং কি বলা উচিত ভাবিয়া লইবার জন্য অল্প সময় লইয়া শশিনাথ কহিল, "ক্ষমা কাকে করব লীলা? তোমার ওপর আমার একটুও রাগ নেই—তখনও ছিল না। আমি শুধু এই ভাবছি যে, অন্যায় তুমি করেছ, না, তোমার উপর করা হয়েছে!" সহসা শশিনাথ শঙ্কিত হইয়া চুপ করিল—অসমীচীন কথা আপনিই আসিয়া পড়িতেছিল।

শশিনাথের কথার যথার্থ মর্ম না বুঝিয়া লীলা কহিল, "নিশ্চয়ই আমি অন্যায়

করেছি ; অতবড় অন্যায় জীবনে আমি কখনও করি নি ; কেউ বোধ হয় করে না। তোমার অসীম দয়া আমি ভাল ক'রে শোধ দিয়েছি।"

লীলাকে বাধা দিয়া শশিনাথ কহিল, "অন্যায় তুমি তখন কর নি লীলা —অন্যায় এখন করছ। তুমি আমাকে তখন যে-সব কথা যেমন ক'রে বলেছিলে, খুব আপনার লোকেরই খুব আপনার লোককে তা অমন ক'রে বলবার অধিকার থাকে। কিন্তু এখনও তুমি যা মানিয়ে গুছিয়ে বলতে এসেছ, তা আমার একটুও ভাল লাগছে না। বাস্তবিকই আমাকে তা কষ্ট দিচ্ছে।"

এত বড়-দরের একটা অধিকারে স্বীকার পাইয়া লীলা ক্ষণকাল বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর নতনেত্রে শান্ত-স্বরে কহিল, "তা আমি জানি শশিদা, তুমি সব জিনিস ক্ষমা করতে পার, শুধু ক্ষমা চাওয়াকেই ক্ষমা করতে পার না। কিন্তু সে হ'ল অন্য কথা। আমি শুধু এই ভেবে ম'রে যাচ্ছি যে, চিরদিন তোমার কাছে শিক্ষা পেয়ে এসে আজ আমার এতটা অসংযম হ'ল কেমন ক'রে! ইডেন গার্ডেনেও তো হয় নি!"

ইডেন-গার্ডেনের ঘটনার উল্লেখ করিয়া লীলার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরের এতখানি কথা সে বলিয়া ফেলিবে, ইহা তাহার অভিপ্রায় ছিল না।

উত্তরে শশিনাথ তাহার নিজের মনের আরও অনেকখানি কথা বলিয়া ফেলিল। কহিল, "নিজের মন সব সময়ে ঠিক বোঝা যায় না লীলা —সব সময় সব জিনিস ঠিক ওজন ক'রেও দেখা যায় না। তাই হয়তো সে দিন ইডেন-গার্ডেনে তোমার যে সংযম ছিল, আজ আর তা রইল না। আমি নিজেও আমার মনের পরিচয় দুদিন আগে পাই নি, তাই আজ বুকের ওপর জাঁতার মত একটা দুঃখের ভার বসেছে। এ দুঃখ আঘাত পেয়ে নয় লীলা, আঘাত দিয়ে।"

শশিনাথের এ ভাষা লীলার নিকট আর একটুও দুর্বোধ্য রহিল না। যতটুকু শশিনাথ দেখাইল—লীলা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াই আর তাহার এ বিষয়ে কথা বাড়াইতে একেবারে প্রবৃত্তি হইল না। এত রাত্রে

অযাচিত শশিনাথের ঘরে আসিয়া সুযোগ বুঝিয়া তাহার মনে করুণা জাগাইয়া তাহার ইহজীবনের পরম এবং চরম সৌভাগ্য ভিক্ষা লইয়া ফিরিবে, [illegible] তাহার স্বভাবের মেরুদণ্ড নাই। সন্ধি যদি করিতে হয় তো শশিনাথের ঘরে তো নয়ই—মধ্যে-পথেও নহে, যদি একান্ত হয় তো তাহার নিজের ঘরেই হইতে পারে।

"আমি যে কথা বলতে এসেছি শুনলে না তো শশিদা!"

"কি, বল?" অধীর আগ্রহে শশিনাথ অপেক্ষা করিয়া রহিল।

একটু চুপ করিয়া লীলা কহিল, "তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি, আর তোমাকে জানাতে এসেছি যে, তোমার শিক্ষা একবার নিষ্ফল হয়েছে ব'লে বারে বারে হবে না। অমি বেশ ভাল ক'রে মন ঠিক ক'রে নিয়েছি। আর কখনও আমার অসংযম দেখতে পাবে না।"

"কখনও নয়?"

"কখনও নয়।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

যত বাঁধাবাঁধি করিয়াই শশিনাথ এ আশ্বাস লাভ করুক না কেন, এ আশ্বাসে তাহার মুখ উজ্জ্বল না হইয়া অনেকখানি ম্লান হইয়া গেল। অসংযম যেখানে একটা উদ্দাম আশার পথ খুলিবার চেষ্টায় ছিল, সংযমের ধ্বনি সেখানে কিছুমাত্র উৎসাহ-উদ্দীপনা আনিল না। তবুও শশিনাথকে বলিতে হইল, "বেশ ভাই, বেশ। আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, তোমার সংযম আর শিক্ষা যেন চিরদিন তোমাকে জীবনের সুপথ দিয়ে নিয়ে যায়, কোন দিন যেন কাঁটা-কাঁকর তোমার পায়ে না ফোটে।"

"তা হ'লে চললাম শশিদা।" বলিয়া লীলা প্রস্থানোদ্যতা হইয়াই কি ভাবিয়া গলবস্ত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া শশিনাথকে প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নত-নেত্রে অতি কষ্টে চোখের জল চাপিতে চাপিতে বাহির হইয়া গেল।

পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া শশিনাথ ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সমস্ত দেহ-মন-আত্মা আকুলভাবে লীলাকে আহ্বান করিতে লাগিল—শুধু মুখ দিয়া "শুনে যাও লীলা" এই কয়েকটি কথা বাহির হইল না। তাহার পর যখন লীলার ঘরের দ্বার বন্ধ করিবার শব্দ তাহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সে উন্মত্তের মত মুহূর্তের মধ্যে লীলার রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে উপনীত হইল। ক্ষণকাল তথায় অপেক্ষা করিয়া দ্বারে আঘাত দিতে গিয়া কি ভাবিয়া আবার ঝড়ের মত আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

লীলা তখন বিছানায় শয়ন করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া চোখের জলের বন্যা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাই বোধ হয় শশিনাথের পদধ্বনি শুনতে পাইল না।

এ ঘরে শশিনাথ বাকি রাতটুকু নিদ্রাহীন শয্যায় শুইয়া ছটফট করিয়া ভোরের প্রথম আলো ঘরে প্রবেশ করিতেই উর্মিলার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

২৬

গত রাত্রে সুধীরের সহিত লীলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যুষে বাহিরের ঘরে বসিয়া, সুধীর ও শশিনাথ—দুই বন্ধু গল্প করিতেছিল। সানাইয়ের করুণ সুরে যেন আসন্ন বিচ্ছেদের একটা আর্ত বিলাপ শীত-কালের শুষ্ক-গম্ভীর আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া ফিরিতেছিল। শশিনাথের দুঃখ-দীর্ণ হৃদয়ের নীরব ক্রন্দন তাহার সহিত যুক্ত হইয়া জলে স্থলে পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে কোথাও একটু আশ্বাস সান্ত্বনার কণিকা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাহার উদাস রিক্ত হৃদয়ের মধ্যে একটা সব-হারানো সব-বঞ্চিত হওয়ার রুদ্ধ বায়ু তাহার হৃৎপিণ্ডকে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

সুধীর কহিল, "এমন চমৎকার সানাই কোথা থেকে যোগাড় করলে শশি? কি সুন্দর বাজাচ্ছে! এ যেন আমার মনের সন্ধানটি জানতে পেরে তার সঙ্গে মিলিয়ে মিলনের সুরটি ফুটিয়ে তুলেছে।"

মৃদু হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "সেটা তোমার মনের বাঁশীই বেশি রকম ফুটিয়ে তুলছে। রবিবাবুর সে লাইনটা ভুলে গেলে—'বন-মাঝে কি মন-মাঝে'?"

"তা বটে। আচ্ছা শশি, আর একটি মন-মাঝে বাঁশী আজ কি রকম বাজছে ভাই?"

"সেটা কাল রাত্রে আসল মুখ থেকে জেনে নিয়ো। আমি তো আন্দাজি বলব।"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "বড় সহজ উপায় বললে না ভাই। সে মনখানি ঠিক যেন একটি হিম খাওয়া শক্ত কুঁড়ি—কার সাধ্যি পাপড়ি খুলে দেখে! কাল শুভদৃষ্টির সময়ের ব্যাপার তো তুমি জান না—অতগুলি স্ত্রীলোক ছিলেন,—আধ ঘণ্টা সাধাসাধি ক'রে সকলে হার মেনে গেলেন—সে দুটি চক্ষু আর কিছুতেই খুলল না। আমাদের শুভদৃষ্টি এখনও হয় নি ভাই।" বলিয়া সুধীর সরলভাবে হাসিয়া উঠিল।

শুষ্ক-মুখে কোন প্রকারে একটু হাসি আনিয়া শশিনাথ কহিল, "বিয়ের সময় মেয়েদের লজ্জা একটু বেশিই হয়।"

"সকলের এতটা হয় না। কিন্তু দেখ ভাই, সৌন্দর্যের আধখানা হচ্ছে লজ্জা। রঙের ওপর বার্নিস যে কাজ করে, সৌন্দর্যের ওপর লজ্জারও ঠিক সেই কাজ। তোমাকে আজ যেন একটু মনমরা দেখছি কেন বল দেখি? শরীর বেশ ভাল নেই নাকি?"

অল্প হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "কাল একটু পরিশ্রম গেছে, তাই শরীরটা একটু ভার হয়েছে।"

"বাস্তবিক শশি, কাল তুমি অসাধারণ খেটেছ। আমার অদৃষ্টে সৌভাগ্যের যে মধ্যমণিটি কাল তুমি বসিয়ে দিয়েছ, তার জন্য তোমাকে আর একবার আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

শশিনাথের দেহের মধ্যে শিরায় শিরায় যেন তড়িৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। কহিল, "সে জন্য নিজের অদৃষ্টকেই ধন্যবাদ জানাও। তার মতন অত বড় মিত্র আর অত বড় শত্রু কেউ নেই সুধীর। সে ই তোমাকে রাজা ক'রে সিংহাসনে বসাতে পারে, আবার সে-ই তোমাকে ভিখারী ক'রে পথে দাঁড় করাতে পারে।"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "সেই অজানা পুরুষ কত দূরে আছেন, ধন্যবাদ তাঁর কানে পৌছবে কি না, যখন জানা নেই—তখন ধন্যবাদ তোমাকেই জানালাম। প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা ক'রে অপ্রত্যক্ষকে আরাধনা করা আমি ফাঁকি দেওয়া মনে করি।"

সুধীরের কথার কোন উত্তর দিবার পূর্বেই কালীচরণ আসিয়া কহিল, "ছোট বাবু, মা আপনাকে একবার শিগ্‌গির মাসিমার ঘরে ডাকছেন।"

"তুমি ব'স একটু—এখনি আসছি।" বলিয়া শশিনাথ অন্দরে প্রবেশ করিয়া লীলার ঘরে উপস্থিত হইল।

"কি বলছ বউদিদি?"

লীলার একটা ট্রাঙ্ক খুলিয়া এক রাশ বস্ত্র নিজের সম্মুখে রাখিয়া উর্মিলা বসিয়া ছিল। তাহার মুখ দেখিয়া শশিনাথ উদ্বেগভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বউদি?"

একখানা বস্ত্র উঠাইয়া উর্মিলা কহিল, "দেখ।"

শশিনাথ দেখিল, বস্ত্রের তলায় তাহারই ব্যবহৃত একজোড়া মখমলের চটিজুতা।

বিস্মিত হইয়া সে কহিল, "এ তো আমার পুরোনো চটি, এখানে কে আনলে?"

শুষ্কমুখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে উর্মিলা কহিল, "লীলার ট্রাঙ্কটা গুছাতে গিয়ে তার তলায় দেখলাম এই চটি রয়েছে।"

শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া শশিনাথ দাঁড়াইয়া রহিল— মুখে তাহার কোন কথা আসিল না। একটা অতি কঠিন আঘাতের অভিভূতি হইতে সে নিজেকে কোন প্রকারে বিমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কি দুর্বার অনতিক্রমনীয় জীবন-উৎসকে তাহারা কি দুর্বল বালুকার আবরণে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া শশিনাথের হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

"ঠাকুরপো!"

নীরবে শশিনাথ তাহার কাতর নেত্র উর্মিলার মুখে স্থাপিত করিল।

"এ তো তোমাকেই আটকাতে হবে ঠাকুরপো। তুমি ছাড়া কেউ তাকে সামলাতে পারবে না। সেখানে বিয়ের কনের ট্রাঙ্ক থেকে পুরুষমানুষের ব্যবহার-করা জুতো বেরুলে কি কাণ্ড হবে বুঝতেই তো পারছ?"

উর্মিলাকে অভয় দিয়া শশিনাথ কহিল, "তোমার কোন ভয় নেই বউদি, এ আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। লীলা এখন আছে কোথায়?"

"সুবার ঘরে। সুবা আর সরযূ তাকে সাজাচ্ছে। এখনি সে এ ঘরে আসবে।"

"আচ্ছা, এ ঘরে সে এলে আমাকে খবর দিয়ো। আমি এখন বাইরে চললাম—সুধীরকে একলা বসিয়ে এসেছি। তোমার কোন ভয় নেই বউদি, আমি ঠিক ক'রে দোব অখন।"

বাহিরে আসিয়া শশিনাথ কহিল, "দেখ সুধীর, তুমি তখন লীলার লজ্জার কথা বলছিলে, বাস্তবিকই তার লজ্জা সাধারণ মেয়েদের চেয়ে একটু বেশি। কিন্তু দেখ, যে গাছের তলায় যত সার থাকে, সে গাছে তত ভাল ফল ফলে। স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জাকে তুমি রূপের বার্নিস বলছিলে—আমি তাকে গুণের সার বলছি। অপাততঃ বড় অসুবিধা হচ্ছে মনে ভেবে তুমি যেন এই সারকে গাছের তলা থেকে তুলে ফেলতে চেষ্টা ক'রো না।"

শশিনাথের উপদেশ শুনিয়া সুধীর হাসিতে লাগিল। সে জানিল না, কয়েক

মিনিটের মধ্যে কি আঘাত পাইয়া আসিয়া একটা আসন্ন উদ্যত অশুভের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় শশিনাথ সতর্ক হইতেছে। কহিল, "তোমার ভয় নেই ভাই, আমাকে অতটা মূর্খ মনে করো না।"

শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "না, তা করছি নে। আর তুমি যে তখন লীলার মনকে শক্ত কুঁড়ির সঙ্গে উপমা দিচ্ছিলে, সেটাও খুব ঠিক। এই শক্ত কুঁড়ির ধর্ম কি জান সুধীর? সে খোলে খুব আস্তে আস্তে, কিন্তু ভারি পাকা হ'য়ে খোলে। তার যে দলটি তুমি জোর ক'রে খুলবে সেইটেই কিন্তু দুর্বল হবে। লীলার মনটি যেদিন তোমার কাছে একখানি পদ্মর মত পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠবে সেদিন তুমি বুঝতে পারবে, কি জিনিসের সন্ধান তোমাকে আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু দেরি হচ্ছে মনে ভেবে যদি তুমি সময়ের আগেই অধীর হ'য়ে ওঠ, তা হলে বুঝব যে তোমার জীবনের মধ্যে তোমার নামটাই একটা মস্ত মিথ্যা কথা।" বলিয়া শশিনাথ হাসিতে লাগিল।

হাসিতে হাসিতে সুধীর কহিল, "আমাকে যদি তোমার এত ভয়, তা হ'লে আমার নাম ঠিক বজায় রাখছি কি না, সে পরীক্ষার জন্য মাসে মাসে তোমার কাছে লীলাকে পাঠিয়ে দোব, তুমি পরখ করে দেখো।"

এ কথার উত্তরে পরিহাস করিতেও শশিনাথের সাহস হইল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

কিছু পরে ভিতরে গিয়া শশিনাথ লীলার ঘরে উপস্থিত হইল। লীলা তখন সুসজ্জিতা হইয়া তাহার সুবিন্যস্ত দেহ একটা ঈজি-চেয়ারে হেলাইয়া দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তা করিতেছিল। শশিনাথের আহ্বানে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"লীলা!"

অনুৎসুক নেত্র শশিনাথের প্রতি স্থাপিত করিয়া লীলা কহিল "কি?"

"তোমার কাছে একটা কথা জানতে এসেছি ভাই, ঠিক বলবে তো?"

"কি বল?"

"দ্বিতীয় ভাগ পড়েছ তো?"

"পড়েছি।"

"পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে—কি করা হয়?"

নিরুত্তর হইয়া লীলা অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। শশিনাথের এ পুরাতন স্নেহ-ব্যঞ্জক কথোপকথনের ভঙ্গিতে তাহার চক্ষে জল ভরিয়া আসিতেছিল।

"বল? পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে—কি করা হয়?"

একটু ইতস্তত করিয়া লীলা কহিল, "চুরি করা হয়।"

শশিনাথের অধরপ্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং ঠিক তাহারই অনুপাতে নেত্রপ্রান্ত একটু সিক্ত হইয়া আসিল।

"পরের চটিজুতা না বলিয়া লইলে—কি করা হয় লীলা?"

এবার আর লীলা কথা কহিল না, স্থির নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; শুধু ওষ্ঠাধর একবার ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল—কিসে বলা কঠিন।

একটু সরিয়া লীলার দৃষ্টিপথে আসিয়া শশিনাথ কহিল, "বল না লীলা, পরের চটি না বলিয়া লইলে—কি করা হয়?"

স্থির প্রশান্ত নেত্র শশিনাথের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে লীলা কহিল, "চটিজুতা ফেরত চাও শশিদা?"

"নিশ্চয়ই চাই। ওটা আমার ভারি শখের জিনিস—বিশেষ যত্ন ক'রে রাখতে হবে। কিন্তু পায়ে দেওয়া হবে না।"

"কেন?"

একটু ভাবিয়া শশিনাথ কহিল, "পায়ে দেবার মত ওটা আর কম দামি মনে হচ্ছে না।"

এ পরিহাসের কোন উত্তর না দিয়া লীলা স্থিরভাবে কহিল, "আচ্ছা, চটি তোমার এখনই ফেরত দিচ্ছি। কিন্তু একটু কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার মনটাও কি এখানে আটকে রাখবে মনে করেছ?"

"না, তা করি নি। মনটা দেহের সঙ্গেই যাবে।"

"আচ্ছা, তাই যদি যায় তা হ'লে আমার শ্বশুরবাড়িতে কি ক'রে তোমরা আমাকে আটকাবে? এই ধর, কথার কথা বলছি, যদি সকালে উঠে সব কাজের আগে একটা কাগজে প্রত্যহ তোমার একশো আট নাম লিখি, তা হ'লে কি করবে? রোজ সকালে সেখানে গিয়ে সে কাগজ পকেটে পুরে নিয়ে আসবে? না, আমার দোয়াত কলম কেড়ে নেবে? কি করবে বল?"

লীলার এ কথায় শশিনাথের রহস্যের ভঙ্গি একেবারে এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হইয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। ঊর্মিলার অনুরোধে ব্যাধি নিরাময় করিতে আসিয়া, তাহা যে চিকিৎসার কত বহির্ভূত তাহা বুঝিয়া নৈরাশ্যে ও আশঙ্কায় সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এই অত্যদ্ভুত বচনের উত্তরে সে কি বলিবে, কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া, বিস্ফারিত-নেত্রে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

শশিনাথের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া লীলার মুখে আত্মপ্রসাদের একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"বল না শশিদা, সেখানে তুমি কি ব্যবস্থা করবে?"

এবার শশিনাথ কথা কহিল; বলিল, "আমি জানি নে; কিন্তু তোমার ওপর আমার এই আদেশ লীলা, তুমি সেখানে এ সব ছেলেমানুষি একেবারে করতে পারবে না। বুঝলে?"

হাস্যকুঞ্চিত মুখে লীলা কহিল, "না, ঠিক বুঝলাম না; আমার ওপর সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে এখন কোন্ অধিকারে এত বড় আদেশ করছ?"

"আত্মীয়তার অধিকারে।"

"কিন্তু তোমার সঙ্গে এখন আমার আত্মীয়তা কত সামান্য, তা জান?" আমি তোমার বউদিদির বোন, কিংবা তোমার দাদার শ্যালী, বড় জোর তোমার বন্ধুর—" লীলার কণ্ঠ সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। সে দ্রুত মুখ ঘুরাইয়া কোন প্রকারে চোখের জল সামলাইল!

কে যেন শশিনাথের হৃৎপিণ্ড দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। দুর্দমনীয় চিত্তকে কোন প্রকারে সংযত করিয়া সে কহিল, "আচ্ছা সম্পর্কের কথা ছেড়েই দিলাম। তোমার তো নিজের মনে একটা ন্যায়-অন্যায় ভালমন্দর বিচার আছে? একটা আত্মসম্ভ্রম মানমর্যাদার জ্ঞান নেই কি?"

শশিনাথের বাক্যে লীলার মুখে একটা ঘৃণামিশ্রিত যাতনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে দৃঢ় অথচ বিদ্রূপাত্মক-কণ্ঠে কহিল, "বোধ হয় নেই। থাকলে কি আজ এমন ক'রে সেজে-গুজে পরের বাড়ি যেতে পারতাম!"

"ছিঃ লীলা! এ সব তুমি কি বলছ! কোন উপন্যাসের মধ্যেও এমন সব কথা থাকলে বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হয়।"

"তা আমিও বুঝতে পারছি শশিদা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে দিয়ে জোর ক'রে উপন্যাস করিয়ে নাও তো আমি কি করতে পারি! আমি তো চুপ ক'রেই আছি, কথা কইতে চাই নে; কিন্তু তুমি যে বার বার এসে সাঁড়াশি দিয়ে আমার মুখ থেকে কথা টেনে বার করছ।"

লীলার কথা শুনিয়া শশিনাথ এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে শান্ত কণ্ঠে কহিল, "তোমার কাছে আজ আমার একটা প্রার্থনা আছে লীলা। যদি তুমি কখনও আমার কাছে কোন সুশিক্ষা পেয়ে থাক, কোন দিন যদি আমাকে তোমার একজন শুভানুধ্যায়ী ব'লে মনে হ'য়ে থাকে, যদি কোন সময়ে তোমার উপদেশক মনে ক'রে আমাকে একটুও শ্রদ্ধা ক'রে থাক তো আজ তুমি যাবার আগে তার দক্ষিণা আমাকে দিয়ে যাও। এটা আমাকে অধিকারের ব'লে না দাও তো ভিক্ষের মত দাও ভাই।"

"কি বল?"

"আমাকে এই আশ্বাসটুকু দিয়ে যাও যে, ভবিষ্যতে তুমি নিজেকে আর নিজের অবস্থাকে মনে রাখবে। এ তুমি কিছুতেই ভুলবে না যে, তুমি একজন ভদ্র হিন্দুঘরের মেয়ে। বহু বর্ষের পর বর্ষ আর বহু বংশের পর বংশ ধ'রে যে

সব সংস্কার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার দেহে আশ্রয় নিয়েছে, সেগুলোকে সব রকমে বাঁচিয়ে রাখাই তোমার ধর্ম।"

সহসা লীলা ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ফুঁসিয়া উঠিল,—তাহার দুই চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। একটি ঘন বারুদ স্তূপে যেন শশিনাথ দীপ-শলাকা প্রয়োগ করিয়াছে। বলিল, "আমি এত হীন নই যে, তোমাকে এ আশ্বাস দিয়ে নিজেকে অপমানিত করব। তুমি আমাকে যা মনে কর, তার আমি অনেক ওপরে। দোহাই তোমার শশিদাদা, আর বেশি দেবতাগিরি ফলিয়ো না। এত অহঙ্কার সইবে না—একদিন তোমার নিজেরই ওপর ভেঙে পড়বে।"

"আমি দেবতা, সে কথা তোমাকে কে বললে লীলা!"

"তুমি—তুমি বলেছ। তুমি সাধু, তুমি ঋষি, তুমি দেবতা! স্বর্গের দেবতাকেও তুমি হার মানিয়েছ! একটা অভাগিনীর কথা মনে ক'রে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে দিয়েই তোমার এ দেবত্ব শেষ হোক। তুমি মানুষ হও। তোমার দেবত্ব দিয়ে সে বেচারাকেও যেন গুঁড়ো ক'রো না।"

"কে সে লীলা!"

"আমি জানি নে। আর আমি পারছি নে—আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দাও। তোমার মখমলের চটিজুতো তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি যাব—তার ওপর আর আমার একটুও লোভ নেই"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শশিনাথ বলিল, "তোমার মঙ্গল হোক লীলা।" তাহার পর আর কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরযূর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বরেন সেদিন শশিনাথের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছিল। শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইয়া আলো নিবাইয়া দিয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল। যে আঘাতটা খাইয়া আসিয়াছিল, তাহার বেদনা তখনও বুকের মধ্যে দপদপ করিতেছিল। বাসর-ঘরে অকস্মাৎ বরের মৃত্যু ঘটিলে অবস্থাটা যেমন হয়, তাহার হৃদয়ের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইয়াছিল। বাহিরে তখনও বাঁশী থামে নাই, কিন্তু ভিতরে হৃদয়বিদারক ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।

এই মর্মন্তুদ অনুভূতির মধ্যে কেবল দুঃখেরই বেদনা ছিল না, একটা নিদারুণ নিকৃষ্ট লজ্জা বরেনের বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছিল। সে যখন অসংশয়িত-চিত্তে সরযূর সমক্ষে বিজয়ী প্রেমিকের মিথ্যা রহস্যাভিনয় করিতেছিল, তখন সরযূর মনে নিঃসন্দেহ একটা সকৌতুক করুণা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে সহৃদয়া বলিয়া তাহার সদয় নেত্রে কৌতুককর চপল হাস্যের পরিবর্তে করুণাই হয়তো ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই দুঃসহ করুণাই বরেনের ব্যথিত চিত্তকে তীক্ষ্ণ সূচের মত বিঁধিতে লাগিল। বিপুল আসল টাকা হইতে বঞ্চিত হইয়া দুই পয়সার সুদ হাতে পাইয়া অপমানে তাহার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল।

কিন্তু কোন কোন কীট যেমন বাহিরের আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের দুর্বল ও কোমল দেহাংশকে একটা কঠিন আবরণের মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, বরেনও সেইরূপ তাহার হৃদয়ের অতি গোপনীয় বেদনা ও লজ্জার চতুর্দিকে বিবেচনা ও অভিমানের শক্ত সূতা বুনিয়া বুনিয়া তাহাকে একটা কঠিন আচ্ছাদনে প্রায় অদৃশ্য ও অনধিগম্য করিয়া লইল। তাই লীলার বিবাহের দিন প্রাতে সে যখন আসিয়া নির্বিকারভাবে উৎসবে ও কার্যে যোগ দিল তখন তাহার শান্ত বহিরাবরণের ভিতর যে আগ্নেয়গিরি জ্বলিতেছিল, তাহার সন্ধান কেহ জানিল

না। এমনই অবলীলা-ভরে সে সকল কার্যে নিজেকে প্রয়োগ করিল এবং এমনই স্বচ্ছন্দচিত্তে সে সকলকার রহস্তে সানন্দে যোগ দিল যে, গত রাত্রে যে সে শশিনাথের সহিত দেখা না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, সে কথা শশিনাথের মনেই পড়িল না, এবং উর্মিলার মনে সন্দেহের যে একখণ্ড মেঘ দেখা দিয়াছিল, তাহাও নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধু মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ দুইটি চক্ষের ব্যথিত করুণ দৃষ্টি অলক্ষিতে বরেনের উপর বর্ষিত হইতেছিল। বরেনের ছদ্ম-আচরণ সে চক্ষে কোন প্রকার সংশয় আনিতে পারে নাই।

বিবাহের পরদিনের সকাল হইতে সে একবারও শশিনাথের বাড়ি যায় নাই। অপরাহ্নে আপনার পড়িবার ঘরে বসিয়া কতকগুলা অসম্বন্ধ ও পরস্পরবিরোধী চিন্তা লইয়া সে সামঞ্জস্য ও মীমাংসা হইতে ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় উর্মিলার নিকট হইতে সজোর তলব পড়িল।

একটু ইতস্তত করিয়া অগত্যা সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং শশিনাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্দরে প্রবেশ না করিয়া বহির্বাটি হইতেই সংবাদ পাঠাইল। উত্তরে কিন্তু তাহার অন্দরেই ডাক পড়িল।

দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে বসিয়া উর্মিলা ও সুবাসিনী ফুলশয্যার সামগ্রীর ফর্দ করিতেছিল, এবং সরযূ এক খণ্ড কাগজে উভয়ের নির্দেশ-মত দ্রব্যগুলির একটি তালিকা লিখিতেছিল।

বরেন প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমাকে ডেকেছ বউদিদি ?"

উর্মিলা ব্যগ্রভাবে কহিল, "হ্যাঁ বরেন-ঠাকুরপো, তোমাকে আমার বিশেষ দরকার। বেশ যা হোক তো তুমি, তোমার ওপর আমি নির্ভর ক'রে রয়েছি—আর সমস্ত দিন তুমি ডুব মেরে আছ! ব'স, বলছি।"

আসন গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বরেন কহিল, "সকালে এলেও তো কোন ফল হ'ত না বউদিদি, বর-কনে বিদেয় করতে তোমরা ব্যস্ত ছিলে।"

সুবাসিনী কহিল, "ঠাকুরপো, পকেটে ক'রে কার্ড নিয়ে আস নি ?"

স্মিতমুখে বরেন কহিল, "কেন বল দেখি ?"

"বাইরে থেকে আমাদের পাঠিয়ে দিতে!"

ঊর্মিলা কহিল, "সত্যি বরেন-ঠাকুরপো, এ আবার আজ তোমার কি নতুন কায়দা হ'ল—বাইরে থেকে খবর পাঠিয়েছ! কেন, এ বাড়িতে তোমার তো ভাদ্রবউ কেউ নেই।"

সহাস্যমুখে বরেন কহিল, "না, তা নেই। কিন্তু তোমার দরকারটা কি তা তো বললে না বউদিদি?"

"কাল ফুলশয্যার তত্ত্বে যে সব জিনিস যাবে, তার ফর্দ হচ্ছে। বড় ফর্দটা নিয়ে এঁরা দুই ভাইয়ে বেরিয়েছেন—বাকি জিনিসের ভার তোমার ওপর। কাল বারোটার মধ্যে আমাকে সমস্ত কিনে দেওয়া চাই। কটা জিনিস হয়েছে সরযূ?"

গণনা করিয়া সরযূ কহিল, "পঁচিশটা।"

সুবাসিনী কহিল, "আরও পঁচিশটা হবে ঠাকুরপো।"

"যত পঁচিশই হোক না কেন—আমি গোড়া থেকে এক এক ক'রে কিনে যাব, তারপর বারোটার মধ্যে যতদূর হ'য়ে ওঠে।"

ঊর্মিলা হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে ফর্দটা সেই রকম ক'রে লিখে দিতে হবে—সকলের চেয়ে দরকারী জিনিসগুলো যাতে আগে থাকে।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সুবাসিনা কহিল, "না, তা হবে না বউদি, সমস্ত জিনিস কেনা চাই—এর মধ্যে বাদ দেবার কিছু নেই।" তাহার পর বরেনের দিকে চাহিয়া কহিল, "লীলার বিয়ের কাজ সামলাতেই তোমরা এলিয়ে পড়েছ ঠাকুরপো! তা হ'লে মেজ দাদার বিয়ের কাজ তুলবে কি ক'রে? মেয়ের বিয়ে তো কালিপুজোর রাত্রি—একরাত্রে শেষ; কিন্তু ছেলের বিয়ে যে পনের দিনের ধাক্কা।"

সুবাসিনীর কথা শুনিয়া বরেন হাসিয়া কহিল, "তা উৎসাহও ঢের বেশি মেজ-বউদিদি—পনের দিন ধরে ডান হাতের ব্যাপার চলবে। শশির বিয়ের সময়ে তুমি দেখবে, কাজ করবার শক্তি আমার কি আশ্চর্য রকম বেড়ে যাবে।"

বরেনের এ কথা শুনিয়া মনে মনে প্রীত হইয়া উর্মিলা কহিল, "ডান হাতের ব্যবস্থা করলে যদি তোমার কাজ করবার শক্তি বেড়ে যায়, তা হলে বাজার করতে যাবার আগে আর বাজার ক'রে ফিরে এলে দুবারেরই ব্যবস্থা আমি ভাল রকম ক'রে করছি। কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে যত আস্ফালন বেরোয় বরেন-ঠাকুরপো, তার সিকি খাবার যদি ঢুকত, তা হ'লে বুঝতাম।"

স্মিতমুখে বরেন কহিল, "তুমি আমাকে যে দোষ দিচ্ছ বউদি, তার বিরুদ্ধে এখনই আমি সাক্ষী দিতে পারি।" বলিয়া সরযূর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কৌতুকোজ্জ্বল মুখে কহিল, "আমি আস্ফালন বেশি করি, কি আহার বেশি করি, সে তো আপনি বলতে পারবেন। আপনাদের বিলাসপুরের বাড়িতে আর জগৎ সুরের লেনে দুই জায়গাতেই তো আমি আপনার সামনে পরীক্ষা দিয়েছি। ক ডজন লুচি আর কতটা ক্ষীর, এঁদের বলুন না!" বলিয়া বরেন হাসিতে লাগিল।

বরেনের এই আকস্মিক ও অদ্ভুত প্রশ্নে সরযূ অভিভূত হইয়া পড়িল। শুধু তাহাই নহে; অত্যকার এই নূতন করিয়া 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করার সমারোহের মধ্যে এমন তীব্র এবং নিদারুণ অভিব্যক্তি ছিল, যাহা সরযূর আর্ত দেহ ও চিত্তকে অসাড় করিয়া দিল; তাহার অনায়ত্ত জিহ্বা দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। তিন জোড়া উৎসুক নেত্র এই কৌতুকাবহ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এই অনুভূতি তাহার বিহ্বলতাকে আরও বাড়াইয়া দিল।

তিন জনের মধ্যে বরেনই কিন্তু সরযূর এই সকুণ্ঠ বিমূঢ় ভাবের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিল, এবং এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "বুঝতে পারছি, আপনার মুখ দিয়ে মিথ্যে কথাও বেরুচ্ছে না, সত্যি কথাও বেরুচ্ছে না। আপনিও তো দলেরই একজন, আপনাকে সাক্ষী মানাই আমার ভুল হয়েছিল। আসুক শশি তখন এ কথার মীমাংসা হবে। আপনার মত সাক্ষী জুটলে শত্রুপক্ষকে আর

বেশি কিছু করবার দরকার হয় না। এক সাক্ষীতেই বাজি মাৎ!" বলিয়া বরেন হাসিতে লাগিল।

বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের কৃতজ্ঞতাতেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, সরযূর বিব্রত রক্তিম মুখ ক্ষীণ হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু বিপদ যখন আসে, একা আসে না। শুধু যে বিপদ আবার আসিল তাহাই নহে, এবার আরও বড় হইয়া আসিল। সরযূকে সম্বোধন করিতে বরেন কয়েকবারই 'আপনি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল এবং ইচ্ছাকৃত বলিয়া বোধ হয় প্রতিবারই একটু ঝোঁক দিয়া স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়াছিল। সুবাসিনীর মনোযোগ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার কর্ণে বড় বিসদৃশ ঠেকিল।

ঈষৎ বিস্ময়সহকারে স্পষ্টবাদিনী সুবাসিনী কহিল, "ঠাকুরপো, সরযূ তোমার চেয়ে কত ছোট, তুমি ওকে 'আপনি' বল? ভারি খারাপ শোনাচ্ছে কিন্তু।"

এবার শুধু সরযূরই নয়, বরেনেরও মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সংযত হইয়া সে কহিল, "বয়সই তো 'আপনি' বলবার একমাত্র কারণ নয় মেজ বউদিদি। তোমার চেয়ে তো আমি বয়সে বড়, তাই ব'লেই তো আমাকে তুমি 'আপনি' বল না।"

একটু ভাবিয়া সুবাসিনী কহিল, "কিন্তু সরযূও তো তোমার ছোট বোনের মত?"

"নিশ্চয় ছোট বোনের মত। অথচ তিনি বরাবর আমার সঙ্গে 'আপনি' বলার দুর্ব্যবহার ক'রে আসছেন। আমাকে যদি সরযূ বরেন-দাদা ব'লে ডাকেন, তা হলে আমার আর সাধ্য কি তাঁকে 'আপনি' ব'লে সম্বোধন করি? কিন্তু উনি যদি আমাকে 'বরেনবাবু' ব'লে ডাকেন, তা হ'লে আমি ওঁকে 'তুমি' ব'লে ডাকলে আত্মীয়তা নিয়ে একটু কাড়াকাড়ি করা হয় নাকি?"

বিচারকের মত সুবাসিনী প্রতিবাদিনীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। "তুমি কি বল সরযূ?"

এই প্রমাদ-প্রহেলিকায় সরযূ একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। সুবাসিনীর প্রশ্নে সে যখন একবার নিমেষের জন্য তাহার আরক্ত মুখ ও নত নেত্র উঠাইল, তখন তাহার মুখে কোন অনিরূপেয় কারণে উদ্ভূত ক্ষীণহাস্যের আভাস না পাইলে, দুইটি রমণীর চক্ষে ব্যাপারটা খুবই বিসদৃশ হইয়া উঠিত।

পূর্বের মত এবারও বরেন সরযূকে বিপদ হইতে রক্ষা করিল। কহিল, "উনি আর এ বিষয়ে কি বলিবেন! তা ছাড়া এক হিসাবে ওঁকে দোষ দেওয়াও যায় না। ওঁকে 'তুমি' বলে ডাকবার জন্য উনি আমাকে দুদিন অনুরোধ করেছেন।"

স্মিতমুখে ঊর্মিলা কহিল, "তবে দোষটা তোমারই বেশি।"

"আমারই বা দোষ কই বউদিদি? আমি শুধু এই বলতে চাই যে, 'তুমি' বলতে হ'লে সেটা উভয়ত হওয়া চাই। উভয়ত না হ'লে যে বয়সে ছোট, সে খুব ছোট হওয়া চাই, কিংবা একটা যা হয় কোন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে হওয়া চাই—তা সে সম্পর্ক পাতানো হ'লেও ক্ষতি নেই।"

সুবাসিনী কহিল, "তোমাদের সম্পর্কের দুঃখ তো আর থাকবে না। মেজদাদার সঙ্গে সরযূর বিয়ে হ'লেই সম্পর্ক হবে।"

বরেন হাসিয়া কহিল, "তখন তো ওঁর সঙ্গে আমার কথাই বন্ধ হ'য়ে যাবে।"

বিস্মিত হইয়া সুবাসিনী কহিল, "কেন?"

স্মিতমুখে বরেন কহিল, "তা বুঝতে পারলে না মেজবউদিদি? শশি যে আমার চেয়ে প্রায় এক বছরের ছোট।"

বিস্মিত-স্বরে ঊর্মিলা কহিল, "ভাদ্রবউ?"

বরেনের মুখে শান্ত-হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। "নিশ্চয়ই, নইলে সম্পর্ক আর দাঁড়াল কোথায়?"

ঊর্মিলা হাসিয়া কহিল, "বন্ধুরা সকলে এক বছরের ছোট হ'লে বন্ধুর স্ত্রী ভাদ্রবউ হয় না,—বন্ধুরা সকলে একবয়সী।"

বরেন কহিল, "সে রকম বন্ধুত্ব আমরা রাখি নে। শশি আমার শুধু বন্ধু নয়—ছোট ভাই।"

হাস্যরঞ্জিত মুখে সুবাসিনী কহিল, "তা হ'লে বড় ভাইয়ের বিয়ে আগে হাওয়া চাই। তোমার বিয়ে মাঘ মাসে হবে—তারপর ফাগুন মাসে মেজদার বিয়ে হবে।"

"কিন্তু বিয়ে তো একলা হয় না মেজবউদি, পাত্রী চাই তো।"

"সে ভাবনা তোমার নয়—সে ভাবনা আমরা ভাবছি।"

"কিন্তু তার পরের যা কিছু ভাবনা তো আমার মেজবউদি, তখন তো আর তুমি কোন ভাবনা ভাববে না?"

স্মিত-প্রফুল্ল-মুখে সুবাসিনী কহিল, "পছন্দর কথা বলছ? সে আমি জামিন রইলাম, পছন্দ তোমার হবেই।"

সুবাসিনীর কথা শুনিয়া বরেন হাসিতে লাগিল। কহিল, "স্ত্রীও কি সন্দেশ-রসগোল্লা মেজবউদি যে, যে-দোকানেরই হোক না কেন, মিষ্টি লাগবেই।"

ঊর্মিলা কহিল, "তবেই হয়েছে। তা হ'লে এ মাঘ কেন, কোন মাঘেই হ'য়ে উঠবে না। আমার পছন্দ কি সহজ পছন্দ? এ বিষয়ে আমার পছন্দ সন্দেশ-রসগোল্লার পছন্দর মত মোটেই সস্তা নয়।"

সুবাসিনী কহিল, "মেয়ে আমি দেখে রেখেছি—চমৎকার মেয়ে! আগে মেজদাদার বিয়ে তো হয়ে যাক—তারপর আমি দেখব, মেয়ে দেখে তুমি কত বীরত্ব কর!"

বরেন হাসিয়া কহিল, "বীরত্ব করব কে বললে মেজবউদি? মেয়ে না দেখেই তো ভয়ে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।"

সুবাসিনী কহিল, "মেয়ে দেখলে তখন আনন্দে হৃৎকম্প হবে।"

বরেন হাসিয়া কহিল, "সে পরের কথা পরে হবে, উপস্থিত আমি এখন চললাম। তোমরা ফর্দ ঠিক ক'রে রাখ বউদি। কাল সকালে এসে

আমি ফর্দ নিয়ে যাব, আর তোমার মেয়াদের মধ্যে সব জিনিস কিনে এনে দোব।"

ব্যস্ত হইয়া ঊর্মিলা কহিল, "না, সে হবে না বরেন-ঠাকুরপো, একটু অপেক্ষা কর, আমি ফর্দ শেষ ক'রে ফর্দ আর টাকা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর যখন ইচ্ছে তুমি জিনিস কিনো। তোমায় চা নিয়ে আসি—চা খেতে খেতে ফর্দ হ'য়ে যাবে। সুবা-ঠাকুরঝি, তুমি ততক্ষণ বড় ফর্দ'র ফর্দটা মেলাও না ভাই— আমি চট্ ক'রে চা নিয়ে আসি।" বলিয়া ঊর্মিলা প্রস্থান করিল।

ফর্দ মিলাইবার ব্যাপার আরম্ভ হইবার পূর্বেই কিন্তু সুবাসিনীর তলব পড়িল। একজন পরিচারিকা আসিয়া জানাইল ঝামাপুকুরের বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ি হইতে মেয়েরা বেড়াইতে আসিয়াছেন।

"তা হ'লে ফর্দটা তোমরা দুজনেই মেলাও।" বলিয়া সুবাসিনী আগন্তুকদের অভ্যর্থনার জন্য দ্রুত প্রস্থান করিল।

সহসা এমন করিয়া বরেন ও সরযূ নির্জন হইয়া পড়িবে, সে সম্ভাবনা বা আশঙ্কা উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে ছিল না—তাই তাহারা অকস্মাৎ এই নিরুপায় অবাঞ্ছনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। কথা না কহিয়া নীরবতার দ্বারা সেই বিসদৃশ অবস্থাকে অধিকতর বিসদৃশ করিয়া তোলা হইবে বুঝিতে পারিয়া বরেন কিছু মাত্র সময় নষ্ট না করিয়া কথা কহিল।

"আপনি আপনার ফর্দ থেকে একটা ক'রে প'ড়ে যান—আমি বড় ফর্দতে লাল পেন্সিল দিয়ে টিক দিয়ে যাই।"

বরেনের কথায় ও প্রস্তাবে সরযূ বিশেষ আরাম বোধ করিল; কার্যের অন্তরালে তাহার বিমূঢ়তা ও সঙ্কোচ সহজেই অদৃশ্য হইতে পারিবে। তাহার লিখিত ফর্দখানা হাতে লইয়া সরযূ পড়িতে লাগিল।

"উৎকৃষ্ট গোলাপজল—চার বোতল।"

"এত গোলাপজল এই দারুণ শীতকালে কি হবে? আচ্ছা বলুন, ফর্দটা প্রথমে মিলিয়ে নেওয়া যাক।" বলিয়া বরেন পেন্সিলের চিহ্ন দিল।

"ফেস্-ওয়াশ্—এক বোতল।"

"আচ্ছা।"

"ল্যাভেণ্ডার-ওয়াটার—বড় দু শিশি।"

"আচ্ছা।"

"ভিনোলিয়া ক্রীম্—দুই কৌটো।"

"হ্যাজেলীন—"

বাধা দিয়া বরেন শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "দাঁড়ান, একটা কথা সেরে নিই। দেখুন, ভুল করা মানুষের অন্যায় বটে, কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে সেটাকে সংশোধন না করা তার চেয়েও বড় অন্যায়। সেদিন আমি না বুঝে নির্বোধের মত আচরণ ক'রে আপনাকে একটু বিব্রত ক'রে তুলেছিলাম—সে জন্য আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ব্যাপারটা একটা ভুলকে আশ্রয় ক'রে হয়েছিল। ভুলটা কি, তা আপনার জানাবার দরকার নেই ব'লে বললাম না। যাই হোক, আপনি সে কথাটা এমন কিছুই নয় মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। বলুন, তার পর কি?"

একটু অপেক্ষা করিয়া ঈষৎ কম্পিত-কণ্ঠে সরযূ কহিল, "হ্যাজেলীন স্নো—দু শিশি।"

"দু শিশি।"

"এসেন্স—আট রকম।"

"আট রকম।"

"ফেস্-পাউডার—তিন রকম।"

"তিন রকম। দেখুন, আমার জন্যে আপনি একটুও ভাববেন না। আমি বেশ আছি। ছেলেবেলা থেকেই, আমার স্বভাবটা কি রকম জানেন! সেই যে

এক রকম পুতুল পাওয়া যায়—সব রকম অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকে, শুইয়ে ছেড়ে দিলেও টপ করে উঠে দাঁড়ায়—সেই রকম। সব রকম অবস্থাতেই আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আমার জন্য আপনি ভাববেন না। অন্য কেউ হ'লে আমি এ কথা বলতাম না—আপনাকে জানি ব'লেই বললাম। পরের জন্য আপনি ভারি ভাবেন। বলুন, তারপর কি?"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সরযূ কহিল, "সুবাসিত তরল আলতা—দু শিশি।"

"দু শিশি। কি আশ্চর্য! তরল আলতাও দু শিশি চাই? এক শিশি সুধীরের জন্যে নাকি? সব ছেলেমানুষ মিলে ফর্দ ক'রে এই হয়েছে। ব'লে যান, আগে মিলিয়ে নেওয়া যাক।"

"বড় হাত-আয়না—দুখানা।"

"দুখানা।"

"চিরুনি, ব্রুস, কাঁকুই—দু সেট।"

"দু সেট। একটু অপেক্ষা করুন, একটা কথা বলি। শশিকে আমি কি রকম ভালবাসি, তা আপনি ঠিক জানেন না। দরকার হ'লে তার জন্যে প্রাণ দিতেও আমি কুণ্ঠিত হই নে। সে-ও আমাকে সেই রকমই ভালবাসে। কাজেই বুঝতে পাচ্ছেন, তার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা শুনে আমার কত খুশি হওয়া সম্ভব? এ বেশ হয়েছে—ভারি চমৎকার হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে আমার একটা অনুরোধ আছে—শশি যেন কোন রকমে আমার সেদিন সন্ধ্যের পাগলামির কথা টের না পায়। বিয়ে হ'য়ে গেলে তখন না হয় বলা যেতে পারবে—ভারি একটা হাসির ব্যাপার হবে। বুঝলেন কিনা? আচ্ছা বলুন, আর কি আছে। চিরুনি ব্রুস কাঁকুই—দু সেট। তারপর?"

সরযূ নিরুত্তর দেখিয়া বরেন লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সরযূর মুখ আরক্ত এবং নেত্রপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত—শুধু ঝরিয়া পড়িতেই বাকি।

শান্ত অবিচলিত-কণ্ঠে বরেন কহিল, "আপনার চোখে বোধ হয় কিছু

পড়েছে। বাইরে গিয়ে একটু জল দিন—বেরিয়ে যাবে। আমি ততক্ষণ একাই দুটো ফর্দ মেলাই।"

এমন সময়ে চা-হস্তে সুবাসিনী ঘরে প্রবেশ করিল।

২৮

দীপ্ত ইলেকট্রিক লাইটে ঘর আলোকিত। টেবিলের উপর সরযূর হস্তলিখিত ফর্দখানা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। বরেন তাহার পাঠাগারে একটা চেয়ারে বসিয়া ফর্দটার দিকে চাহিয়া নিবিষ্টমনে চিন্তা করিতেছিল। চক্ষু ফর্দর উপর নিবদ্ধ থাকিলেও মনটা ঠিক তাহার উপর ছিল না, হগ-সাহেবের বাজারের কোন দোকান-বিশেষের উপরও ছিল না। ফর্দ-লেখিকার পিছনেই যে মনটা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নিরন্তর লাগিয়াছিল তাহাও নহে, অথচ বরেনের শান্ত দেহের মধ্যে মনটা অশান্ত হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; চেষ্টা সত্ত্বেও আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া ঠিক নিরুদ্বেগ হইতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে শশিনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটা চেয়ার গ্রহণ করিয়া কপট ক্রোধের ভঙ্গিতে শশিনাথ কহিল, "তোমার হয়েছে কি বল তো?"

স্মিত-মুখে বরেন কহিল, "সহর্ষ-বিস্ময়, কিংবা সবিস্ময়-হর্ষ।"

"কেন শুনি?"

"তোমার বিয়ের খবর শুনে।"

"আমার বিয়ে—কার সঙ্গে?"

"শ্রীমতী সরযূবালার সঙ্গে।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া শশিনাথ হাসিয়া কহিল, "ওঃ, তাই তোমার সহর্ষ-বিস্ময় কিংবা সবিস্ময়-হর্ষ হয়েছে বলছ? আচ্ছা বরেন, কেমন ক'রে এমন একটা মিথ্যা কথা বললে বলতো? তা হ'লে তোমার সবিষাদ-বিদ্বেষ কিংবা সবিদ্বেষ-বিষাদ হয়েছে।"

"আমার ভালবাসা কি তুমি এত অগভীর মনে কর?"

"না তা করি নে বলেই তো বলছি! প্রেমটা যত গভীর হয়, ঈর্ষা ঠিক সেই রকম উত্তুঙ্গ হয়; একটা দিয়ে অপরটাকে ঠিক মাপা যায়। এ মনস্তত্ত্ব মান কি না?"

বরেন হাসিয়া কহিল, "আবার প্রেমটা যত বিস্তৃত হয়, আত্মোৎসর্গের শক্তি তত প্রসারিত হয়। এ মনস্তত্ত্ব মান কি না?"

"কিন্তু তোমার প্রেম যে গভীর বলছ!"

বরেন হাস্যমুখে কহিল, "আমার প্রেম সাগরের মত;—যেমন গভীর, তেমন বিস্তৃত। তা-ও সে শুধু একজনের ওপর নয়।"

প্রত্যুত্তরে শশিনাথ স্মিত-মুখে কহিল, "আর আমার প্রেম হচ্ছে বায়ুরাশির মত;—যেমন উদার তেমনি উদাস। সর্বদা সাগরের জলরাশিকে ছুঁয়ে আছে, কিন্তু কোথাও আটকে নেই।"

উপমাটাকে আরও একটু টানিয়া লইয়া বরেন কহিল, "কিন্তু আমার ধর্ম তো তা নয় ভাই। তোমার মধ্যে ঝড় উঠলে আমার মধ্যেও যে বড় বড় তরঙ্গ উঠতে থাকে।"

শশিনাথ কহিল, "কিন্তু আমি যখন শান্ত আছি, তুমিও তখন প্রশান্ত থাক। তোমার কোন ভয় নেই। উত্তালতরঙ্গ নয়, কিন্তু যথাসময়ে তোমার মাঝে মৃদু-তরঙ্গ উঠবে—আমার ঝড়ে নয়, সরযূর প্রেমের সুন্দর-হিল্লোলে। বুঝলে?"

শশিনাথের এই পরিহাস-বাণী বরেনের ভাল লাগিল না। উপমাটাকে

আর অধিক চালাইবার লোভ সম্বৃত করিয়া সে কহিল, "না শশি, এ তোমার অন্যায় কথা। পরিহাস করতে হয় কর, তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু এ ভাবে সরযূকে নিয়ে আর পরিহাস করা চলে না।"

"কেন, শুনি, সরযূ তোমার স্ত্রী হবে ব'লে নাকি?"

"না। সরযূ তোমার স্ত্রী হবে, স্থির হয়ে গিয়েছে ব'লে।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া শশিনাথ কহিল, "একেবারে স্থির হ'য়ে গেছে নাকি? বাঃ বাঃ! তা তো জানতুম না। এ যে রাম বাদ দিয়ে রামায়ণ! এমন পাকা খবরটি পেলে কোথায়?"

হাসিয়া পরিহাস সহকারে বরেন বলিল, "বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলাম।"

শশিনাথ বলিল, "সূত্র তোমার পাকা কি কাঁচা, রেশমের না পশমের তা জানবার আমার একটুও আগ্রহ নেই। শুনে তুমি আশ্বস্ত হও যে, বিশ্বস্তসূত্র তোমাকে একেবারে বাজে কথা বলেছেন, যার কোন ভিত্তি নেই।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে বরেন কহিল, "ভিত্তি এ কথার খুব দৃঢ় ভাই, এর ইট-পাথর হচ্ছে মৃত্যু-শয্যার প্রতিজ্ঞা, আর চুন-সুরকি হচ্ছে একটি বালিকা-হৃদয়ের অটুট ভালবাসা। এ এত দৃঢ় যে, এর ওপর মিলনের রাজপ্রাসাদ অনায়াসে ওঠানো যেতে পারে।"

মৃত্যুশয্যার প্রতিজ্ঞার উল্লেখে সমস্ত পরিহাসের ভঙ্গি অপসৃত হইয়া শশিনাথের মুখ শুকাইয়া গেল। মুমূর্ষু রোগীর অন্ধকার-হৃদয়ে সান্ত্বনার রশ্মি আনিবার জন্য মিথ্যার যে দীপশিখাটি সে জ্বালিয়াছিল, তাহা সেইখানেই নির্বাপিত না হইয়া ক্রমশ সত্যের এক বিরাট বহ্নির আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া, সে আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিল।

ঈষৎ রুক্ষ-স্বরে শশিনাথ বলিল, "সরযূকে বিয়ে করব ব'লে আমি মৃত্যু-শয্যায় প্রতিজ্ঞা করেছি নাকি?"

বরেন হাসিয়া কহিল, "কি প্রতিজ্ঞা করেছ তা তুমিই জান, আমি তো তা বলতে পারি নে। কিন্তু যদি সে রকম কোন প্রতিজ্ঞা ক'রেই থাক,

তাতে তো তোমার কোন দোষ আমি দেখতে পাই নে। কি রকম অবস্থায় তোমাকে পড়তে হয়েছিল, তা বউদির কাছে শুনেছি; তুমি যে ইচ্ছা ক'রে প্রতিজ্ঞা কর নি, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।"

অসহিষ্ণু ভাবে শশিনাথ কহিল, "না, তুমি তা বুঝতে পারছ না। যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম, তা ইচ্ছা ক'রেই করেছিলাম, বাধ্য হ'য়ে করি নি। কিন্তু কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম? সরযূকে বিয়ে করব? না, একেবারেই তা নয়। আমি শুধু সরযূর ভার গ্রহণ করলাম, তাই জানিয়েছিলাম।"

একটু চিন্তা করিয়া বরেন কহিল, "তা হোক, কিন্তু যাঁকে জানিয়েছিলে আর যাঁদের সাক্ষাতে জানিয়েছিলে, তাঁরা সকলেই তোমার কথায় জেনেছিলেন যে, সরযূকে বিয়ে করবার অঙ্গীকারই তুমি করলে। এ ধারণা সরযূর তখনও হয়েছিল, এখনও আছে।"

শশিনাথ কহিল, "তা হ'লে সে ধারণা সরযূর আর থাকবে না, যখন তোমার সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হ'য়ে যাবে। দোহাই ভাই, গায়ের ব্যথা একটু মরতে দাও, তারপর তোমার বিয়ের ব্যবস্থায় লাগব; অত অধীর হয়ো না। শীঘ্রই তুমি সরযূ-রত্নের অধিকার পাবে।"

মৃদু মৃদু হাসিয়া বরেন কহিল, "অধীর আমি হচ্ছি নে, কিন্তু অধিকার আমি পাই কেমন ক'রে, তুমি যে আগেই পেয়ে ব'সে আছ।"

শশিনাথ কহিল, "তাই যদি হ'য়ে থাকে, তবুও তুমি পাবে।"

"চুরি ক'রে? না, ডাকাতি ক'রে?"

"তার চেয়ে ঢের সহজে। স্বেচ্ছায়, অন্যের বিনা প্ররোচনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমি অধিকারচ্যুত হব।"

স্মিতমুখে বরেন কহিল, "দানসূত্রে নাকি? দোহাই শশি, আর সব জিনিস দান দেওয়া চলে, স্ত্রী চলে না ভাই। তার চেয়ে চুরি-ডাকাতি ক'রে নেওয়া ভাল।"

এই পরিহাসের মধ্যে বরেনের মনের সন্ধান পাইয়া শশিনাথ মনে মনে শুধু অপ্রতিভ নহে, শঙ্কিতও হইল। স্পৃহার বস্তু গ্রহণ করিবার জন্যও বিন্দুমাত্র নত হইতে অভিমানী বরেন স্বীকৃত হইবে না, এই আশঙ্কায় তাহার অধিকারকে নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সে কহিল, "কিন্তু যেখানে দানের বস্তুর ওপর দাতার কিছুমাত্র লোভ বা আসক্তি থাকে না, সেখানে দান গ্রহণ করায় কোন অসম্মান নেই। আমি সরযূর চেয়েও ঢের লোভের জিনিস ছেড়ে দিয়েছি; সরযূর ওপর একটুও লোভ নেই।"

সহাস্যমুখে বরেন কহিল, "আর আমার লোভ কি এতই বেশি মনে কর যে, বিনা অধিকারে গ্রহণ করতেও আমার কোন দ্বিধা হবে না?"

শঙ্কিত চিত্তে শশিনাথ কহিল, "বিনা অধিকারে কেন বলছ? তোমার চেয়ে বেশি অধিকার সরযূর ওপর আর কারও নেই। অন্য কেউ জানুক বা না জানুক, আমি তো জানি সরযূর ওপর তোমার কতখানি ভালবাসা আছে। সেই ভালবাসাই তোমার চরম-অধিকার।"

শান্তভাবে বরেন কহিল, "আচ্ছা মানলাম, সরযূর ওপর আমার ভালবাসার একটা অধিকার আছে। কিন্তু সরযূরও যদি ঠিক সেই রকম ভালবাসার অধিকার তোমার ওপর থাকে, তা হ'লে তুমি কি ব্যবস্থা করতে চাও? কার অধিকারকে বড় করবে? সরযূর না, আমার?"

বরেনের এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শশিনাথ কহিল, "একটা কাল্পনিক অবস্থা নিয়ে মাথা খারাপ ক'রে লাভ কি, যখন এ ক্ষেত্রে অধিকারের কোন লড়াই নেই, অধিকার একমাত্র তোমারই আছে, আর কারও নেই।"

"কিন্তু আছে, যদি প্রমাণ ক'রে দিতে পারি? বউদিদি, মেজ-বউদিদি যদি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন? সরযূ নিজে যদি দাবি করে? তা হ'লে তুমি কি মীমাংসা করবে বল?"

বরেনের এই অসংশয়িত দৃঢ় বাক্য শুনিয়া শশিনাথের মুখ শুকাইয়া গেল। প্রমাণের বাহুল্য ও উৎকর্ষ দেখিয়া তাহার কথার সত্য মিথ্যা লইয়া বিবাদ

করিতে শশিনাথের আর সাহস হইল না। তাহার মনে হইল সরযূ যেন আর শুধু সে নিরীহ নির্বিরোধী সরযূ নহে, সে যেন এখন লীলার মূর্তিমতী অভিশাপ, তাহার প্রেম যেন কর্কশ কঠিন জিহ্বা লেলিহান করিয়া তাহার বিক্ষত হৃদয়ের রক্ত লেহন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

সভয়ে শশিনাথ তাড়াতাড়ি কহিল, "এর আর দ্বিতীয় মীমাংসা নেই বরেন। সরযূকে তুমি বিয়ে করবে—আর তাতেই সরযূ সুখী হবে। তোমার ভালবাসা ব্যর্থ হবার মত সামান্য নয়।"

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বরেন কহিল, "আমার ভালবাসা সরযূকে অসুখী করবার মতও সামান্য নয়। আমার দ্বারা যদি সরযূ অসুখী হয়, তা হলেই বুঝল আমার ভালবাসা ব্যর্থ হ'ল।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শশিনাথের নির্বাক বিস্মিত-বিহ্বল মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বরেন পুনরায় কহিল "আর এ কথাও আমি খুব সহজে তোমাকে বলতে পারি শশি, তুমি সরযূর স্বামী হ'লে তোমার উপর আমার ভালবাসা বাড়বে বই কমবে না।"

শশিনাথকে নির্বাক থাকিতে দেখিয়া বরেন মৃদুহাস্যে কহিল, "চুপ ক'রে রইলে কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না?—ভাবছ ধাপ্পা?"

বরেনের কথা সত্য অথবা ধাপ্পা, শশিনাথ সে কথা একটুও ভাবিতেছিল না। একটি শেষ হইতে না হইতেই কেমন করিয়া আবার একটি নারীহৃদয়-নিষ্পেষণ ক্রীড়া আরম্ভ হইবার উপক্রম করিতেছে, বিহ্বল হইয়া সে তাহাই ভাবিতেছিল। ব্যাধির পুনরাক্রমণে রোগী যেমন অল্পেই নির্জীব হইয়া পড়ে, তেমনি দ্বিতীয় বিপত্তির সূচনামাত্রেই শশিনাথ একেবারে দমিয়া গেল, বিবর্ণমুখে কহিল, "অসম্ভব অসম্ভব। বাস্তবিকই অসম্ভব। তোমরা সকলে মিলে যদি আমাকে পাগল করে তোল, তা হ'লে তোমাদের সঙ্গে চলা একেবারেই অসম্ভব।"

দীর্ঘ আলোচনার পর রাত্রি দশটার সময় শশিনাথ যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন পরস্পরের মনের সংবাদ অবগত হইয়া দুই বন্ধু অতিশয় ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহারা অসংশয়িত বুঝিতে পারিল, অতঃপর সরযূ কাঁটার মত

তাহাদের উভয়ের হৃদয়ের মধ্যবর্তিনী হইয়া শুধু বিঁধিবে—ক্ষতবিক্ষত করিয়া শুধু রক্তপাত ঘটাইবে। শশিনাথ মনে মনে যেমন বিরক্ত হইয়া উঠিল, বরেন তেমনি হইল বিষণ্ন।

২৯

পরদিন সন্ধ্যা। বৈকালে সোমনাথের গৃহ হইতে ফুলশয্যার তত্ত্ব আনিয়া লোকজন খাইয়া বকশিশ পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। প্রত্যুষে সুধীর মোটর লইয়া কোথায় বাহির হইয়াছিল, বেলা তিনটা পর্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই—সন্ধ্যার পর তাহার মোটর আসিয়া দ্বারে লাগিতেই সানাইকার ভূপালী-রাগিণীতে আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল।

মোটর হইতে অবতরণ করিয়া সম্মুখস্থ একজন ভৃত্যকে সুধীর গম্ভীর মুখে কহিল, "সানাই বাজাতে এখন মানা কর্, আর ব'লে দে, আমি না বললে আর যেন না বাজায়।"

একটা তানের মধ্যেই সানাই বন্ধ হইয়া গেল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুলশয্যার সামগ্রী দেখিয়া সুধীর তথায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে বহুবিধ ও বহু মুল্য দ্রব্যরাজি অতি সুন্দর দেখাইতেছিল, বিশেষত পুষ্পের বাহুল্য ও বৈচিত্র্যের তুলনা ছিল না—মনে হইতেছিল, নন্দনকাননের কোন এক অংশ কেহ যেন ছিন্ন করিয়া আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে। একটি প্রশস্ত রৌপ্য-পাত্রের উপর বর ও বধূর বহুমুল্য পরিধেয় ও অপর একটি রৌপ্যপাত্রে উভয়ের জন্য দুইটি মনোরম পুষ্পমাল্য মিলনের অভিসূচনাস্বরূপ পূর্ব হইতেই তাহারা মিলিত হইয়া রহিয়াছে। সুধীর তাড়াতাড়ি সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

ভ্রকুঞ্চিত করিয়া সুধীর কহিল, "এ সব কখন এল ? আজ ফুলশয্যা হবে না, সে খবর পাঠানো হয় নি ?"

বাড়ির পুরাতন সরকার গোবিন্দ অগ্রসর হইয়া ত্রস্তভাবে কহিল, "আপনার চিঠি তিনটার সময় পাওয়া মাত্র তাঁদের বাড়ি সংবাদ পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের বাড়ি যখন আমাদের লোক পৌছয় তখন সেখান থেকে তত্ত্ব রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। তাঁরা বলে পাঠিয়েছেন—ফুল-শয্যার দিনে ফুল-টুল যা দরকারী জিনিস আবার পাঠাবেন ; আর এই চিঠি আপনার নামে দিয়েছেন।" বলিয়া একখানা পত্র প্রদান করিল।

সুধীর পত্র লইয়া পাঠ না করিয়া পকেটে রাখিল। মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না।

সুধীরকে দেখিতে পাইয়া একজন বর্ষীয়সী রমণী—দূরসম্পর্কে সুধীরের মাসী, নিকটে আসিয়া অতিশয় উদ্বেগ ও ব্যস্ততাসহকারে কহিলেন, "সমস্ত দিন কোথায় ছিলে বাবা ? আমি তো ভয়ে ভাবনায় ম'রে যাই—ওমা ছেলে আমার কোথায় গেল ! কুসুমডিঙের সমস্ত উয্যুগ ক'রে ভট্চায্যি মশাই আর আমি পথপানে চেয়ে হা-পিত্যেশে ব'সে আছি—ওমা ছেলের আর দেখা নেই ! আহা, মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছ ! কাজ কর্মের সময়ে এমন অনিয়ম কি করতে আছে বাবা ? সমস্ত দিন মুখে জলও পড়ে নি ?" বিবাহোপলক্ষে সমাগত সমস্ত রমণীগণের মধ্যে ইনি সম্পর্ক-হিসাবে সকলের চেয়ে দূর, কিন্তু বাক্যেও ব্যবহারে ইহাকে মার সহোদরা ভগ্নী বলিয়া গণ্য করিবার সাহসও যেন চলে না—সুধীরের জননী জীবিত থাকিলে তাঁহাকেও বোধ হয় দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হইত।

শেষ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া সুধীর কহিল "কুসুমডিঙে হবে না, সে কথাও তো বলেই পাঠিয়েছিলাম। তবে আর ভাবনা কিসের ?"

চক্ষু প্রসারিত করিয়া মাসী কহিলেন, "ও মা, ভাবনা আবার হবে না ? ছেলের একবার কথা শোন। আমার তো আর অন্য লোকের মত নয়, যে

শুধু পুটলি বাঁধতেই এসেছি—দিদি যে মরণকালে তোমাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছেন। তুমি তখন ছোটটি, তুমি তো জান না বাবা, আমার হাত ধরে বললেন—সদু, আমি চললাম, তুই খোকাকে দেখিস, তোর চেয়ে আপনার আর তার কেউ নেই রে! আমার ভাবনা হবে না তো কি ওই ঘরে ঘরে ব'সে যাঁরা লুচি-মণ্ডা গিলছেন তাঁদের ভাবনা হবে?" তাহার পর কণ্ঠস্বর সহসা অতিশয় মৃদু করিয়া লইয়া সুধীরের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন, "কি আর বলব বাবা, বলতে ঘেন্না করে, আমি দু মিনিট এখান থেকে স'রে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি—তার মধ্যে তিন-চারটে জিনিস হজম হ'য়ে গিয়েছে। কি বলব তোমাকে, আমার প্রাণটা যেন কর্‌কর্ করছে আর ইচ্ছে হচ্ছে বাক্স-প্যাঁটরা খুলে জিনিসগুলো বের ক'রে আনি। তার তো উপায় নেই বাবা, আমার এত সাধের কাজে তুচ্ছ জিনিসের জন্যে নিন্দে কুড়তে তো পারি নে। সয়ে থাকতেই হবে।"

মাতার মৃত্যুর সময়ে সুধীর অল্পবয়স্ক ছিল বটে, কিন্তু এ কথা সে ভাল করিয়াই অবগত ছিল যে, সে সময় সৌদামিনী তথায় উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু সে বিষয়ে তখন কোন প্রকার আলোচনা করিবার আস্থা বা অবস্থা তাহার ছিল না। মাসীর কথার কোন উত্তর দিবার পূর্বেই প্রতিবাদিনী এবং প্রতিদ্বন্দ্বিনী পিসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইনি সুধীরের পিতামহীর মাসতুত ভগ্নীর কন্যা, সুতরাং পিসীমা; এবং হিসাবমত মাসীমার অপেক্ষা নিকট-আত্মীয়া।

সৌদামিনীর প্রতি একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ভোজবাজির মত পরমুহূর্তেই ত্রস্ত উদ্বিগ্ন দৃষ্টি সুধীরের প্রতি স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "কোথায় ছিলে বাছা সমস্ত দিন—আমি তো নিরম্বু কাঠ হ'য়ে ব'সে আছি আর ঠাকুর দেবতার মানত করছি। শরীর ভাল আছে তো?"

উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া পিসীর দৃষ্টিপথ প্রায় রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সৌদামিনী শ্লেষমিশ্রিত-কণ্ঠে কহিল, "সমস্ত দিন নাওয়া খাওয়া নেই, ঘুরে

বেড়ালে শরীর কি ক'রে ভাল থাকে! ও আবার জিজ্ঞেসা করছ কি দিদি? ওর কি এখন যাট হাজার কথার উত্তুর দেবার সামর্থি আছে? চল বাবা, আমার ঘরে গিয়ে একটু বসবে চল, আমি তোমার জলখাবার নিয়ে যাচ্ছি।"

পিসী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "দেখ সদু, তুমি কুটুম্ব-মানুষ, সব কথার মধ্যে তোমার এসে পড়া ভাল দেখায় না। তোমাকে মাথায় করে এনেছি, কাজ হ'য়ে গেলে মাথায় ক'রে রেখে আসব। তুমি কুটুম্ব-মানুষ—কুটুম্বর মত থাক।"

ক্রোধে সৌদামিনীর শুষ্ক দীর্ঘ দেহকাষ্ঠ দীর্ঘতর হইয়া উঠিল। চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, "আমি কুটুম্ব?"

সুধীরের প্রতি শান্ত দৃষ্টি রাখিয়া দৃঢ় অথচ ধীর কণ্ঠে পিসী কহিলেন, "ওমা, কুটুম্ব নও! মাসী কুটুম্ব নয় তো আবার কি! বলি, তুমি প্রিয়নাথের শালি বই তো নও—তাও এক রকম গ্রাম-সুবাদে।"

প্রিয়নাথ সুধীরের পিতা।

পিসীর কথা শুনিয়া ক্রোধে সৌদামিনী চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন। "আমি হলুম কুটুম্ব 'আর তুমি সইয়ের মার বকুল ফুল, তুমি হচ্ছ সগোত্তর জ্ঞাতি! ওরে আমার আপনার জন রে!" বলিয়া সৌদামিনী সমস্ত দেহটা ঝাঁকড়া দিয়ে এমন এবটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিলেন যে, বিরক্ত ও ঘৃণায় সুধীর অন্যদিকে নিশ্চয় মুখ ফিরাইত, যদি না সেদিকে প্রত্যুত্তর-ভঙ্গী-ভরে পিসীর বিশাল বপু অদ্ভুতভাবে স্ফীত হইয়া থাকিত।

সুধীরের তৎকালীন মানসিক অবস্থায় পিসী-মাসীর কলহে কোন কথা কহিতে একেবারেই প্রবৃত্তি হইতেছিল না, কিন্তু ব্যাপারটা যখন এইরূপে সঙ্গতি ও ভদ্রতা হইতে ক্রমশই দূরে যাইতে লাগিল, তখন সুধীর উচ্চকণ্ঠে 'দিদি, দিদি' করিয়া ডাকিল।

আহ্বানে একটি বিধবা, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর, আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কখন এলে সুধীর! কি কাণ্ড বল দেখি। সমস্ত দিন—"

বাধা দিয়া সুধীর বলিল, সে সব কথা পরে হবে দিদি, উপস্থিত তুমি পার যদি তো পিসীমাকে অ'র মাসীমাকে ঠাণ্ডা কর। মিছে কথা নিয়ে ঝগড়া শোনবার আমার শক্তি নেই, ইচ্ছেও নেই।"

সুধীরের কথা শুনিয়া দিদির প্রতি বিশেষ এক অর্থব্যঞ্জক কটাক্ষ-পাত করিয়া সৌদামিনী কহিল, "সত্যিই তো, আমরা ডাইনী, হেমা ডাইনী। সমস্ত দিন ঘুরে ঝালাপালা হয়ে বাছা বাড়ি এল, আমরা বাছাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছি।"

পিসী তাঁহার অতি-স্থূল দেহ হইতে অতি-সূক্ষ্ম অনুনাসিক শব্দ বাহির করিয়া কহিলেন, "ছিঁড়ে খাবার জন্যে বাছা তো ধামা ধামা লুচি ভাজাচ্ছেন, ঘরে ব'সে ব'সে তাই ছিঁড়ে খেলেই তো হয়! কুটুম মানুষ, তোমার—"

"ফের কুটুম ?"—সৌদামিনীর চক্ষুর্দ্বয় বাঘিনীর চক্ষুর মত জ্বলিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গিনী, অর্থাৎ দিদি, সৌদামিনীকে আর অধিক কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া কহিলেন, "মাসিমা, তুমি এই সব বাজে কথায় রয়েছ— ওদিকে রান্নাঘর থেকে যদি অর্ধেক লুচি চুরি যায়, তখন কম পড়লে আমি জানি নে কিন্তু।"

এই আত্মীয়তার আপ্যায়নে মাসি একেবারে জল হইয়া গেলেন; যে অধিকারের স্বত্ব লইয়া পিসির সহিত বিবাদ বাধিয়াছিল, হেমাঙ্গিনীর কথা তাহাতে তাঁহার স্বপক্ষে রায় বলিয়া তিনি মনে করিলেন। বিজয়দৃপ্তনেত্রে পিসির প্রতি অগ্নিবর্ষণ করিয়া, "ঠিক বলেছ মা, আমার কি বাজে কথায় থাকা চলে—আমি চললুম" বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে ছুটিলেন।

সৌদামিনীর এই বিজয়িনীর ভঙ্গিমায় পিসি বিশেষভাবে হতাশ হইবার পূর্বেই হেমাঙ্গিনী কহিলেন, "পিসিমা, তোমাকে তো লুচিভাজার কাছে বসিয়ে রেখে আটকে রাখতে পারি নে। তার চেয়ে ঢের জরুরি কাজের পরামর্শ তোমার সঙ্গে আছে। আমার ঘরটা খুলে রেখে এসেছি, আলগা প'ড়ে রয়েছে। তুমি গিয়ে দু' মিনিট ব'স, আমি এলুম ব'লে।"

সৌদামিনী হইতে উচ্চতর পদমর্যাদা লাভ করিয়া নিমেষের মধ্যে পিসির মন লঘু এবং মুখ প্রফুল্ল হইল। নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য তিনি আর বিলম্ব না করিয়া হেমাঙ্গিনীর ঘরের দিকে চলিলেন।

মাসি ও পিসি উভয়ে প্রস্থান করিলে হেমাঙ্গিনী কহিলেন, "এখন বল তো সারাদিন কোথায় ছিলে, আর কি জন্যেই বা আজ কুসুমডিঙে বন্ধ রইল?"

একটু ইতস্তত করিয়া সুধীর কহিল, "সে কথা তোমাকে সবই বলব দিদি, কিন্তু উপস্থিত আমার সময় একেবারে নেই। এখনই শশিনাথ আসবে, তার আগে আমার একটা জরুরি কাজ সারতে হবে।" একটু দ্বিধা-সঙ্কুচিতভাবে কহিল, "লীলার সঙ্গে নির্জনে আমার একটু কথা কওয়া দরকার—তুমি তার ব্যবস্থা ক'রে এস। যতক্ষণ না আমি এসে তোমাকে বলব, সে দিকে কেউ যেন না যায়। আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি। তুমি ফিরে এসে তত্ত্বর সব জিনিস একটা ঘরে পূরে চাবি দিয়ে রাখ। কাল সব ফেরত দিতে হবে।"

সবিস্ময়ে হেমাঙ্গিনী কহিলেন, "ফেরত দিতে হবে? কেন বল দেখি?"

সুধীরের মুখে গভীর বেদনা ও হতাশা-ব্যঞ্জক হাসি ফুটিয়া উঠিল। "শুধু তত্ত্বই নয় দিদি, তার সঙ্গে কনেও ফেরত দিতে হবে। সে অনেক কথা, পরে সব তুমি জানতে পারবে; কিন্তু শুধু তুমিই, আর কেউ নয়। এখন তোমাকে যা বললাম, যত শীঘ্র পার ব্যবস্থা ক'রে এস।"

আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বা কথা না কহিয়া হেমাঙ্গিনী গভীর-চিন্তিত হৃদয়ে প্রস্থান করিল এবং লীলা যে ঘরে ছিল সে ঘর হইতে আর সকলকে সরাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুধীরকে কহিল, "লীলা তোমার ঘরের পূর্বদিকের ঘরে আছে, তুমি যাও, কেউ সেদিকে যাতে না যায় আমি এখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখব।"

লীলা বসিয়া ছিল, সুধীর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

যে নিদারুণ অথচ অপরিহার্য কথাটা সুধীর ভাবিয়াছিল ঘরে প্রবেশ করিয়াই আরম্ভ করিবে, তাহা তাহার কণ্ঠে এমনই রুদ্ধ হইয়া আটকাইল যে, কিছুক্ষণের জন্য তাহার মুখ দিয়া একটা অন্য কথাও বাহির হইবার পথ পাইল না। অবশেষে কোন প্রকারে নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইয়া কহিল, "আমি একটা অতিশয় অপ্রীতিকর কথা আপনাকে বলতে এসেছি; এ কথাটা যদি আমাকে না বলতে হ'ত, তা হ'লে আমার মত সুখী আজ আর দ্বিতীয় কেউ এ পৃথিবীতে থাকত না। কিন্তু কঠোর অদৃষ্ট আমাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে। সুখের স্বর্গলোক থেকে দুঃখের এমন অতলে আমার মত আর বোধ হয় কেউ কখনও পড়ে নি, এই ভেবে আপনি আমার প্রতি একটু করুণা করবেন; আর যে-কথা বলতে আমার জিভ অসাড় হ'য়ে আসছে, সে কথা শুনে আমাকে নিতান্ত নিরুপায় মনে ক'রে ক্ষমা করবেন।"

সুধীরের সম্বোধনে ও বাক্যে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লীলা কহিল, "কি বলুন?"

মুখ নত করিয়া অতি কষ্টে সুধীর কহিল, "দেখুন আমি আপনার জীবনের পথে প'ড়ে আপনার বড় ক্ষতি করেছি। কিন্তু একান্ত বাধ্য হ'য়ে আমাকে স'রে যেতেই হবে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া লীলা কহিল, "আপনি বেশ স্পষ্ট ক'রে বলুন—আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি নে।"

শুষ্কভাবে সুধীর কহিল, "একটা বিশেষ কোন কারণে আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হ'তে পারে না।"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া লীলা কহিল, "সে সম্পর্ক কি এখনও হয় নি?"

"না, কুশণ্ডিকা না হওয়া পর্যন্ত পুরো বিয়ে হয় না। তা ছাড়া যতটুকু হয়েছে, তা সমাজ আর শাস্ত্রের মতে বাতিল।"

নিবিষ্টমনে একটু চিন্তা করিয়া লীলা কহিল, "সমাজ আর শাস্ত্রের মত পরের কথা—আপনারও মতে কি বাতিল ?"

কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ।"

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে লীলা কহিল, "তবে আমাকে কথানা গাড়ি আনিয়ে দিন—আজ রাত্রেই ফিরে যাব।"

"আজ রাত্রেই ?" সুধীরের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। অসতর্ক-হৃদয় যে গোপন বেদনা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছিল, মধ্যপথে বিবেচনা সহসা তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিল। যৌবনের প্রথম জ্যোৎস্না-নিশীথে সপ্তবর্ষ-নির্মিত অপূর্ব সুবর্ণপাত্র হইতে যে মদিরা পান করিয়া সবেমাত্র সে মোহ-বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার পক্ষে অপেয় জানিয়া মোহ ভাঙিবার পূর্বে হৃদয়ই ভাঙিয়া গেল। তাই অনিচ্ছাতেও তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "আজ রাত্রেই—!"

ধীরে ধীরে লীলা বলিল, "হ্যাঁ, আজই রাত্রেই ;—দেরি করবার তো কোন কারণ নেই।"

মনে মনে ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া সুধীর কহিল, "শশিনাথ এখনই আসছে—সে এলেই আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করব।" একটু ইতস্তত করিয়া নতনেত্রে কহিল, "আমি বড়ই মর্মাহত হয়েছি। যে আঘাতটা আমার হাত থেকে আপনি আজ পেলেন, মনে করবেন না সে আঘাত থেকে আমিই রক্ষা পেয়েছি ; এই কয়েক দিনের সুখ-দুঃখ—দুইই আমার মনে চিরদিন পাশাপাশি গাঁথা থাকবে। আমি একান্ত নিরুপায় হ'য়ে যে-আঘাত আপনাকে দিলাম, আপনি সে জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন—এর মধ্যে আমার একেবারেই কোন হাত নেই।"

মৃদু হাস্যে লীলার অধরপ্রান্ত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। "তবে আর আপনি ক্ষমা চাচ্ছেন কেন?—অপরাধই যখন নেই, তখন ক্ষমা কিসের জন্যে?" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবুও যদি আমার মুখ থেকে ক্ষমা পেলে আপনার মন হাল্‌কা হয় তো আমি বলছি, সর্বান্তঃকরণে আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছি, যে কারণে আপনাকে এই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, সেইটেই এর জন্যে একমাত্র দায়ী—আপনি একটুও না।"

আর্তকণ্ঠে সুধীর কহিল, "কিন্তু আমি তো উপলক্ষ হলাম।"

সুধীরের এই কথার মধ্য দিয়া তাহার চরিত্র ও হৃদয়ের দুর্বলতা অনুভব করিয়া লীলা বিস্মিত হইল। একজন পরিণত পুরুষমানুষ এরূপ অবস্থায় যে এরূপ নাকি-সুরে কাঁদিতে পারে, তাহা দেখিয়া তাহার মনে একটা সবিরক্তি ঘৃণা জাগিয়া উঠিল। যে-একটি পুরুষ চরিত্রের সহিত তাহার পরিচয় ছিল, সেখানে আর যাহাই হউক, এমন অবস্থায় এই বিলাপধ্বনি শুনা যাইত না, সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না।

তাই একটু অবজ্ঞার ভঙ্গিতে সে কহিল, "অন্য কেউ না হ'য়ে আপনি উপলক্ষ হলেন—এই যদি আপনার দুঃখ হয়, তা হ'লে আপনার ক্ষমা চাওয়া আর আমার ক্ষমা করা দুইই নিরর্থক হয়েছে। আপনাকে দুঃখিত করেছি ব'লে আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। তা এ সব বাজে কথার কোন দরকার নেই; আপনি শুধু আমাকে ব'লে যান, কিসের জন্যে এই কয়েক দিনের সমস্ত ব্যাপার পণ্ড হ'ল? আমি শুধু কারণটা জানতে চাচ্ছি, আর কিছু না।"

সুধীরেরর মুখ পাংশু হইয়া গেল। অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সে কথাটা আমি সোমনাথবাবুকে বলেছি। আপনি পরে তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারবেন। আমাকে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করবেন না।"

দৃঢ়স্বরে লীলা কহিল, "কিন্তু সে কথাটা আমি আজ আপনার মুখ থেকেই

শুনে যাব। আমাকে পরিত্যাগ করবার অধিকার যদি আপনার থাকে তো কি কারণে আমাকে পরিত্যাগ করছেন, সে কথা জানবার অধিকার আমারও নিশ্চয় আছে।"

লীলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে সুধীর কহিল, "কথাটা শুনলে আপনি মনে অতিশয় কষ্ট পাবেন, তাই আমি বলতে চাচ্ছি নে। অধিকার-অনধিকারের কোন কথা এর মধ্যে নেই।"

লীলার মুখে আবার বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "শুনেছিলাম আপনি লেখাপড়া অনেক শিখেছেন, কিন্তু এ কথাটা আপনার সে রকমের হচ্ছে না। আপনি আমাকে যে কথা বললেন, হিন্দু মেয়ের পক্ষে তার চেয়ে গুরুতর কথা আর নেই—অথচ কেন সেই কথাটা বললেন, তাই বলতে আপনার আপত্তি! আপনি নির্ভয়ে বলুন—বলতে আপনার যদি কষ্ট হয়, সোমনাথ-বাবুরও তো কষ্ট হ'তে পারে; অথচ বলার কর্তব্য তাঁর চেয়ে আপনারই বেশি।"

সুধীর কহিল, "যে-কথা আপনাকে বলেছি, তার চেয়েও ঢের ভয়ঙ্কর যে-কথাটা বলি নি।"

অবিচলিত কণ্ঠে লীলা বলিল, "তা অসম্ভব নয়, কারণ একটা কথা আপনি কতকটা সহজেই বলেছেন, অথচ অপরটা কিছুতেই বলতে পারছেন না। কিন্তু না বলতে পারার দুর্বলতাটুকু আপনাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে।"

লীলার দৃপ্ত নেত্র দেখিয়া ও দৃঢ় বাক্য শুনিয়া সুধীর নিঃসন্দেহে বুঝিল, এই কঠিন রমণীটিকে কথাটা না বলিয়া তাহার পরিত্রাণ নাই। যে দীপশিখা রশ্মি দান করে, সময়বিশেষে সেই যে আবার দগ্ধ করিতেও পারে, লীলার আরক্ত মুখ দেখিয়া সুধীর তাহা স্পষ্ট বুঝিল। আর কোন আপত্তি করিতে তাহার সাহস হইল না; সে সভয়ে কহিল, "আপনি যদি একান্ত না মানেন তো আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতেই হবে; কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন।"

মৃদু হাসিয়া লীলা কহিল, "বার বার আপনাকে আর কত ক্ষমা করব? আপনার বাড়ি ছেড়ে যাবার সময়ে সেটা একেবারে সেরে যাব। আপনি এখন বলুন।"

লীলার নিকট হইতে দূরে একটা চেয়ার গ্রহণ করিয়া, একটু কাশিয়া সুধীর বলিতে আরম্ভ করিল—

"সোমনাথবাবুর স্ত্রী আপনার সহোদরা ভগ্নী নন। আপনাদের উভয়ের পিতা ছিলেন রামরতন বাঁড়ুজ্জে। তাঁর স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব ক'রে মারা যান। সেই কন্যাটিই সোমনাথবাবুর স্ত্রী। কন্যাটিকে মানুষ করবার উদ্দেশ্যে রামরতনবাবু তাঁর এক দূর সম্পর্কীয়া বিধবাকে নিয়ে আসেন—কিছুদিন পরে এই বিধবার গর্ভে আপনার জন্ম হয়। রামরতনবাবু মৃত্যুর সময়ে আপনাদের দুই বোনকে তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর হাতে সঁপে দিয়ে যান। এঁকে আপনার মা 'দাদা' বলতেন, সেইজন্যেই ইনি মামার পরিচয়ে আপনাদের প্রতিপালন করেন। এ সব কথা হঠাৎ আমি কাল বিকেলে জানতে পারি। তারপর আমি স্বয়ং বিশেষ রকম তদন্ত ক'রে জেনেছি যে, এর মধ্যে কোন কথাই মিথ্যে নয়। আমি ভগবানের নিকট কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করেছিলাম যে, অনুসন্ধানে এ সব কথা যেন মিথ্যা দাঁড়ায়। কিন্তু অদৃষ্ট আমার মন্দ।"

সুধীরের কথা শুনিয়া লীলার মুখ হইতে রক্তের শেষ-বিন্দু পর্যন্ত যেন সরিয়া গিয়া তাহা একেবারে মৃত্যুপাংশু হইয়া গেল। একটা হেয় ঘৃণা ও ধিক্কারে তাহার দেহ ও আত্মা ভরিয়া বমনোদ্রেক হইতে লাগিল। ছি, ছি, ছি, সারা বিশ্বের মধ্যে এ লজ্জা রাখিবার ঠাঁই কোথায়! পথের দীনতম ভিখারীর মতও সে নির্মল নিষ্কলঙ্ক নহে! রক্তের মধ্যে তাহার অশুচি, অস্থির মধ্যে তাহার কলুষ, মাংসের মধ্যে তাহার কলঙ্ক! কোন্ অমাবস্যার অন্ধকার রজনীতে কুটিল মঘানক্ষত্রের প্রভাবে ব্যভিচারের মধ্যে তাহার জন্ম! জননী তাহার কুলটা—বৃন্ত তাহার পাপের মধ্যে নিমগ্ন! সে অস্পৃশ্য, অশুচি,

অশুদ্ধ! লজ্জায় সঙ্কোচে ও অপমানে তাহার মত দৃঢ় চরিত্র নারীরও সমস্ত শক্তি শিথিল হইয়া গেল। মুখে তাহার কোন কথা আসিল না, নির্বাক নিস্পন্দ নত নেত্রে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

কোনদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আকাশে চাঁদ দেখিয়াছ কি? নিঃস্বত্ব নিষ্প্রভ, নিলীন?—কিন্তু শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম? তাহা হইলে মানস-নেত্রে একবার লীলার অপূর্ব মূর্তি দর্শন কর। মুগ্ধ অপলক-নেত্রে সুধীর সেই তেজোহীন সকুণ্ঠ মধুর নেত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল। সমাজশাসন, নিষেধ নির্দেশ ধীরে ধীরে তাহার চিত্তের মধ্যে শক্তি হারাইতে লাগিল, তাহার মনে হইল, পৃথিবীর যাহা কিছু ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, বিধি-বিধান সব এক দিকে, আর অন্য দিকে এই স্নিগ্ধ-করুণ দুঃখ-বিধৌত পুষ্পটি! সমস্ত বর্জন করিয়া বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধর এই পাপপঙ্কের পঙ্কজিনীকে। পঙ্ক হেয়, কিন্তু পঙ্কজিনী তো দেবসেবার বস্তু। তবে কেন এ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতাকে পরিহার করা! কিন্তু তখনই সমাজের ভ্রুকুটি ও তাড়না মনে পড়াতে সুধীর সবলে এই হৃদয়ের দুর্বলতাকেই পরিহার করিল। তাহার আত্মীয়ের পত্রের ভয়-প্রদর্শন মনে পড়িয়া গেল—"এ পত্র পাইয়া সেই অবস্থাতেই গোপনে যদি এই ব্যভিচারিণী কন্যার সম্পর্ক ত্যাগ না কর তাহা হইলে এ কথা সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।" শুধু নিজের পক্ষে নয়, লীলার পক্ষেও সে যে ভয়ানক অবস্থা হইবে। যে অপথের অর্ধপথে সে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে প্রত্যাবর্তনের আর কোন উপায়ই থাকিবে না। তাহার পর সুধীর মনে করিল তাহার বংশমর্যাদার কথা। ঋষিদের সময় হইতে যে বংশের রক্ত নির্মল নিষ্কলুষ হইয়া আসিয়াছে, কোন্ অধিকারে কিসের জন্য সে তাহাকে দূষিত করিবে! সে তাহার মানস নেত্রে যেন স্পষ্ট দেখিল, তাহার পিতৃপিতামহগণ তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—'সাবধান! মোহ-বশে যেন রক্ত দূষিত ক'রো না।'

ধীরে ধীরে সুধীর বলিল, "এখন আপনি বুঝতে পারছেন, আমি একেবারে নিরুপায়।"

মৃদুকণ্ঠে লীলা কহিল, "না, আপনার এতে কোন হাত নেই ; এখন দয়া ক'রে আমাকে শীঘ্র বিদায় করবার ব্যবস্থা করুন। আপনাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার বা বলবার নেই।"

একটু ইতস্তত করিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিল, "আমার কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলবার আছে, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।"

বিস্মিত হইয়া লীলা কহিল, "কি বলুন ?"

"আপনার ওপর আমার কোন অধিকার না থাকলেও, একটা কর্তব্য নিশ্চয়ই আছে। এটা আমার আন্তরিক অনুরোধ,—না রাখলে বাস্তবিকই বড় দুঃখিত হব। আমি কোন ব্যাঙ্কে আপনার নামে পঁচিশ হাজার টাকা জমা ক'রে দিতে চাই, যাতে কতকটা স্বাধীন সচ্ছলভাবে আপনি দিনাতিপাত করতে পারেন। কিংবা যদি মাসে মাসে—"

লীলার আকৃতির অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখিয়া সুধীর কথাটা শেষ না করিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। লীলার পাংশু-মুখে সহসা যেন দেহের সমস্ত রক্ত ছুটিয়া আসিল,—মুখ-চক্ষের রেখা কঠিন হইয়া উঠিল, পর-মুহূর্তেই অভিমানে তাহার নেত্রদ্বয় ছলছল করিতে লাগিল।

"আমি কি এতই হেয় যে, এ কথা বলতে আপনার একটু দ্বিধা বোধ হ'ল না ? আপনি কি মনে করেন টাকা জিনিসটা দেওয়া আর নেওয়া এতই সহজ ?"

অতিশয় অপ্রাতভ হইয়া ব্যগ্রভাবে সুধীর কহিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন— —আমি কখনই সে রকম—আমার উদ্দেশ্য ছিল—অর্থাৎ কিনা আমি বলছিলাম—"

সুধীরকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া লীলা কতকটা স্নিগ্ধকণ্ঠেই কহিল, "তা আমি বুঝতে পারছি ; কিন্তু এটা আপনার মনে থাকা উচিত

ছিল যে, পরপুরুষের বৃত্তিভোগী হ'য়ে থাকার মত লজ্জার কথা মেয়েমানুষের আর কিছু নেই। ও-কথাটা আমার মত স্ত্রীলোক, সংসারে যার কোন জোর নেই, তাকেও বলা উচিত হয় নি। আপনাকে আর আটকে রাখা অনুচিত। সমস্ত দিনের পর বাড়ি ফিরেছেন। আপনি গিয়ে দয়া ক'রে আপনার দিদিকে একবার পাঠিয়ে দিন। আর আমার যাবার ব্যবস্থা হ'লেই আমাকে সংবাদ পাঠাবেন।"

ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুধীর কক্ষ ত্যাগ করিল এবং অল্প পরেই হেমাঙ্গিনী প্রবেশ করিল।

"আমাকে ডাকছ লীলা?"

চেয়ার হইতে উঠিয়া হেমাঙ্গিনীর সম্মুখে লীলা কহিল, "হ্যাঁ। যে-সব গহনা আর কাপড়-চোপড় আমাকে আপনারা দিয়েছিলেন, সেগুলো আমি আপনাকে দিচ্ছি,—আপনি রেখে দিন।"

ব্যগ্রভাবে হেমাঙ্গিনী কহিল, "কেন?"

"সে অনেক কথা দিদি, পরে সব শুনতে পাবেন।"

"তুমি কি কোথাও আজ যাবে?"

একটু ভাবিয়া লীলা কহিল, "হ্যাঁ, আর কখনো ফিরব না দিদি।"

ঘরের দ্বারটা বন্ধ করিয়া লীলাকে দুই বাহু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া হেমাঙ্গিনী কহিলেন, "লীলা, ছেলেমানুষি ক'রো না, বল কি হয়েছে?

হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া লীলা একবার মৃদু হাস্য করিল, তাহার পর তাহার বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুলিতে লাগিল।

সহ্যের একটা সীমা আছেই—এমন কি, লীলার মত শক্ত মেয়েরও।

৩০

ফুলশয্যার তত্ত্ব-পাঠানোর হাঙ্গামা মিটিয়া যাওয়ার পর শশিনাথ তাহার ঘরে এক ঈজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া একটা বই পড়িবার ছলে আরাম করিতেছিল, এমন সময়ে সোমনাথ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সোমনাথের মুখের ভাব দেখিয়া শশিনাথ চমকিয়া উঠিল।

"কি হয়েছে দাদা?"

শশিনাথের পার্শ্বে একটা চেয়ার গ্রহণ করিয়া সোমনাথ এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "লীলার কপাল যে এত মন্দ, তা জানতাম না শশি। তার কপাল একেবারে পুড়েছে।"

ব্যগ্র-বিস্ময়ে শশিনাথ লাফাইয়া উঠিল, "তার মানে?"

তখন সোমনাথ একে একে সকল কথা শশিনাথের কাছে ব্যক্ত করিল। কেমন করিয়া দ্বিপ্রহরে শশিনাথ যখন ফুলশয্যার জন্য একটা কি দ্রব্য ক্রয় করিতে বাজারে গিয়াছিল, তখন সুধীর আসিয়া সোমনাথকে এই ভীষণ দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করে; তাহার পর সুধীর তাহাকে লইয়া একে একে দুই ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করে এবং অনুসন্ধানে তাহাদের উভয়ের নিকট প্রচুর এবং অলঙ্ঘনীয় প্রমাণ পাইয়া কি নিদারুণ আঘাতে বজ্রাহতের মত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসে, সমস্তই বলিল।

শুনিয়া নিস্পন্দ নির্বাক হইয়া শশিনাথ বিহ্বলের মত সোমনাথের দিকে শুধু চাহিল—ভাল মন্দ কিছুই বলিল না। আঘাতের উপর আঘাত পাইয়া আসিয়াছিল। চেতনার মধ্যে যেন একটা জড়তা, বুদ্ধির মধ্যে একটা বিভ্রম আসিয়া পড়িয়াছিল। বহু-দুঃখ-বেদনাপরম্পরার মধ্যে দিয়া যে নাটক তৃতীয়

অঙ্কে উপনীত হইয়াছে, পঞ্চমাঙ্কে তাহার যবনিকা কোন্ নিদারুণ অনর্থের, মহা সর্বনাশের মধ্যে নামিতে থাকিবে, ভীত-চকিত হৃদয়ের মধ্যে সে তাহারই হিসাব করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সোমনাথ কহিল, "আজ সন্ধ্যার পর সুধীর তোমাকে যেতে বলেছে। আসবার সময়ে লীলাকে সঙ্গে নিয়ে এসো।"

সোমনাথের এই কথা শুনিয়া শশিনাথের লুপ্ত-চেতনা ফিরিয়া আসিল। ব্যগ্র হইয়া কহিল, "কেন, সুধীর কি বলেছে লীলাকে ত্যাগ করবে?"

একটু ইতস্ততসহকারে সোমনাথ কহিল, "এ অবস্থায় ত্যাগ না ক'রে আর উপায় কি! ত্যাগ করবে ব'লেই সে স্থির করেছে।"

শশিনাথের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। "কেন? লীলার কোন অপরাধে সে তাকে ত্যাগ করবে? এ কথা যখন সে আগে জানতে পারে নি তখন জানা আর না জানা দুই-ই সমান।"

একটু চিন্তা করিয়া সোমনাথ কহিল, "লীলাকে ত্যাগ না করলে সুধীরকে সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতে হ'তে পারে; অতটা ত্যাগস্বীকার করতে সে রাজি নয়।"

উদ্দীপ্ত হইয়া শশিনাথ বলিল, "কিন্তু লীলাকে গ্রহণ না করলে লীলাকে সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতে হ'তে পারে,—ততটা নির্দয়তা করতে সে খুব রাজি তো?"

সঙ্কুচিত হইয়া সোমনাথ কহিল, "তার নির্দয়তা কেন বলছ শশি? ঘটনা সত্য হ'লে সমাজের মধ্যে লীলার আর স্থান কোথায়?"

সোমনাথের কথা শুনিয়া শশিনাথ চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতে লাগিল। "তা হ'লে তোমার বাড়িতেও তো তার স্থান নেই? দেখ দাদা কলকাতা শহরে ইঁট-চুন-সুরকি রাজমিস্ত্রীর অভাব নেই,—কালই এ বাড়ির মাঝখানে

পাঁচিল পড়বে। তোমার অংশে সমাজের গোয়াল বেঁধো, আমার অংশে লীলা বাস করবে।।"

ক্ষুণ্ণস্বরে সোমনাথ কহিল, "আমি কি তাই বলেছি শশি? এ তোমার অন্যায় রাগ করা।"

বিরক্ত হইয়া শশিনাথ কহিল, "আমি রাগারাগি করতে চাই নে, আর তোমাদের পচা সমাজতত্ত্বের বিষয়ে বক্তৃতা শুনতেও চাই নে, দিতেও চাই নে, আর এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে ব'সে জটলা ক'রে পরামর্শ করতেও চাই নে। আমি চললাম। আমার মাথায় যা আসে, তাই করব।" মুহূর্ত বিলম্ব করিয়া কহিল, "লীলার মার সঙ্গে তুমি দেখা করেছিলে?"

শুষ্ক হইয়া সোমনাথ কহিল, "না।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রেই নিঃসন্দেহ হ'য়ে এসেছ?"

"তা এসেছি, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণ যথেষ্ট পেয়েছি।"

"লীলার মার ঠিকানা জান?"

"জানি।" বলিয়া সোমনাথ পকেট হইতে পকেট-বুক বাহির করিয়া দেখিয়া বলিল, "নিতাই সরকার লেন, সোনাগাছি। নম্বর জানা নেই।"

"নাম?"

"এখনকার নাম মালতী, ওরফে ছোটরাণী।"

এক খণ্ড কাগজে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়া পকেটে ফেলিয়া শশিনাথ প্রস্থানোদ্যত হইল।

সভয়ে সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সেখানে যাবে নাকি?"

দৃপ্তস্বরে শশিনাথ কহিল, "হ্যাঁ, যাব। তার পর তার চেয়েও খারাপ জায়গা সুধীরের বাড়ি যাব।"

চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সোমনাথ শশিনাথের হাত চাপিয়া

ধরিয়া ব্যথিত-কাতরকণ্ঠে কহিল, "দেখ শশি, তুমি লীলাকে ভালবাস তা আমি জানি, কিন্তু আমিও তার শত্রু নই,—তার একটা ভাল রকম ব্যবস্থা আমরা করবই। তুমি অধীর হ'য়ে অবিবেচনার কোন কাজ ক'রো না। তাতে সকলের চেয়ে লীলারই ক্ষতি বেশি হবে। বিপদের সময়ে বুদ্ধি স্থির রাখতে না পারাও একটা মস্ত বিপদ!"

শশিনাথের মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "সে ভয় কোরো না দাদা,—আর আমার দ্বারা লীলার কোন ক্ষতি হবে না। এর আগে তোমাদের কথা না শুনে তার যে ক্ষতি করেছি, তার জন্যে যদি তোমার সামনে নাকে খৎ দিতে বল তো এখনই দিচ্ছি; কিন্তু আর কোন ক্ষতি হবে না। সে তোমার ভাদ্রবউ হবে, আমি তাকে বিয়ে করব।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে ও উদ্বেগে সোমনাথের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মুখ দিয়া প্রতিবাদ বা অসন্তোষের অন্য কোন কথা বাহির না হইয়া শুধু বাহির হইল, "তুমি!"

"হ্যাঁ, আমি।"

সোমনাথ আর কিছু না বলিয়া আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল।

শশিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কথা বউদিকে জানিয়েছ দাদা?"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া সোমনাথ জানাইল, জানাইয়াছে।

আর কিছু না বলিয়া শশিনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া ভৃত্যকে অবিলম্বে গাড়ি প্রস্তুত করিবার হুকুম দিয়া ঊর্মিলার উদ্দেশে চলিল।

ঊর্মিলা নিজের ঘরেই ছিল। "বউদি আছ?" বলিয়া শশিনাথ প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাত্রের আলোকেও ঊর্মিলার চক্ষু জবাফুলের মত লাল দেখাইতেছে। যে নিষ্ঠুর বেদনা তাহার চিত্তকে নির্দয়ভাবে মথিত করিয়াছে, মুখে তাহার সমস্ত কাহিনী অঙ্কিত।

"এ সংবাদ কি এতই ভীষণ যে, এত কেঁদেছ বউদি?"

সজল ব্যথিত দৃষ্টি শশিনাথের মুখের উপর রাখিতেই উর্মিলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির না হইয়া চক্ষু দিয়া নীরবে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহার অন্তরের গভীর বেদনার কাছে বাক্য খাটো হইয়া অন্তরেই রহিয়া গেল

"কেন কাঁদছ বউদি? নিয়তি কপালে যতটুকু লিখেছে, কেউ তা ঠেকাতে পারে না—তুমিও না, আমিও না। লীলাকে আমরা যেমন জোর ক'রে বিদায় করেছিলাম, তেমনি জোরের সঙ্গে সে আবার ফিরে আসছে,—বাইরে যাওয়ার সকল সম্ভবনা সে কাটিয়ে দিয়েছে! সে ভারি অভিমানী; দেখো বউদি, কোন রকমে যেন সে মনে কষ্ট না পায়!"

অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে উর্মিলা কহিল, "আমি আর কি বলব ভাই. দয়া ক'রে তাকে পায়ে একটু স্থান দিয়ো। সে বড় দুঃখিনী।"

উর্মিলার কথায় ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়া শশিনাথ কহিল, "হৃদয়টা আমার কি একদিনও দেখতে পাও নি বউদি যে, পায়ে স্থান দেবার কথা বলছ? সে কি এত সামান্য, এত অবহেলার সামগ্রী যে, দয়া ভিন্ন সে আর কিছু পেতে পারে না? তা আবার তাদের কাছ থেকে—যারা তার ক্ষমা পাবার যোগ্য নয়, এত অত্যাচার করেছে!"

উর্মিলার অশ্রুসজল চক্ষে কৃতজ্ঞতার রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "তা আমি জানি ঠাকুরপো, তুমি ভিন্ন তার আর কেউ নেই।"

মৃদু হাসিয়া শশিনাথ কহিল, "ঠিক উল্টো বলছ বউদি, সে ভিন্ন আমার আর কেউ নেই,—তাই আমার কাছ থেকে এত দুঃখ পেয়ে আবার আমারই কাছে সে ফিরে আসছে—তোমরা তাকে দয়া করতে হয় ক'রো—কিন্তু সে আমাকে দয়া করবে কি-না তা জানি নে।"

শুনিয়া উর্মিলার চক্ষে আবার অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কহিল, "সে আবার দয়া করবে কি ঠাকুরপো? আর কি তাকে আগেকার তেজে দেখতে পাবে? সে এবার এসে, আর কাউকে তার মুখ দেখাবে না, এক দিকে মুচড়ে ভেঙে পড়ে থাকবে।"

শশিনাথের মুখ আবার কঠিন ভাব ধারণ করিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "কেন বল তো? কার ভয়ে? তুমি যদি বোন ব'লে তাকে অস্বীকার কর, তোমার বোন বলে সে যদি এ বাড়িতে পূর্বসম্মান না পায়,—তাতে কিছু এসে যাবে না। এবার সে এ বাড়ির বউ হ'য়ে থাকবে,—তোমার জা হ'য়ে সে এবার সম্মান পাবে।"

"সে কি ঠাকুরপো?"—বিস্ময়ে ও ভয়ে ঊর্মিলার নেত্র প্রসারিত হইয়া উঠিল।

"যা বলছি, ঠিক তাই; এর মধ্যে আর অন্য কোন কথা নেই। তোমার ওপর যদি একটুও স্নেহের দাবি করতে পারি, তা হ'লে আজ আমাকে এই আশীর্বাদ কর বউদি যে, সে যেন আমাকে গ্রহণ করে,—আমার অপরাধের দণ্ড সে যেন নিজের হাতে না দেয়! আমি তাকে খুব চিনি,—আর বড় ভয় করি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে ঊর্মিলা কহিল, "না, না, ঠাকুরপো, এ ব্যাপার এখানেই শেষ হোক; একে আর বাড়িয়ে তুলো না। কেউ কারু কিছু করতে পারে না ভাই; সকলেই নিজের নিজের কপালে ভোগ করে। লীলার কপালে বিধাতা সুখ লেখেন নি, তাই সে কষ্ট পাচ্ছে। লীলার জন্যে সরযূকে অসুখী কোরো না ঠাকুরপো—সে তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না।"

"তা আমি জানি নে বউদি, আমিও লীলাকে ছাড়া আর কিছু জানি নে। সরযূ আমার কেউ নয়; সে কষ্ট পায় তো নিজের কপালেই কষ্ট পাবে। লীলাকে সুখী করবার জন্যে আমি তত ব্যস্ত হই নি—যত নিজের জন্য হয়েছি, লীলা ভিন্ন আমার পরিত্রাণ নেই। আমি এখন চললাম তাকে আনতে। সে এলে তোমরা যেন কোন রকমে তার মনে কষ্ট দিয়ো না।"

ঊর্মিলাকে আর কোন কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া শশিনাথ বাহির

হইয়া গেল। ঊর্মিলা কাঠের পুতুলের মত জড় হইয়া তথায় বসিয়া রহিল। একটা ব্যাধির উপর আর একটা গুরুতর ব্যাধি আসিয়া পড়িলে যেমন পূর্ব ব্যাধির প্রকোপ কমিয়া যায়, তেমন বিস্ময় ও আশঙ্কার নিকট ঊর্মিলার দুঃখের অনুভূতি কমিয়া গিয়াছে।

সোমনাথ ঘরে প্রবেশ করিল। সে ধীরে ধীরে ঊর্মিলার নিকট আসিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া কিছুক্ষণ নির্বাক রহিল; তাহার পর মৃদুভাবে ঊর্মিলার দেহ নাড়া দিয়া ডাকিল, "ঊর্মিলা!"

ক্লান্ত-কাতর চক্ষে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঊর্মিলা নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। মুখ দিয়া তাহার কোন কথা বাহির হইল না।

"শশি তোমার কাছে এসেছিল?"

মৃদুস্বরে ঊর্মিলা কহিল, "হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সোমনাথ কহিল, "শশির বড্ড লেগেছে।" একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "কিন্তু ভয় হয়, কোন রকম একটা অনর্থ না ঘটিয়ে বসে! যে রকম সে ঝুঁকি!"

কোন উত্তর না দিয়া চিন্তাবিষ্ট হইয়া ঊর্মিলা স্তব্ধ হইয়া রহিল।

"ঊর্মিলা!"

"কি?" ঊর্মিলার উৎসুক-দৃষ্টি সোমনাথের মুখের উপর নিবদ্ধ হইল।

"শশি বলে কি জান? বলে, লীলাকে বিয়ে করবে। দেখ দেখি, এ কি ছেলেমানুষি কথা!"

কোন কথা না বলিয়া ঊর্মিলা চুপ করিয়া রহিল।

মনে মনে একটু ব্যস্ত হইয়া সোমনাথ কহিল, "তুমি কি বল?"

"কি বলব বল?"

"এই লীলাকে শশির বিয়ে করবার কথা? সেটা কি ভাল ব'লে তোমার বোধ হয়?"

"না।"

মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া সোমনাথ কহিল, "আমারও ঠিক তাই মত। স্রোতের বিরুদ্ধে গেলে যেমন ক্রমশ ক্লান্ত হ'য়ে ডুবে যেতেই হবে, তেমনি সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করলে অবশেষে সর্বনাশ হবেই। লীলার জন্যে আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু সুখের পথে তাকে জোর ক'রে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলেই সে সুখী হবে না। তাতে তাকে আরও কষ্ট দেওয়া হবে।"

উদাস-শূন্য দৃষ্টিভরে উর্মিলা চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। মানুষের চেয়ে সমাজ বড়, না, সমাজের চেয়ে মানুষ বড়—এই দুরূহ সমস্যার কঠিন আবরণের উপর তাহার দুঃখ-দ্রব মন কেবলই আঘাতের পর আঘাত খাইতেছিল, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। স্বামীর কথায় এবং নিজের ধারণায় সমাজকে উচ্চ মনে হইলেও ভগ্নীর দুঃখ-বেদনাকেও একেবারেই নগণ্য মনে হইতেছিল না। শশিনাথের বাক্যের প্রভাব হইতে তখনও তাহার মন সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই।

"উর্মিলা!"

"বল।"

"শশি যদি কারু কথা শোনে তো একমাত্র তোমারই কথা শুনবে। তুমি তাকে বোঝাবার একটু চেষ্টা ক'রো; এ বিপদ থেকে তুমি তাকে বাঁচিয়ো। বল, আমার এ কথা তুমি রাখবে? সুধীর যদি নিজের বংশ-মর্যাদার জন্যে একটা ত্যাগস্বীকার করতে পারে তো আমাদের বংশই বা তার চেয়ে কি কম যে, আমরা তাকে কলুষিত করব! বল, তুমি এ বিষয়ে চেষ্টা করবে?"

পাংশুবদনে, নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে উর্মিলা কহিল, "করব।"

"বেশ। আর লীলাকেও তুমি এ কথা বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়ো। সে বুদ্ধিমতী, সে কখনই নিজের সুখের জন্য একটা পরিবারকে বিপন্ন করতে চাইবে না—এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি। তা ছাড়া তার জীবিকার ব্যবস্থা সে তো আমরা—"

সোমনাথকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া ঊর্মিলা কহিল, "আমি নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারছি, লীলাকে এত বোঝাবার দরকার হবে না—সে আমার সহোদরা বোন না হ'লেও এক রক্ত তো আমাদের দুজনেরই শরীরে আছে। সে কখনই নিজেকে এতটা—" ঊর্মিলার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না—চোখ ফাটিয়া দুর্জয় অভিমানের অশ্রু টপটপ করিয়া ঝরিতে লাগিল।

ব্যথিত হইয়া ব্যগ্রভাবে সোমনাথ কহিল, "কাঁদছ কেন ঊর্মিলা? আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিলাম? তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে তো আমি কোন কথা বলি নি!"

সহসা নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইয়া কাতর অথচ দৃঢ়ভাবে ঊর্মিলা বলিল, "আমি তোমার সব আদেশ রাখব—কিন্তু আমার একটা কথা রাখবে? আমার একটা কথার জবাব দেবে?"

কৌতূহলের সহিত সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

স্বামীর মুখের উপর স্থির শুষ্ক দৃষ্টি রাখিয়া ঊর্মিলা কহিল, "আমি যদি লীলার সহোদরা বোন হতাম, তা হ'লে আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে? আমাকে রাখতে, না ত্যাগ করতে?"

ঊর্মিলার কথা শুনিয়া সহসা সোমনাথের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সত্রাসে কহিল, "এ কথা কেন ঊর্মিলা?"

ঊর্মিলা উঠিয়া স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তাই জিজ্ঞাসা করছি, সত্যি বল না কি করতে? ত্যাগ করতে?"

এক মুহূর্ত স্ত্রীর উৎসুখ-ব্যগ্র মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সোমনাথ কহিল, "তোমাকে ত্যাগ না করলেও সমাজ ত্যাগ করতাম, আর অপবিত্র সন্তানের মা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে তোমাকে রক্ষা করতাম। সমাজের মধ্যে কখনও ব্যভিচার আনতাম না। সমাজ থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার সকলের আছে কিন্তু সমাজকে নষ্ট করবার অধিকার কারও নেই।"

কম্পিত-কণ্ঠে উর্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "আর বিয়ের ঠিক আগে যদি জানতে পারতে, তা হ'লে?"

"তা হ'লে কখনই তোমাকে বিয়ে ক'রে তোমার আর আমার দুজনের জীবন বিড়ম্বিত করতাম না।"

তীক্ষ্ণ-বিহ্বল-নেত্রে উর্মিলা কহিল, "সমাজ কি এতই ভয়ের জিনিস?"

শান্ত-কণ্ঠে সোমনাথ কহিল, "সমাজ এতই ভালবাসার বস্তু। তার জন্যে সব রকম ত্যাগ স্বীকার করা যায়। কিন্তু তুমি তো পবিত্র উর্মিলা, তুমি—ও কি, ও কি! অমন করছ কেন?

"ও কিছু না—বুকের মধ্যে কেমন ধড়ফড় করছে।" বলিয়া উর্মিলা ধীরে ধীরে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

ব্যাকুল আবেগে সোমনাথ উর্মিলার দুটি হাত চাপিয়া ধরিল; মুখ দিয়া তাহার কোন কথা বাহির হইল না।

৩১

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শশিনাথ তাহার এক বন্ধু..বিপিনের উদ্দেশে চলিল। বিপিন স্কুলে বরাবর ও কলেজে দুই-তিন বৎসর শশিনাথের সহপাঠী এবং কতকটা অন্তরঙ্গ ছিল। তাহার পর একদিন সে বাণীর উপাসনা ত্যাগ করিয়া আর্ট-স্কুলে প্রবেশ করে এবং চিত্রকলার চরম উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে সে যখন ক্রমশ আর্ট-স্কুলের নির্জীব মডেলে তৃপ্ত না হইয়া সজীব মডেলের পশ্চাতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন হইতে শশিনাথের সহিত তাহার কারবার অনেকটা কমিয়া যাইলেও সংস্রব একেবারেই ছিন্ন হয় নাই। বিপিন

লজ্জায় ও সঙ্কোচে শশিনাথকে এড়াইয়া চলিত, শশিনাথ কিন্তু তাহার এই সৌন্দর্য-পিপাসু পথভ্রষ্ট বন্ধুটির শিল্প-লালসা কিছু মন্দীভূত করিবার জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ হাঙ্গামা বাধাইত। কিন্তু অবশেষে যখন দেখা গেল যে, বিপিন আর্ট-স্কুলের শিক্ষামন্দির একেবারে ত্যাগ করিয়া মডেল-মন্দিরেই সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় লইল, তখন হইতে শশিনাথ ভগ্নোত্তম হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

পথে যাইতে যাইতে শশিনাথের মন অনেকটা বালকা হইয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, পাপ যেন শেষ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে,—এবং অদূর–ভবিষ্যতের কোন এক রজনীতে যেদিন শঙ্খ–হুলুধ্বনির মধ্যে তাহার এই প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত সাঙ্গ হইবে, সেদিনকার অপূর্ব চিত্র মনের মধ্যে আঁকিয়া তাহার মন যেন দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। বহু দিবসের একখানি স্নেহমণ্ডিত অশ্রু-সজল অব্যক্ত-কাতর মুখ তাহার মুদ্রিত নেত্রের কৃষ্ণপটের উপর আজ যেন সলজ্জ-প্রিয়ার মধুর হাস্যে ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বর্ষার পর রৌদ্রের মত, অশ্রুর পর হাস্যের এই মধুর ও করুণ কল্পনা তাহার ব্যথিত চিত্তকে ক্রমশ মুগ্ধ করিতেছিল।

বিপিনের গৃহে উপস্থিত হইয়া শশিনাথ ভিতরে সংবাদ পাঠাইয়া দিল। নিশা-ভ্রমণের জন্য বিপিন তখন সজ্জিত হইতেছিল। কে একজন ভদ্রলোক তাহাকে অন্বেষণ করিতেছে সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া শশিনাথকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।

"পথ ভুলে না কি হে?"

স্মিতমুখে শশিনাথ কহিল, "পথ ভুলে নয়, কিন্তু ভুল-পথে বটে। এখনই আমাকে সোনাগাছির একটা বাড়িতে যেতে হবে। সে পথের তুমি পথিক, তাই তোমার সঙ্গী হবার জন্যে এসেছি। চল, আর দেরি ক'রো না।"

কথাটা যে ষোল আনাই পরিহাস, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ না রাখিয়া বিপিন

বলিল, "কেন, রাতারাতি সোনাগাছিকে উদ্ধার করতে? তোমার মিশনের সেও একটা উদ্দেশ্য না কি? জায়গাটা কিন্তু তেমন সুবিধার নয় হে, ছবি আঁকতে যাওয়ার পক্ষেও নয়, নীতি প্রচার করতে যাওয়ার পক্ষেও নয়।"

কিন্তু পরিহাসের ভঙ্গি পরিত্যাগ করিয়া শশিনাথ যখন তাহাকে পুনরায় সনির্বন্ধ আহ্বান করিল, তখন বিপিন বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ব্যস্ত হইয়া শশিনাথ কহিল, "চল, চল। আমার দেরি করবার মত সময় নেই।"

"সোনাগাছি কার বাড়ি যাবে?"

পকেট হইতে কাগজের টুকরা বাহির করিয়া শশিনাথ কহিল, "মালতী ওরফে ছোটরাণীর বাড়ি।"

"ঠিকানা কি?"

"নিতাই সরকারের লেন।"

"নম্বর?"

"তা জানা নেই। তা জানা থাকলে আর তোমায় কাছে আসব কেন?"

একটু ইতস্তত করিয়া বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি দরকার?"

"তা বলব না। যতটুকু আমার কাছ থেকে জানতে পারবে, তার বেশি কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না।"

শশিনাথের কথা কহিবার ধরন দেখিয়া বিপিনের আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না, বলিল, "চল খুঁজে বার ক'রে দিচ্ছি।"

সোনাগাছি পৌঁছিয়া একটা পানওয়ালার দোকানের সম্মুখে গাড়ি দাঁড় করাইয়া বিপিন পানওয়ালাকে বলিল, "নিধিকে ডেকে দে তো রে।"

অবিলম্বে নিধি অর্থাৎ নিধিরাম আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জাতিতে উড়িয়া এবং ব্যবসায়ে দালাল। বিপিনকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া কহিল, "কি বাবু, কি হুকুম করছেন?"

বিপিন কহিল, "হ্যা রে নিধে, নিতাই সরকারের লেনে মালতী কোথায় থাকে জানিস ?"

"কে ! ছোটরাণী-দিদি ?"

"হ্যাঁ।"

"চলুন, নিয়ে যাই।" তাহার পর শশিনাথের দিকে মুহূর্তের জন্য একবার চাহিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "আমার ফি-টে ?"

ধমক দিয়া বিপিন বলিল, "চল্ হতভাগা, সে হবে অখন।"

কথাটা বুঝিতে পারিয়া শশিনাথ পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিল।

একটা দ্বিতল বাড়ির সামনে গাড়ি থামাইয়া নিধি বলিল, "আসুন।"

বিপিন কহিল, "তুই গিয়ে দেখে আয়, আর যদি লোক থাকে তো সরিয়ে দিয়ে আয়।"

নিধি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দিদিমণি আপনাদের ডাকতে বললেন—ঘরে কেউ নেই।"

শশিনাথ অবতরণ করিল এবং তাহার পশ্চাতে বিপিন অবতরণ করিতেছিল। বাধা দিয়া শশিনাথ বলিল, "না, তুমি গাড়িতেই ব'সে থাক। বড় ঠাণ্ডা—দুদিকের দোর বন্ধ ক'রে দাও।" বলিয়া নিধির সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। একটা উজ্জ্বল আলোকিত কক্ষের দ্বারে উপনীত হইয়া নিধি উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দিদিমণি, বাবু এসেছেন।"

সুসজ্জিতা মালতী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া স্মিত-মুখে আহ্বান করিল, "আসুন।"

মালতীকে সহসা দেখিয়া শশিনাথ শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। এ যে একেবারে লীলার পনের বছর পরের ফোটোগ্রাফ, কিংবা লীলার ইহার পনের বছর পূর্বের ফোটোগ্রাফ। প্রমাণের জন্য শশিনাথ আসিয়াছিল, প্রমাণ সশরীরে

হাসিমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার দৃষ্টিতে লীলা, হাস্যে লীলা, গঠনে লীলা, ভঙ্গিতে লীলা! আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিলেও ক্ষতি ছিল না—একটা কথা জানিবার এই ছিল যে, লীলার পিতার সহিত ইহার যথার্থ সম্পর্ক কি এবং কিরূপ ছিল; মালতী তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ছিল, না, বাস্তবিকই উপপত্নী ছিল!

শশিনাথের বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব দেখিয়া মালতী একটু হাসিয়া বলিল, "ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ভিতরে এসে বসুন।"

মালতীর কথায় সংযত হইয়া শশিনাথ ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমি আপনাকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—বোধ হয় আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না, তার জন্যে আপনাকে কত দিতে হবে বলুন?"

এক মুহূর্ত ভাবিয়া একটু হাসিয়া মালতী বলিল, "এর আগে কথা ক'য়ে আমি কখনও পয়সা নিই নি। গান শুনিয়ে আমি পয়সা নিই। আপনি গান শুনতে চাইলে আমি আন্দাজ দিতে পারতাম। আপনার কি জিজ্ঞাসা করবা'র আছে জিজ্ঞাসা করুন; পয়সা দিতে হবে না।"

"সময়ের দাম সকলেরই আছে। আমি উপস্থিত এই দিলাম, পরে যদি আবশ্যক হয় আরও দেব।" বলিয়া শশিনাথ পকেট হইতে দুইখানা দশ-টাকার নোট মালতীর সম্মুখে রাখিয়া দিল।

টাকার খেলা মালতীর কাছে নূতন নয়, পান কিনিবার জন্য একশত টাকার নোটও তাহার হাত পড়িয়াছে; কিন্তু কথা কহিবার জন্য এমন করিয়া কেহ টাকা দাখিল করে নাই। তাই একটু বিশেষ রকম কৌতূহলী হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা বলুন দেখি?"

ভূমিকা না করিয়া শশিনাথ পকেট হইতে একটা ফোটোগ্রাফ বাহির করিয়া মালতীর সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একে আপনি চেনেন?"

মনোযোগের সহিত কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মালতী অস্ফুট ধ্বনি করিয়া

উঠিল। তাহার পর নিরতিশয় ব্যগ্রতার সহিত বলিতে লাগিল, "এ যে আমার মেয়ে লীলা, আপনি একে কেমন ক'রে জানলেন? কোথায় সে আছে, কেমন আছে, বলুন—বলুন, সব আমাকে বলুন।"

ফোটোগ্রাফ পকেটে রাখিয়া শশিনাথ কহিল, "তার বিষয়ে আমারই সব কথা জানবার আছে, যতক্ষণ না জানছি ততক্ষণ তার কোন কথাই আপনাকে বলব না। আমি খবর নিতেই এসেছি, দিতে আসি নি।"

মিনতির সহিত মালতী কহিল, "তবে আপনার কি জিজ্ঞাসা করবার আছে জিজ্ঞাসা করুন। কিন্তু দোহাই আপনার, তার কথা আমাকে সব না জানিয়ে আপনি যাবেন না। সে কি আপনার কাছেই থাকে?"

মালতীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া শশিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "লীলার কোনও বোনকে আপনি জানতেন?"

ব্যগ্রভাবে মালতী কহিল, "হ্যাঁ, তার নাম ছিল উর্মিলা। সে কিন্তু আমার সন্তান নয়।"

"তবে কার সন্তান?"

একটু ইতস্তত করিয়া মালতী কহিল, "উর্মিলা রতনবাবুর স্ত্রীর মেয়ে। আমি তাকে মানুষ ক'রে ছিলাম, আর পেটের সন্তানের মতই ভালবাসতাম। তার খবরও কি আপনি জানেন? বলুন, দয়া ক'রে বলুন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি নে।"

মালতীর এই অধীরতার প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ না দিয়া শশিনাথ বলিল, "উর্মিলার পিতা রতনবাবুই কি লীলার পিতা ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

একটু চিন্তা করিয়া শশিনাথ কহিল, "আমি শুধু আর একটি মাত্র কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। রতনবাবুর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ছিল?"

মালতীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল, শশিনাথের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া সে নতনেত্রে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দৃঢ়কণ্ঠে শশিনাথ বলিল, “এই কথাটাই আমার সব চেয়ে জানা দরকার, বলুন, তাঁর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ছিল।”

তেমনই নতনেত্রে থাকিয়া কম্পিত-কণ্ঠে মালতী বলিল, “আমি তাঁর স্ত্রী ছিলাম না।”

শশিনাথ কহিল, “আমার আর কোন কথা জানবার নেই। আমি এখন চললাম। আপনাকে আর কিছু দিতে হবে তো বলুন।”

শশিনাথের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতর-স্বরে মালতী কহিল, “আমার কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়ে, আমাকে কোন কথা না ব’লে চ’লে গেলে আপনার ভাল হবে না। লীলার কথা শোনবার আশায় আমি আপনাকে সব কথা বলেছি, তা নইলে কখনও বলতাম না। আমি যতই পাপিনী হই, লীলা তো আমার পেটের সন্তান।”

একটু চিন্তা করিয়া শশিনাথ কহিল, “লীলার কথা আপনি কি জানতে চান? লীলা বেশ ভাল আছে—লেখাপড়া শিখেছে। তার জন্য আপনার কোন চিন্তা নেই।”

নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে মালতী ব্যগ্রভাবে কহিল, “সে কোথায় থাকে? ভদ্রলোকের বাড়ি তো?”

“হ্যাঁ।”

রুদ্ধ-নিশ্বাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়া মালতী কহিল, আপনার বাড়িতেই থাকে কি?”

শশিনাথ কহিল, “হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতেই থাকে।”

হঠাৎ কোন বিষয়ে যেন চৈতন্য লাভ করিয়া মালতী ত্বরিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “লীলার তো এতদিন নিশ্চয় বিয়ে হয়েছে—আপনি তার কে?”

মালতীর এই যুক্ত প্রশ্নের উত্তর কি দিবে, সহসা ভাবিয়া না পাইয়া শশিনাথ চুপ হইয়া গেল। লীলার বিবাহ হওয়াটা যে পরিমাণে অলীক ঘটনা, লীলার

সহিত তাহার সম্পর্কটাও ঠিক সেই পরিমাণে অনির্দিষ্ট ব্যাপার! এই দুইটা প্রশ্নের মধ্যে কোনটারই হঠাৎ কোন উত্তর দেওয়া সহজ নহে।

শশিনাথের বিমূঢ় ভাব দেখিয়া মালতী কিন্তু একেবারে পাংশু হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি স্কন্ধদেশ-বেষ্টিত বসন-প্রান্ত মাথায় তুলিতে তুলিতে সলজ্জ স্খলিত-বাক্যে বলিল, "আপনি কি—তুমি কি বাবা তা হ'লে তার স্বামী? তুমি কি তা হ'লে আমার—" অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে সহসা মালতী শিহরিয়া থামিয়া গেল। নিজের ঘৃণিত হীনতা স্মরণ করিয়া শশিনাথের উপর সম্পর্কের দাবি করিতে সাহস করিল না।

এবার শশিনাথ কথা কহিল; বলিল, "না, আমি আপনার এখনও তেমন কেউ নই। কিন্তু যেদিন হব, সেদিন নিজেই আমি আবার আসব—আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্যে। আজ আমি চললাম; নষ্ট করবার মত আমার এখন একেবারেই সময় নেই।"

মালতীর গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। শশিনাথের প্রতি সজল-ম্লান দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কাতর-কণ্ঠে সে কহিল, "এসো তুমি, তোমার আসার অপেক্ষাতেই কয়েক দিন আমি এখানে থাকব; কিন্তু নিয়ে আমাকে কোথাও যেয়ো না বাবা। যেখানে যাবার, বিশ্বনাথ যদি দয়া করেন, সে আমি নিজেই যাব; তবে যাবার আগে বড় ইচ্ছে লীলাকে একবার দেখি। দয়া ক'রে যদি দেখাও।"

শশিনাথ কহিল, "আচ্ছা, তা আপনি দেখতে পাবেন।"

ব্যগ্রভাবে মালতী কহিল, "কিন্তু সে যেন আমাকে দেখতে না পায়। কালীঘাটে মন্দিরের সিঁড়ির পাশে আমাকে বসিয়ে রেখে তোমরা দুজনে মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রো—আমি দু চোখ ভ'রে একবার দেখে নোব। সে যেন জানতে না পারে, তার পাপিষ্ঠা মা এখনও বেঁচে আছে। তাকে ছেড়ে এসে প্রথম প্রথম বড় যন্ত্রণাই পেয়েছিলাম! কিন্তু এখন দেখছি, ভাগ্যে ছেড়ে এসেছিলাম; নইলে গলায় বেঁধে তাকেও তো পাপের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতাম!"

পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া শশিনাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আর আমি দেরি করতে পারি নে—চললাম।"

দশ-টাকার নোট দুইখানার দিকে অঙ্গুলনির্দেশ করিয়া মালতী কহিল, "ও তুমি নিয়ে যাও।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া শশিনাথ নোট দুইখানা তুলিয়া লইয়া পকেটে রাখিল এবং আর কোন কথা না বলিয়া প্রস্থান করিল।

অবশ দুর্বল মস্তক দেওয়ালে ভর দিয়া নিমীলিত-চক্ষে ক্ষণকাল মালতী কঠিন কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। আষাঢ় মাসে মরা নদীতে বন্যা যেমন করিয়া ছুটিয়া আসে, আজ যুগান্ত পরে তাহার শুষ্ক নারীহৃদয়ের মধ্যে মাতৃত্ব তেমনই চতুর্দিক প্লাবিত করিয়া ভরিয়া আসিল।

বহির্বাটির ঘরে বসিয়া সুধীর কি লিখিতেছিল, শশিনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

শশিনাথকে বসিবার জন্য একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া সুধীর কহিল, "সব শুনেছ শশি?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া রুক্ষস্বরে শশিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "লীলাকে ত্যাগ করাই স্থির করেছ তো?"

কলমটা কলমদানিতে রাখিয়া সুধীর কহিল, "এক কথায় সেটা বললে শ্রুতি-কটু হবে, কিন্তু কথাটার অন্য দিকটা যদি তুমি—"

সুধীরকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই কহিল, "কার্য-কারণ-কৈফিয়তের আলোচনা করতে বা শ্রুতিমধুর কথা শুনতে আমি তোমার কাছে এত রাত্রে আসি নি। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি, তুমি লীলাকে ত্যাগ করা স্থির করেছ কি না?"

ইহার পর শশিনাথকে বুঝাইবার চেষ্টা আর না করিয়া সুধীর বলিল, "হ্যাঁ, তা করেছি।"

"তবে এখনই তাকে ডেকে দাও—আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।"

সুধীর ভিতরে প্রবেশ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে লীলাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

লীলাকে দেখিয়া শশিনাথ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "লীলা, তোমাকে নিতে এসেছি ভাই, বাইরের লোকের সম্পর্কে এনে তোমাকে যে অসম্মান করেছি, তার জন্যে আমাকে ক্ষমা ক'রো। তুমি ছিলে না ব'লে এ দুদিন আমাদের বাড়ি শ্রীহীন হ'য়ে আছে, তুমি ফিরে গেলেই আবার তার লক্ষ্মীশ্রী ফিরবে।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া লীলা নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল! সুধীরের নিকট হইতে আজ তাহার জন্মকাহিনী শুনিবার পর হইতে সে এই কথাটাই মনের মধ্যে কয়েকবার নিশ্চয় করিয়া লইয়াছিল যে, অতঃপর আর কিছু পরিত্যাগ না করিলেও অন্তত মন হইতে অভিমানটা একেবারে বর্জন করিবে; যে জিনিসটার আর কোন মূল্য রহিল না, সেটা একেবারে নির্মূল করিয়াই উৎপাটিত করিয়া দিবে। কিন্তু শশিনাথের নিকট হইতে এই স্নিগ্ধ সোহাগ বচন ও সম্মাননার রস লাভ করিয়া তাহার মনের মধ্যে সেই অভিমানই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তার সমস্ত প্রাণ-মন অন্তরিন্দ্রিয় মথিত করিয়া দুই চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল। কিন্তু কণ্টকের দ্বারা কণ্টকোৎপাটনের মত তীক্ষ্ণ অভিমানের দ্বারাই মন হইতে এই বদ্ধমূল অভিমানকে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুধীরের দিকে ফিরিয়া শশিনাথ অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "দরকার না থাকলেও তোমার সঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার ক'রে নিই সুধীর। আজ থেকে লীলারও তোমার ওপর কোন রকমের অধিকার বা দাবি রইল না। তোমরা পরস্পরের কাছে আবার সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হ'লে।"

একটু চিন্তা করিয়া সুধীর বলিল, "আমার কোন অধিকার রইল না, এ আমি বলতে পারি; কিন্তু আমার ওপর দাবি রইল না, তা আমি বলতে পারি নে, আর বলবও না।"

দৃঢ়কণ্ঠে শশিনাথ কহিল, "না, আমি ব'লে যচ্ছি, তোমার ওপর লীলার কোন দাবি রইল না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার। ভবিষ্যতে লীলা যদি তোমার ওপর কোনও দাবি করে তো বন্ধুপত্নীর দাবিই করবে। আমি লীলাকে বিয়ে করব।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া সুধীর নির্বাক হইয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, একটা তীব্র আঘাতে আহত হইয়া নিস্পন্দ কঠিন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুধীরকে আর কোন কথা না বলিয়া বা বলিবার অবসর না দিয়া শশিনাথ লীলার দিকে ফিরিয়া বলিল, "রাত হয়েছে, বাড়ি চল লীলা।"

মন্ত্রাহতের মত শশিনাথকে অনুসরণ করিয়া লীলা গাড়িতে গিয়া বসিল।

৩২

দিন-কুড়িক হইল লীলা তাহার একদিনের শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। পূর্বে সকলই এই ভাবনায় অস্থির হইয়াছিল যে, লীলা ফিরিয়া আসিলে একটা ভয়ানক রকম কান্না-কাটি বিলাপ-বিপর্যয়ের ব্যাপার পড়িয়া যাইবে। লীলা কিন্তু গৃহে ফিরিয়া তেমন কিছুই করে নাই, নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিবার পূর্বে সে সকলেরই সহিত সহজ-সংযত ব্যবহার করিয়াছিল। সরযূ ও সুবাসিনীকে সে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; এমন কি, ঊর্মিলা যখন তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল, তখন তাহাকে প্রবোধ দিয়াছিল। তাহার পর এ কয়েক দিনেও সে তাহার বাহ্য-ব্যবহার ঠিক একই প্রকার রাখিয়াছে; তাহার চক্ষে কেহ অশ্রু দেখিতে

পায় নাই—মুখে কেহই হা-হুতাশ শুনে নাই, এমন কি, সকলেরই সহিত সে সহজভাবেই প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও কহিতেছে। তাহার এই শান্ত সহজ আচরণে সকলেই ক্রমশ মনে মনে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল—হয় নাই শুধু উর্মিলা। এই মৌন-রুদ্ধ স্তব্ধতার পিছনে একটা যে নিদারুণ ঘটনা ঝটিকার মত সঞ্চিত হইতেছে এবং একদিন অকস্মাৎ তাহা কোন-এক দিক হইতে আসিয়া পড়িয়া মহা বিপর্যয় ঘটাইবে, উর্মিলার মনে এমনই একটা আশঙ্কা নিয়ত বাড়িয়া উঠিতেছিল।

পাঁচ দিন শশিনাথ বাড়ি ছিল না, আজ বৈকালে আসিয়াছে। কোথায় এবং কি জন্য গিয়াছিল, তাহা কেহই জানে না। এই কয়েক দিন উর্মিলার দিনরাত্র প্রায় অনাহার অনিদ্রায় কাটিয়াছে। অবিরত তুলসীতলায় মাথা খুঁড়িয়াছে ; এবং শশিনাথের মঙ্গলকামনায় তেত্রিশ কোটি দেবতার শান্তি ভঙ্গ করিয়াছে।

আজ শশিনাথ বাড়ি আসায় সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়াছিল ; হয় নাই শুধু লীলা। সে মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিল, শশিনাথের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের উদ্দেশ্য অনতিবিলম্বে তাহারই নিকট একটা কোন উৎপীড়নের আকার ধরিয়া উপস্থিত হইবে, এবং মনে মনে সে সেই অজ্ঞাত কিন্তু অনিবার্য বিপত্তির সহিত যুঝিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তাহাকে বিবাহ করিবার কথা প্রথম যখন শশিনাথ সুধীরের গৃহে প্রকাশ করিয়া বলে, তখনই লীলা একটা দুর্নিবার অশান্তি ও অনর্থের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; কারণ সে ভালরূপেই জানিত যে, শশিনাথ যখন একটা সঙ্কল্প করে, তখন তাহার মত্ততা হইতে তাহাকে নিরস্ত করিবার শক্তি কাহারও থাকে না। এ গৃহে ফিরিয়া আসার পর কয়েক দিনই শশিনাথের সহিত তাহার এ বিষয়ে কথা হইয়াছে, এবং যতবারই সে শশিনাথের এই উদ্দাম অভিপ্রায়ে আপত্তি করিয়াছে, বাধা দিয়াছে, ততবারই উত্তরোত্তর শশিনাথের আগ্রহের বেগ তাহার বিরুদ্ধ-বিমুখ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে।

নিজের মনের মধ্যে তাহার আর কোন গোল ছিল না, ছিল শুধু শশিনাথকে লইয়া। যুক্তি কারণ বিচার করিয়া না দেখিলেও মনে মনে এ মীমাংসা সে করিয়াছিল, যে, শশিনাথকে সে বিবাহ করিবে না। অভিমান, অপমান, ঘৃণা, লজ্জা, ধিক্কার বা অন্য কোনও কিছু যে বিশেষ করিয়া প্রবল বা স্পষ্ট হইয়া তাহাকে এই সঙ্কল্পে লইয়া আসিয়াছিল, তাহা নহে, তত্রাচ শশিনাথের আগ্রহ ও আকিঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনের এই সহজ বাসনা ক্রমশ যেন সুদৃঢ় পণের মত কঠোর হইয়া আসিতেছিল। এক সময় এইকথা ভাবিয়া সে আশ্চর্য হইয়া যায় যে, দুই দিন আগে যে জিনিসকে অমৃত মনে করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও এক কণা লাভ করিতে পারে নাই, আজ এত সুলভ-সহজরূপে তাহার সমস্তটা হাতের মধ্যে পাইয়াও তাহাকে যে প্রত্যাখ্যান করিতেছে, সে কোন শক্তির প্রভাবে? বিবাহ তো তাহার বিবাহই নয়, সুধীর তো তাহার কেহই নয়, তাহার জন্মকাহিনীর কলঙ্কের কথা শশিনাথ তো মুখে আনিতে দেয় না, তবে তাহার এ কি হইল! লীলা তাহার নিভৃত শয্যায় নিস্তব্ধ নিশ্চল হইয়া নিমীলিতচক্ষে দিন পাঁচ-ছয় পূর্বেকার একদিনের কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিয়া এই দুর্ভেদ্য সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যুক্তি ও মিনতির জালে লীলাকে কিছুতেই আবদ্ধ করিতে না পারিয়া সেদিন যখন শশিনাথ সকাতরে এই অতি সহজ প্রশ্ন করিয়াছিল, "কেন আমাকে বিয়ে করবে না তা হ'লে বল?" তখন লীলা সহসা বিব্রত এবং বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। যুক্তি দেখিবার অবস্থা হইতে অকস্মাৎ যুক্তি দেখাইবার অবস্থায় পড়িয়া তাহার মাথায় প্রথমটা কোন যুক্তিই আসে নাই—সে নতনেত্রে নির্বাক্ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া ছিল। তাহার পর অবশেষে নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইয়া সে যখন শশিনাথের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য মুখ তুলিয়াছিল, তখন শশিনাথের কাতর চক্ষের সকরুণ দৃষ্টি দেখিয়া তাহার মুখ হইতে আসল যুক্তি একটাও বাহির না হইয়া তাহার মতে সর্বাপেক্ষা যেটা লঘু এবং উপেক্ষণীয়

সেইটাই বাহির হইয়াছিল। সে বলিয়াছিল, "আমার যে বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে—মেয়েমানুষের কি দুবার বিয়ে হয় ?"

তাহাতে শশিনাথ বলিয়াছিল, "তুমি কি জান না, ব্রাহ্মণের বিয়েতে রাতের ব্যাপারটা কিছুই নয়—মাথায় সিঁদুর পর্যন্ত পড়ে না। সমাজ-শাস্ত্রের কথা যদি তোল লীলা, তা হ'লে তোমার এখনও বিয়েই হয় নি।"

এ কথার উত্তরে লীলার মনে যে কথা আসিয়াছিল, সে কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। রাত্রের ব্যাপার যদি কিছুই নয়, তবে সেই কিছু নয় ব্যাপারের পর সমস্ত রাত্র তাহাকে একজন পুরুষের সহিত এক শয্যায় বাস করানোই বা কেন হইয়াছিল এবং পরদিন সেই পুরুষের পার্শ্বে বসাইয়া তাহার বাড়িই বা তাহাকে পাঠানো হইয়াছিল কেন ? এ কথা শশিনাথ পুনরায় তুলিলে এ প্রশ্ন করিবে কি না লীলা মনে মনে তাই ভাবিতেছিল, এমন সময়ে দ্বারের নিকট শশিনাথের কণ্ঠ শুনা গেল, এবং পরমুহূর্তেই শশিনাথ ঘরে প্রবেশ করিল।

তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "ক'দিন কোথায় গিয়েছিলে শশিদা ?"

শশিনাথ বলিল, "নবদ্বীপ আর ভাটপাড়ায়।"

লীলা তাড়াতাড়ি কথাটা সেইখানেই বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, "যেখানেই যাও—ব'লে গেলে তো আর বাড়ির লোক এমন ক'রে দগ্ধ হ'ত না।"

"কে দগ্ধ হয়েছিল লীলা ?—তুমি ?"

অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইয়া লীলা বলিল, "দিদি তো কেঁদে-কেটে সমস্ত দিন—"

লীলার কথা শেষ হইতে না দিয়া শশিনাথ বলিল, "আর তুমি কি হেসে-খেলে সারাদিন কাটিয়েছিলে ? দিদির কথা দিদির কাছে শুনে এসেছি—তোমার কথা কি তাই বল না ?"

আর কোন কথা না বলিয়া লীলা চুপ করিয়া রহিল। কথোপকথনকে

আজ সে কিছুতেই সহজ ও সাধারণ প্রণালীর বাহিরে লইয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

লীলাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অসংহৃতভাবে শশিনাথ বলিল, "তা বলতেও কি তোমার নিষ্ঠায় বাধে লীলা?"

লীলার মুখ পাংশু হইয়া গেল। কম্পিত-স্খলিতবচনে সে বলিল, "নিষ্ঠার কথা বললে আমাকে কি ঠাট্টা করা হয় না শশিদা?"

শশিনাথ গর্জন করিয়া উঠিল, "না, হয় না। হাজার বার বলেছি, হয় না—তবু সেই এক কথা? তুমি জান কোন্ কথা বললে আমি মনে ব্যথা পাব, তাই ইচ্ছে ক'রে আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে সেই কথা বার বার বল। উঃ! তোমার প্রকৃতির মধ্যে কি ভয়ানক একটা নিষ্ঠুরতা আছে, তা যদি তুমি বুঝতে লীলা!" পর-মুহূর্তেই একেবারে যন্ত্রাহত ফণীর মত নরম হইয়া গিয়া শান্ত-করুণ-স্বরে বলিল, "আমি গুরুতর অপরাধ করেছি লীলা, কিন্তু তাই ব'লে কি এমনি কঠোর ভাবেই তার শাস্তি দেবে? এত দুঃখেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না?"

বিবর্ণমুখে ভগ্নকণ্ঠে লীলা কহিল, "তুমিও ঠিক জান শশিদা, এই সব দণ্ড-পাপের কথা বললে আমি মনে কষ্ট পাই, তাই তুমি এ সব কথা বল। তুমি আমার কাছে অপরাধ করেছ সেটা যেমন মিথ্যা, আমি তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি সেটাও তেমনি ভুল।"

স্নিগ্ধ ব্যথিত কণ্ঠে শশিনাথ কহিল, "আচ্ছা, পাপ পুণ্যের বিচার না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কি জন্যে নবদ্বীপ-ভাটপাড়ায় গিয়েছিলাম তা তো জিজ্ঞাসা করলে না।"

মনে মনে কঠিন হইয়া লীলা বলিল, "দরকার ছিল, তাই গিয়েছিলে।"

উৎফুল্লভাবে শশিনাথ কহিল, "খুব দরকার ছিল লীলা, আর সে দরকারী কাজে সম্পূর্ণ সফল হ'য়ে এসেছি।" বলিয়া পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া কহিল, "এই দেখ, ভাটপাড়া আর নবদ্বীপ থেকে পঁচিশখানা ব্যবস্থাপত্র নিয়ে এসেছি। এগুলো প'ড়ে দেখ, সমাজের যাঁরা মাথা—

মহামহোপাধ্যায়, সার্বভৌম, বিদ্যারত্ন, স্মৃতিভূষণ, বড় বড় পণ্ডিত, তাঁরা মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে, তোমার সে বিয়ে বিয়েই নয়। আবার যথাশাস্ত্র তোমার বিয়ে হবার পক্ষে কোনও বাধা নেই। এখন আমার প্রার্থনা মঞ্জুর তো?"

শশিনাথের কথা শুনিয়া লীলা নির্বাক হইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল—এই রকম একটা আশঙ্কাই সে মনে মনে করিতেছিল। শশিনাথের কথার কোন উত্তর তাহার বিহ্বল মস্তিষ্কে আসিল না।

লীলাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে শশিনাথ কহিল, "তা হ'লে মঞ্জুর তো? লক্ষ্মীটি, একবার খুলে বল। আর যদি আরও ভাল ক'রে সন্তুষ্ট হ'য়ে নিতে চাও, এগুলো তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, প'ড়ে দেখো। আমি ঘণ্টা খানেক পরে আসব।"

এবার লীলা কথা কহিল; ব্যবস্থাপত্রগুলো হাত দিয়া শশিনাথের দিকে সরাইয়া দিয়া বলিল, "এর আমি একটাও পড়তে চাই নে। এ সব মতের কোনও মূল্য নেই—কারণ, আমার জন্মের ইতিহাসটা প্রকাশ ক'রে যদি বলতে, তা হ'লে এর একটা মতও তুমি পেতে না। তা ছাড়া এ সব পয়সা দিয়ে কেনা মতের চেয়ে তোমার মতকে আমি অনেক ওপরে স্থান দিই। তুমি যদি বল আবার আমার বিয়ে করা চলে, তাই যথেষ্ট। কিন্তু—"

অধীর উৎকণ্ঠায় শশিনাথ বলিল, "আবার কিন্তু কি?"

একবার তাহার শান্ত-করুণ দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য শশিনাথের চক্ষে ফেলিয়া নতদৃষ্টি হইয়া লীলা মৃদুস্বরে বলিল, "একটা কিছু করা যেতে পারে ব'লেই তো করা যায় না।"

"কেন করা যায় না লীলা? তা হ'লে একজনকে দুঃখের অতল থেকে উদ্ধার করা হয় ব'লে কি করা যায় না? এত নির্দয়তা তোমার কেন?"

নিষ্প্রভ বিরস মুখ কোন প্রকারে শশিনাথের প্রতি তুলিয়া লীলা বলিল, নির্দয়তা নয় শশিদা, এ আমার অনেক দুঃখের সঙ্কল্প। মাস দুই তিনের মধ্যে আমি যা ভুগেছি—একে দুঃখ বল, দুর্ভাগ্য বল, যাই বল না কেন—এ আমি

নিজের অদৃষ্টে ভুগেছি, এর জন্যে আমি কাউকে দায়ী করি নে ; তোমাকে তো নয়ই। তুমি আমাকে চিরদিন যেমন স্নেহ দয়া করেছ, তেমনি ক'রো। তোমার দয়া আমি মাথায় ক'রে রাখব, তার বেশি আমি চাই নে।"

"আর আমার প্রেমটা কি কিছুই নয় —তাকে এমনি ক'রে পদদলিত করবে ?"

শশিনাথের কথা শুনিয়া লীলার দুই চক্ষু মুদিয়া আসিল, কপালে হাত ঠেকাইয়া মৃদু আর্তকণ্ঠে বলিল, "যা-তা কথা ব'লো না শশিদা, শুনলেও পাপ হবে। কিন্তু প্রেম ব'লে যা তুমি আমাকে দিতে চাচ্ছ, তা প্রেম নয়, ওটা তোমার দয়া আর আত্মোৎসর্গ। আমার ওপর তোমার এত দয়া ব'লে আমি কি নির্দয় হ'য়ে—"

বাধা দিয়া শশিনাথ ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "থাম লীলা থাম। আমি জানি মুখে তোমার অনেক কথা জোটে, কিন্তু মনে তোমার একটুও দয়া নেই। তা থাকলে আর আজকে আমাকে এমন ক'রে অপমান করতে না। তুমি যে পাষাণী! তোমার কি হৃদয় আছে—কেমন ক'রে বোঝাব—তোমার প্রেমে আমি পাগল হয়েছি, কেমন ক'রে বোঝাব—এ দয়া নয়, করুণা নয়, আত্মোৎসর্গ নয় ? তুমি বিশ্বাস করবে না, সেই জন্যে তোমাকে বলতে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু এ কথা নিতান্ত সত্য, দয়া ব'লে যাকে তুমি কলুষিত করছ, সেই প্রেম প্রথম টের পেলাম সেদিন যেদিন তোমার বিয়ে হ'ল, সেদিন মনের মধ্যে কি ঝড় বয়েছিল, তা তুমি কি জানবে! কিন্তু তখন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছি—কোন উপায় ছিল না। তারপর সকলের চেয়ে ভীষণ কথা শুনবে ?—যখন শুনলাম সুধীর তোমাকে পরিত্যাগ করেছে, তখন অসহ্য রাগের মধ্যেও মনে একটা অতি ক্ষীণ আশার আলো জ্ব'লে উঠেছিল। সেই আলো তুমি চিরদিনের জন্য নিবিয়ে দিতে চাও লীলা ?"

শশিনাথের এই দীর্ঘ ও অদ্ভুত অভিব্যক্তি শুনিয়া লীলার শরীর অবশ হইয়া আসিল, মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল, তাহার সমস্ত দেহ একটা প্রগাঢ়

বিহ্বলতায় কাঁপিতে লাগিল। প্রথমটা তাহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না, তাহার পর কোন প্রকারে নিজের লুপ্ত প্রায় চৈতন্যকে সঞ্চিত করিয়া সকাতর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "এ ভাল নয় শশিদা, বাস্তবিকই ভাল নয়। এমন ক'রে লুব্ধ করা ভাল নয়। আমি একজন সামান্য মেয়ে মানুষ, কতক্ষণ পারব বল ?"

শশিনাথ হাসিয়া উঠিল, "তুমি সামান্য মেয়েমানুষ ? মিথ্যে কথা। তোমার মত কঠিন মেয়েমানুষ আর দ্বিতীয় নেই। তোমার মায়া নেই, দয়া নেই, ক্ষমা নেই। তুমি আবার সামান্য মেয়েমানুষ কোথায় ?"

লীলার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "সে কি কম দুঃখে শশিদা সে কি কম কষ্টে ?" এক মুহূর্ত চুপ ককিয়া থাকিয়া বলিল, "পূর্ব-জন্মের অনেক পুণ্য ছিল, তাই কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশ হ'য়ে গেল—নইলে তো—" লীলার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

"নইলে কি হ'ত লীলা ?"

"থাক্, তা আর শুনে কাজ নেই।" মনে মনে বলিল, "দ্বিচারিণী হ'তে হ'ত।"

"শশিদা !"

"কি বল ?"

"তুমি সরযূর কথা একবারও ভাব ?"

পাংশুবদনে শশিনাথ বলিল, "সরযূর কি কথা ?"

"সরযূকে বিয়ে করবে ব'লে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছ, আর সরযূ তোমাকে স্বামী মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এই বাড়িতে বাস করছে ?"

শশিনাথেব মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল। সরযূকে লইয়া যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার মনে সর্বদাই একটা অস্বস্তি লাগিয়া থাকিত। লীলার মুখ হইতে সেই কথা শুনিয়া সে ভয়-বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর আত্মসম্বৃত হইয়া বলিল, "সরযূকে বিয়ে করব ব'লে তো আমি প্রতিজ্ঞা করি নি—আমি শুধু তার ভার নিয়েছিলাম।"

বিস্মিত-চকিত নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া লীলা কহিল, "কি বলছ শশিদা? তুমি প্রতিজ্ঞা কর নি? আমি যে নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

বিবর্ণমুখে শশিনাথ বলিল, "কিন্তু আমি তো জানি, কি কথা ব্যবহার করেছিলাম। আমি বলেছিলাম—আজ থেকে সরযূর ভার নিলাম। বিয়ে করব, তা বলি নি।"

একটু ভাবিয়া লীলা বলিল, "কথার মানে কিছুই নয়। তুমি যা বুঝিয়েছিলে তাই সকলে বুঝেছিল। সকলেই বুঝেছিল—"

লীলাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া শশিনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, "বুঝেছি, তোমার কথা বুঝেছি। কিন্তু সকলে যদি ভুল বোঝে, তার জন্যে আমি দায়ী নই।"

"আমাকে ক্ষমা ক'রো শশিদা, তার জন্যে তুমিই দায়ী। তুমি সরযূকে আজ পর্যন্ত বুঝিয়ে রেখেছ, তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। সে কম দুর্ভাগিনী নয় শশিদা, সেও আমার চেয়ে কম কষ্ট পায় নি, তার প্রতি তুমি নির্দয় হ'য়ো না। আমার জীবনের মধ্যে অনেক গোল দাঁড়িয়েছে, সে আর এ জীবনে শুধরাবে না। সরযূর এখনও সব ঠিক আছে—তার জীবনটা নষ্ট ক'রো না—তার প্রতি দয়া কর।"

লীলার কথা শুনিয়া শশিনাথ কিছুক্ষণ নীরবে নির্নিমেষ নেত্রে লীলার প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর দৃঢ় অথচ কাতর-কণ্ঠে বলিল, "আর আমার জীবনটা কি কিছুই নয়? আমি শুধু আছি যাতে অন্যের জীবন নষ্ট না হয়, সেই জন্য? আমি শুধু মাল-মসলা? রক্ত-মাংস নই?"

শশিনাথের এই কাতরোক্তি শুনিয়া এত দুঃখেও লীলার মুখে ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হইয়া উঠিল, স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "সে কথা তো এক হিসেবে সত্যি শশিদা। তোমরা কঠিন, তোমরা শক্ত; তোমরা যদি আমাদের রক্ষা না করবে তো আমরা দুর্বল, বাঁচব কেমন ক'রে?"

"তোমরা দুর্বল ? তোমরা বজ্রের চেয়েও কঠিন, পাষাণের চেয়েও কঠোর। তোমাদের দয়ামায়া নেই।" বলিতে বলিতে শশিনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

লীলার অধরে সেই ক্ষীণ হাসিটুকুর অবশেষ তখনও লাগিয়া ছিল, কিন্তু বর্ষাবসানান্তের ক্ষণনির্মুক্ত নির্মল আকাশ যেমন দেখিতে দেখিতে মেঘে ঢাকিয়া গিয়া বর্ষণ আরম্ভ হয়, তেমনি নিমেষের মধ্যে তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

৩৩

লীলার ঘর হইতে বাহির হইয়া শশিনাথ সরযূকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সরযূ তখন লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারতে তন্ময় হইয়া ছিল।

শশিনাথ প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "সরযূ!"

শশিনাথের আহ্বানে চমকিত হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সরযূ বলিল, "আজ্ঞে?"

"তোমার সঙ্গে আমার একটা খুব জরুরী কথা আছে। তোমার এখন সময় হবে কি?"

মনে মনে বিস্মিত হইয়া সরযূ বলিল, "হবে।"

"তবে তোমার ঘরে এস।" বলিয়া শশিনাথ অগ্রসর হইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া শশিনাথ সরযূকে একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ব'স এইখানে—একটু দেরি হবে।"

না বসিয়া চেয়ারে ভর দিয়া সরযূ উৎসুকনেত্রে শশিনাথের প্রতি চাহিয়া রহিল।

একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া শশিনাথ বলিল, "কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সরযূ, চেয়ারটায় ব'স।" তাহার পর সরযূ উপবেশন করিলে বলিল, "লীলার বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চাই। সে তো নিতান্ত ছেলেমানুষ, জীবন এখনও ভাল ক'রে আরম্ভই হয় নি। তার সমস্ত জীবনটা যাতে শুধু একটা দুঃখযন্ত্রণার ব্যাপার না হ'য়ে থাকে, তার একটা উপায় করা উচিত নয় কি?"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আগ্রহ সহকাকে সরযূ বলিল, "নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু কি করবেন, তা কিছু ভেবেছেন?"

"ভেবেছি। কিন্তু সেটা বলবার আগে একটা বিষয়ে তোমার মত জানতে চাই। লীলার যে বিয়ে হয়েছিল, সেটা বিয়েই নয় ব'লে অগ্রাহ্য করা যায় কিনা?"

একটু ভাবিয়া সরযূ বলিল, "বোধ হয় যায়—কুসুমডিঙে তো হয় নি।"

"ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিতদেরও তাই মত। আমি ভাটপাড়া আর নবদ্বীপ থেকে পঁচিশ জন পণ্ডিতের ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি। সকলেই বলেছেন—বিয়ে হ'তে পারে। আমাদের দেশের পণ্ডিতদের যে আমরা গোঁড়া আর সঙ্কীর্ণ ব'লে গালাগালি দিই, সেটা ভারি অন্যায় সরযূ। তাঁদের মধ্যে আমি দেখে এলাম, অধিকাংশ খুব উদার আর উন্নত। কিন্তু তা হ'লে কি হবে, আসল গোল তোমাদের এই পচা চামসেপড়া সমাজকে নিয়ে; এ যে ঠিক মরা কাল-সাপের মত—দেহে প্রাণ নেই, কিন্তু দাঁতে বিষটুকু আছে; লীলার একবার বিয়ে হয়েছিল, আর কি কারণে সে বিয়ে ভেঙে গিয়েছে, এ দুটো ব্যাপার জানলে সমাজের ভেতর থেকে কেউ যে লীলাকে বিয়ে করতে সাহসী হবে, সে ভরসা আমার বড় নেই। আবার এ সব কথা গোপন রেখেও বিয়ে

দেওয়া একেবারেই নিরাপদ নয়; পরে জানতে পারলে তখন আরও বিপদে পড়া যেতে পারে।"

চিন্তিত হইয়া সরযূ বলিল, "তবে কি হবে?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শশিনাথ বলিল, "লীলার জন্য আমাদের একটু ত্যাগ স্বীকার করতে হ'লে করা উচিত নয় কি সরযূ?"

সরযূর মুখ সহসা অনেকখানি বিবর্ণ হইয়া গেল! মৃদুস্বরে বলিল, "উচিত।"

"আমি যদি লীলাকে বিয়ে করি, তা হ'লে কেমন হয় সরযূ? তা হ'লে তো গোলযোগের কোনও ভয় থাকে না।"

কথাটা শুনিয়া একবার সরযূর মাথা ঘুরিয়া উঠিল, চক্ষের ভিতর একবার যেন একটা অন্ধকার ঘেরিয়া আসিল, যেন মনে হইল চৈতন্য মস্তিষ্ককে ও শক্তি দেহকে ছাড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু তখনই প্রাণপণ বলে গতপ্রায় শক্তিসমূহকে সংহত করিয়া সবলে চেয়ারের দুইটা হাতল চাপিয়া ধরিয়া সে রহিল, এবং সে যে সহসা ভাঙিয়া পড়িবার মত দুর্বল নহে, সেই বিশ্বাস মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিবার ও বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মুখ দিয়া তাহার কোনও কথা বাহির হইল না।

স্নিগ্ধকণ্ঠে শশিনাথ কহিল, "তোমার এতে কি মত নেই সরযূ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "লীলার মত আছে?"

"না, একেবারেই নেই। তুমি তার মত করাবার চেষ্টা করবে সরযূ?"

নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে সরযূ বলিল, "করব।"

"তা যদি করতে পার সরযূ, তা হ'লে আর্তকে সুস্থ করলে, অগতির গতি করলে যদি কোন পুণ্য থাকে, সে পুণ্য তোমার হবে।"

ব্যথিত-ক্লান্ত দৃষ্টি একবার শশিনাথের মুখে নিবদ্ধ করিয়া সরযূ বলিল, "এ আমি শুধু আপনি বলছেন ব'লেই করব—কোন পুণ্যের জন্য নয়।"

"তা নয় তা আমি জানি। কিন্তু কত বড় পুণ্যের কাজ তুমি করবে, তা তুমি জান না সরযূ। লীলার জীবনে আমি কি ভীষণ অন্যায় করেছি, তা তুমি জান না। এই অপদার্থ লোকের ওপর তার যে কি অসীম ভালবাসা ছিল—আর কি আকুল আগ্রহে সে এই অধম ব্যক্তির আশ্রয়-ভিক্ষা করেছিল, তা আর কি বলব! আমি তার সেই অমূল্য ভালবাসাকে উপেক্ষা ক'রে, জোর ক'রে সুধীরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার কি দুর্দশা করেছি, তা তুমি জান। এখন যদি আমার সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি! শুধু প্রায়শ্চিত্ত নয় সরযূ, তোমার কাছে আজ কোন কথা গোপন রাখব না, লীলাকে না পেলে আমার এ জীবনে আর কোন সুখ নেই। তুমি কি আমার এ চেষ্টার সহায় হবে না সরযূ?"

রাত্রি না হইলে শশিনাথ বুঝিতে পারিত, অস্ত্রাঘাতের সময় রোগীর মুখের মত তাহার কথা শুনিতে শুনিতে সরযূর মুখ একেবারে সীসার মত পাংশু হইয়া গিয়াছিল। দ্রুত-সঞ্চালনে সরযূর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইতেছিল; ডান হাত দিয়া বুকটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সরযূ বলিল, "আপনি যা বলবেন করব।"

উৎফুল্লভাবে শশিনাথ বলিল, "তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ করব তা খুঁজে পাচ্ছি নে, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু তাকে রাজি করানো বড়ই কঠিন হবে সরযূ। চিরকালই সে ভারি অভিমানী। তার ওপর সে বলে কি জান?—সে বলে, তোমাকে বঞ্চিত করে কখনও আমাকে বিয়ে করবে না। এ কথার মানে কি সরযূ?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সরযূ বলিল, "ও কোন কাজের কথা নয়—সে আমি লীলাকে বুঝিয়ে দেব।"

কথাটা সরযূ প্রকাশ করিয়া বলিল না, তাহা বুঝিয়া শশিনাথ বলিল, "তোমার কি মনে হয় সরযূ, তুমি আর আমি, পরস্পরের পক্ষে, কোন রকম সত্যে আবদ্ধ আছি? কোন একটা প্রতিশ্রুতি অবলম্বন করে তোমার

আর আমার মধ্যে একটা কোন বিশেষ বন্ধন আছে ব'লে কি তোমার মনে হয়?"

এবার সরযূ দৃষ্টি নত করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল এবং শশিনাথের প্রশ্নের উত্তরে কোন কথাই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

শশিনাথ কহিল, "কারো কারো ধারণা, কাকাবাবুর মৃত্যুশয্যায় আমি তোমাকে বিয়ে করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তোমার মনে যদি সেই ভুল ধারণা থাকে, তা হ'লে আমি তোমাকে শুধু দুটি কথা জানাতে চাই। প্রথমত, আমি সে প্রতিজ্ঞা করি নি,—আমি তোমার সব রকম ভার নিলাম, তাই বলেছিলাম; আর দ্বিতীয়ত, সে রকম প্রতিজ্ঞা করা আমার পক্ষে সম্ভবই ছিল না; কারণ বিয়ে করবার কোন কল্পনাই তখন আমার মাথায় ছিল না। তা যদি থাকত, তা হ'লে লীলাকে বিয়ে করতে প্রত্যাখ্যান করতাম না। তা ছাড়া বরেন তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়াব—এই মনে মনে ঠিক করা ছিল। সব কথা বোঝাবার মত যদি কাকাবাবুর অবস্থা থাকত, তা হ'লে বরেনের কথা তাঁকে সেদিন খুলে বলতাম। এখন তুমি বেশ বুঝতে পারছ সরযূ, এমন কোন বন্ধনে তুমি আবদ্ধ নও যাতে বরেনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে লোকত বা ধর্মত তোমার মনে কোন রকম গ্লানি উপস্থিত হ'তে পারে। বরং এ কথা আমি অসঙ্কোচে বলতে পারি, বন্ধন যদি তোমার কিছু থাকে তো সে বরেনেরই সঙ্গেই আছে। অত বড় প্রেমের যদি কোন বন্ধন না থাকে তো সংসারে বন্ধনই থাকে না। একমাত্র বরেন ছাড়া আমার মত হিতৈষী তোমার আর কেউ নেই সরযূ; আমার এই আশীর্বাদ তুমি আজ নিশ্চিন্ত-মনে নিয়ে যাও ভাই, বরেনকে বিয়ে ক'রে তুমি পুণ্য আর সুখ—দুই একসঙ্গে লাভ কর। আমার উপর তোমার যদি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা, ভালবাসা বা বিশ্বাস থাকে তো স্থির জেনো তা হ'লেই সব দিক থেকে সকলের মঙ্গল হবে। এর বেশি তোমাকে আমার আর বলবার কিছু নেই। অনেক রাত হয়েছে, এখন তা হ'লে এস।"

এক মুহূর্ত নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিয়া সরযূ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর আর কোন কথা না বলিয়া একবার চেয়ারে মাথাটা স্পর্শ করিয়া একবার টেবিলের পাশটা চাপিয়া ধরিয়া একবার দরজার চৌকাঠটা ধরিয়া ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে শশিনাথ উর্মিলাকে বলিল, "বউদি, তোমার ওপর একটা দুরূহ কাজের ভার পড়বে।"

এ কাজ যে লীলাকে বিবাহে রাজি করানো বা ঐরূপই একটা অসম্ভব কিছু হইবে মনে করিয়া উর্মিলা চিন্তিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শশিনাথের মুখে মৃদু হাস্যের রেখা দেখিয়া তাহার একটু সাহসও হইল; বলিল, "কি বল দেখি?"

"এই ফাগুন মাসে একটা নয়—একেবারে এক জোড়া বিয়ের যোগাড় তোমাকে করতে হবে। একই রাত্রে এক লগ্নে আমরা চার জন,—সরযূ বরেন, আমি আর লীলা,—আমাদের জীবনের সব গোলমাল মিটিয়ে নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করব; আর তুমি আমাদের মাথায় ধান-দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করবে যাতে আর আমরা দুঃখ না পাই।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া উর্মিলা কাতর-কণ্ঠে বলিল, "এ যদি হ'তে পারত ঠাকুরপো, তার চেয়ে সুখের আর কি ছিল; কি ক'রে হবে ভাই? লীলা আর সরযূ রাজি হবে কি?"

উৎফুল্লমুখে শশিনাথ বলিল, "সে ভার আমার উপর বউদি, সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।"

একটু চিন্তা করিয়া উর্মিলা বলিল, "তুমি যাই বল ঠাকুরপো, এ বিষয়ে এখনও গোল আছে; সরযূও রাজি হবে না, লীলা তো নয়ই! এ বিষয়ে লীলার সঙ্গে আমার শেষ-কথা হ'য়ে গেছে। সে তোমাকে এখনও ঠিক আগের মতই ভালবাসে আর ভক্তি করে; আর সেই ভক্তি আর ভালবাসার জোরেই সে স্থির করেছে, তার জীবনের সঙ্গে জড়িত ক'রে কিছুতেই

সে তোমাকে নীচু করবে না। তা ছাড়া সে সরযুকে কোনমতেই অসুখী করবে না। আমারও মনে হয় ঠাকুরপো, এ দুই দিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে লীলার কথাই ঠিক। লীলা অসুখী হ'য়ে থাকবে —তা কি করবে ভাই? এমন তো কতজন কত কষ্ট পাচ্ছে, নিজ নিজ অদৃষ্টে!"

কিছুক্ষণ ঊর্মিলার দিকে নির্বাক্‌ভাবে চাহিয়া থাকিয়া শশিনাথ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "লীলা হেয় ঘৃণিত নিকৃষ্ট—লীলাকে বিয়ে করলে আমি নীচু হ'য়ে যাব—এ কথা তুমিও বলছ বউদি? দেখ বউদি, পাপের মধ্যে পুণ্য, অশুচির মধ্যে শুচি, বিষের মধ্যে অমৃত, এ জগতে এমন লুকানো থাকে যে, কোন্‌টা পাপ কোন্‌টা পুণ্য, কোন্‌টা শুচি, কোন্‌টা অশুচি, এ বিচার করা অত সহজ নয় যত সহজে তোমরা করছ। লীলার মা তোমার মা নন, সেই জন্যে তুমি লীলার চেয়ে অনেক ওপরে, অনেক পবিত্র, এই যে তোমার অহঙ্কার, সত্যি মূল্য এক এর কপর্দকও নেই—এ তুমি ঠিক জেনো।"

ব্যথিতস্বরে ঊর্মিলা বলিল, "উঁচু-নীচুর বিচার আমি করছি নে ভাই, করতে প্রবৃত্তিও হয় না, কিন্তু আমাদের সমাজ—"

বাধা দিয়া শশিনাথ বলিল, "আমাদের সমাজের কথা আর তুমিও তুলো না বউদিদি; সমাজের জন্যে দাদাই যথেষ্ট আছেন, সে কথা তাঁর সঙ্গে হবে।"

ব্যগ্রভাবে ঊর্মিলা কহিল, "সেও তো একটা কথা ঠাকুরপো, তাঁর মত কি ক'রে করাবে? তাঁর মতের বিরুদ্ধে আমি তো কিছু করব না ভাই। তিনি কি রাজি হবেন?"

দৃঢ় অবিচলিত স্বরে শশিনাথ বলিল, "তিনি যদি রাজি না হন, তাঁকে ত্যাগ করব। আর তার জন্যে যদি তোমার সংস্রব ত্যাগ করতে হয়, বড়ই কষ্ট হবে বউদি, কিন্তু তাও করব। লীলাকে আমি ত্যাগ করব না, মৃত্যু পর্যন্ত তার পিছনে পিছনে থাকব, তা সে যে-রকমই হোক্ না কেন। কিন্তু তোমার অত মুখ

শুকোবার দরকার নেই। দাদাকে আমি রাজি করিয়ে নেব—ভাটপাড়া আর নবদ্বীপ থেকে তার ব্যবস্থা ক'রে এনেছি। এই নাও, তুমিও এগুলো প'ড়ে দেখ।"

একে একে ব্যবস্থাপত্রগুলি পাঠ করিয়া ঊর্মিলা বলিল, "তোমার দাদার মত হ'লে আমার মতের জন্য এক মুহূর্ত আটকাবে না ঠাকুরপো।"

সোমনাথ কিন্তু ব্যবস্থাগুলা পাঠ করিয়াই বলিল, "এ কিছুই নয়।—জমিদার ছাড়লেও যেমন আমলার কাছে রক্ষে নেই—তেমনি মহামহোপাধ্যায়ের মত থাকলেও সমাজে মহাগণ্ডমূর্খের অমতেই আটকাবে। সে হিসেবে এ সব মতের কোন মূল্য নেই। তা যদি থাকত, তা হ'লে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের পর বিধবা-বিবাহ চলবার পক্ষে আজ আর কোন বাধা থাকত না।"

ক্রুদ্ধ হইয়া শশিনাথ বলিল, "গণ্ডমূর্খদের অমতে আটকাবে বলছ—গণ্ডমূর্খের মত তুমি এনেছ নাকি?"

"আনবার দরকার নেই—সে আমি অনুমানেই ব'লে দিতে পারি। আমার কথার যদি প্রমাণ চাও তো তোমার ব্যবস্থাপত্রগুলো নিয়ে তাদের কাছে যাও আর চেষ্টা ক'রে দেখ, তাদের মধ্যে একজনও লীলাকে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না! সমাজ-জিনিসটাকে ভালই বল আর মন্দই বল, সেটা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মতের ওপর দাঁড়িয়ে নেই,—সে নিজের মতে আর নিজের বলে চলেছে।"

বিরক্তিভরে শশিনাথ বলিল, "এ সব ব্যবস্থা আমি নিজের তুষ্টির জন্যে আনি নি, তোমাদের জন্যই এনেছিলাম। যদি তোমরা সন্তুষ্ট না হ'লে তো এ কথার এখানেই শেষ হ'ল। সমাজতত্ত্বের আলোচনা করবার মত আমার একটুও প্রবৃত্তি বা সময় নেই।" বলিয়া শশিনাথ প্রস্থানোদ্যত হইল।

সোমনাথ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "একটা কথা শুনে যাও শশি। ভাটপাড়া নবদ্বীপ থেকে পণ্ডিতদের মত তো এনেছ, কিন্তু এ বিষয়ে লীলার মত নিয়েছ কি? আমি তো যতদূর জানি, সে এ বিষয়ে একেবারেই রাজি নয়।

তোমার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, এ সব বিষয়ে জোরজবরদস্তি ক'রে কিছু ক'রো না। তুমি লীলার বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তার এই দুঃখ-যন্ত্রণার জীবনটা যে-ভাবে যতটা সুখের করতে পার, কর, তাতে আমার সম্পূর্ণ সাহায্য পাবে। দেশে একটা মেয়ে-স্কুল বা অনাথ-আশ্রম খোল, লীলাকে দাও তার ভার, পরোপকারে, দেশের কাজে তার জীবনটা সার্থক ক'রে তোল—তাতেই তার মঙ্গল হবে। কিন্তু রোগ হয়েছে ব'লে ওষুধেই তার প্রাণটা মেরো না।"

এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া দৃঢ়কণ্ঠে শশিনাথ কহিল, "তবে তাই হোক, সমাজের হাড়কাঠে চড়িয়ে তাকে বলি দাও। সে অধম, ঘৃণিত, নীচ, অস্পৃশ্য—কেন তাকে বাড়িতে স্থান দিয়েছ দাদা? পথে তাকে দূর ক'রে দাও। আমরা পবিত্র, আমরা মহৎ—কেমন ক'রে সে আমাদের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করবে? কিন্তু আজ তোমাকে এই কথা ব'লে যাচ্ছি দাদা, তোমাদের এই আভিজাত্যের অহঙ্কার, এই জোর ক'রে বড় হ'য়ে থাকার উৎপীড়ন, এই সমাজের দোহাই দিয়ে কসাইয়ের কাজ করা, এই ঘৃণা, এই ছোঁয়াছুঁতের নির্মমতা, এ বেশি দিন থাকবে না। এ সব একদিন গুঁড়িয়ে ধুলো হ'য়ে গুলিয়ে যাবে তাদের পায়ের তলায়, আজকে যাদের নীচ ব'লে ঘৃণা করছ। সে দিনের আর বেশি দেরি নেই।"

সোমনাথের নিকট হইতে আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শশিনাথ দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। নিশ্চল নির্বাক হইয়া সোমনাথ মূঢ়ের মত বসিয়া রহিল; এমন সে কতক্ষণ বসিয়া থাকিত বলা যায় না, যদি না উর্মিলা আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিত।

উর্মিলার দিকে ব্যথিত-কাতরনেত্রে চাহিয়া সোমনাথ বলিল, "উর্মিলা, এ সংসারে আগুন লাগল—আর থাকে না।"

স্বামীর স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে উর্মিলা বলিল, "অধীর তো তুমি কখনও হও না, আজ হচ্ছ কেন?"

"আজ বুঝতে পারছি নে ঊর্মিলা কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ,—কোন্‌টা কর্তব্য, কোন্‌টা অকর্তব্য। এ অস্থিরতা বড়ই কষ্টকর।"

কোন কথা না বলিয়া ঊর্মিলা ধীরে ধীরে সোমনাথের স্কন্ধে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অগোচরে তাহার চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু সোমনাথের হস্তে ঝরিয়া পড়িল।

৩৪

শীতটা তাহার শেষ আক্রমণের অবসানে যাই যাই করিতেছিল। আজ সকাল হইতে কলিকাতা শহরের মত প্রকৃতির কৃত্রিম পিঞ্জরেও কোকিলের ডাক এবং দক্ষিণ হাওয়ার প্রথম আভাস বসন্তের সূচনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর আপনার ঘরে বসিয়া লীলা একটা ডাকে-পাওয়া চিঠি সম্মুখে রাখিয়া উদাস অন্যমনস্ক-দৃষ্টিতে বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। রাস্তার দিকের একটা জানালাও সে আজ বন্ধ করে নাই,—সবগুলা দিয়া চাঁদের আলো এবং কোন-কোনটা দিয়া পথের গ্যাসের আলো বাঁকাভাবে ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল।

চন্দ্রালোকিত আকাশের গায়ে একটা ক্ষুদ্র স্তিমিত তারকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া লীলার গণ্ডে সহসা কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আজ সকালে এই চিঠিটা পাওয়ার পর হইতে তাহার মন, তাহার প্রাণ-পণ চেষ্টা সত্ত্বেও, বিহ্বল হইয়া গিয়াছে। সঙ্কল্পের কঠিন বাঁধনগুলা যেন সময়ে সময়ে আপনা-আপনি শ্লথ হইয়া আসিতেছিল। এই চিরপরিচিত, চিরপ্রিয়, হৃদয়ের শিরা-উপশিরা দিয়া দৃঢ়-নিবদ্ধ আশ্রয়-স্থল হইতে সমস্ত বাসনা-কামনার শিকড়গুলি উৎপাটিত করিয়া যাইতে হইবে—কোন্ অজানা

কোন্ অনির্দিষ্টের পথে! কোন্ দুরন্ত মহাসাগর পার হইয়া দূর-দূরান্তরে কোন্ বন্ধুহীন স্বজনহীন প্রবাসে অপরিচিত মনুষ্য-সমাজে জীবনের নূতন পর্যায় আরম্ভ করিতে হইবে—কত দিনের জন্য? কোথায় তাহার শেষ—কি তাহার সার্থকতা?

এই ঘরের অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাহার পরিচিত। চোখ বাঁধিয়া প্রবেশ করাইলেও এই ঘরের বায়ু আঘ্রাণ করিয়া সে বুঝিতে পারে; অন্ধকারে শয়ন করিয়া সে তাহার পালঙ্কের মৃদু সুখস্পর্শ চিনিতে পারে। ঘরের প্রতি সামগ্রী তাহার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত; চেয়ার তাহার জন্য নরম করিয়া গদি-আঁটা; সোফা তাহার মত নীচু করিয়া বাঁধানো। এই ঘরে সে সুখে হাসিয়াছে, দুঃখে কাঁদিয়াছে, রোগে ভুগিয়াছে, সম্পদে উপভোগ করিয়াছে; এই ঘরকে সে ভালবাসিয়াছে এবং এই ঘরে সে ভালবাসিয়াছে।

আজ সহসা এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অস্পষ্ট অনির্ণীত অজানার মধ্যে চলিয়া যাইবার জন্য আহ্বান আসিয়াছে! যাইতেই হইবে অথচ কানে কানে কে যেন বলিয়া বেড়াইতেছে—থাক থাক; প্রাণের মধ্যে কে যেন বলিতেছে—যেয়ো না, যেয়ো না। এই ব্যর্থ-ব্যথিত জীবনে আজ পর্যন্ত যে একমাত্র কামনার বস্তু হইয়া রহিয়াছে, সে তাহার ব্যাকুল বাহু বিস্তার করিয়া হৃদয়ের মধ্যে আহ্বান করিতেছে, এস, এস। তবু যাইতে হইবে। না যাইয়া আর উপায় নাই। এ কি নিষ্ঠুর নির্যাতন, এ কি নিদারুণ পরীক্ষা!

লীলা মনে মনে এই থাকা ও যাওয়ার, এই ভোগ ও ত্যাগের তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। এই যে চিরপরিচিত ও চিরবাঞ্ছিতকে ছাড়িয়া যাইতে মনের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে, এই ছাড়িয়া যাওয়াই তো তাহার যথার্থ মূল্য। এই ত্যাগের দুঃখে রঞ্জিত হইয়াই ভোগের বস্তু আজ এত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে; বিরহের সজল রেখাই মিলনের চিত্রকে এত কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অতএব ত্যাগই ভোগের এবং বিরহই মিলনের মূল্য।

লীলা মনে মনে সঙ্কল্প করিল, যত কষ্টেই হউক, যত দুঃখেই হউক, এ মূল্য সে নিশ্চয়ই পরিশোধ করিবে—ভোগ ও মিলনের দৈন্য কোনরূপেই সে সহ্য করিবে না।

ঘরে কেহ প্রবেশ করিবার শব্দে পশ্চাতে ফিরিয়া সরযূকে দেখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে লীলা আহ্বান করিল, "এস ভাই, এদিকে এসে বস।"

সরযূ আসিয়া লীলার নিকট একটা চেয়ারে বসিল। কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণের চিন্তা ও কল্পনার শৃঙ্খল হইতে নিজের মনকে একেবারে বিমুক্ত করিয়া লইতে লীলার একটু বিলম্ব হইতেছিল; সরযূও ঘরে ঢুকিয়াই অস্পষ্ট আলোকে নির্বাক গভীরভাবে লীলাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ঘরের সেই স্তব্ধ থম্‌থমে ভাবকে শব্দ বা বাক্যের দ্বারা সহসা খণ্ডিত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছিল।

লীলাই প্রথমে কথা কহিল; বলিল "সরযূ, আজও কি তোমার মাথা ধরেছে ভাই?"

সরযূ বলিল, "না, আজ ভাল আছি। তুমি চুপ করে একলাটি বসে আছ কেন লীলা?"

ঈষৎ হাসিয়া লীলা বলিল, "তুমি যখন এসেছ, তখন তো আর একলাও নই, চুপ করেও থাকব না। কি বলতে হবে বল?"

একটু নড়িয়া বসিয়া সরযূ বলিল, "একটা কথা—যদি সত্যি করে বল।"

"কি কথা?"

"তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় কথাটা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন ভাই?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া লীলা বলিল, "আমার জীবনের সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর কথাটা তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা হ'ল সরযূ, তখন আর সে কথাটা বড় ছিল না, ভয়ঙ্কর হয়ে গিয়েছিল।"

সরযূ বলিল, "আচ্ছা বেশ, তোমার সেই দুঃখের কথাটাই বল নি কেন?" দুঃখের কথা শোনবার মত কি আমাদের মধ্যে ভালবাসা ছিল না?"

একটু উত্তেজিত-স্বরে লীলা বলিল, "তা নয় সরযূ, আমাদের ভালবাসা অনিষ্ট করবার মত সামান্য ছিল না, তাই বলি নি। দুঃখের কথা শোনবার যদি তোমার তত সাধ হ'য়ে থাকে, তবে আর দুঃখ কি ভাই? আমার দুঃখের কারবার সুদে আসলে এখন খুব বড় হ'য়ে উঠেছে,—যদি নিতান্ত জেদ কর, একদিন না হয় তোমাকে তার কিছু অংশ দেব; কিন্তু আজ তুমি শশিদার চর হ'য়ে এসেছ,—আজ নয়।"

মনে মনে বিস্মিত হইয়া সরযূ একটু দৃঢ়ভাবে বলিল, "চর হ'য়েই এসে থাকি, আর নিজেই এসে থাকি, তুমি আমার ভালবাসাকে সন্দেহই কর আর অপমানই কর, আমি কিন্তু আজ তোমার—"

সরযূকে কথা শেষ করিতে না দিয়া লীলা তাড়াতাড়ি বলিল, "এ কথা কেন বলছ ভাই, তোমার ভালবাসার অপমান তো আমি করি নি। নিজ হ'তে তুমি যদি এসে থাক, তা হ'লে আমার ওপর তোমার ভালবাসা অসীম। চর হ'য়ে যদি এসে থাক, তা হ'লে শশিদার ওপর তোমার ভালবাসার তুলনা নেই। আমি তো তোমার মন জানি সরযূ, আমি তো সব বুঝতে পেরেছি ভাই।"

"লীলা!"

"কি বলছ?"

"আমার একটা কথা রাখবে ভাই?"

"না।"

বিস্মিতভাবে সরযূ বলিল, "না শুনেই 'না'?"

"না শুনেই বটে, কিন্তু না বুঝেই নয়। কি ছেলেমানুষি করছ সরযূ?—এমন বোকা মেয়ে তো আমি ভূ-ভারতে দেখি নি!"

অতি কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া সরযূ বলিল, "তা দেখ নি তো দেখ নি,

কিন্তু আমার এ কথাটা তোমাকে রাখতেই হবে। না রাখলে আমি বড় দুঃখিত হব।"

মৃদু হাসিয়া লীলা বলিল, "আর রাখলে ভারি সুখী হবে তো? বল, বল? সত্যি ক'রে বল?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, ঢোঁক গিলিয়া সরযূ বলিল, "বোধ হয় হব। তুমি সুখী হ'লে আমি সুখীই হব।"

লীলা হাসিয়া বলিল, "আর তুমি সুখী হ'লে কি আমার সুখী হবার অধিকার নেই?"

একটু ভাবিয়া সরযূ বলিল, "তা আছে। কিন্তু তোমার আমার সুখের কথা ভাবলে তো চলবে না লীলা। আমাদের দেখতে হবে, তিনি কিসে সুখী হন। তিনি যাতে সুখী হন তাই আমাদের করতে হবে, তা যতই কষ্ট হোক না কেন।"

"তিনি কিসে সুখী হবেন তা কেমন ক'রে জানলে সরযূ?"

লীলার এ প্রশ্নে সরযূ বিপদে পড়িল—এবার আর ধরা না পড়িয়া উপায় নাই। ধরা যখন পড়িতেই হইল, তখন আর ইতস্তত না করিয়া সরযূ বলিল, "তা আমি জানি। কিসে তিনি সুখী হন, সে কথা তাঁরই মুখে শুনেছি।"

"তাঁরই মুখে?—উঃ! কি নিষ্ঠুর!" কথাটা এমন করিয়া খুলিয়া বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঝোঁকের মাথায় বাহির হইয়া গেল।

লীলার কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে সরযূ বলিল, "ছি লীলা! অন্যায় কথা ব'লো না ভাই। তাঁকে তুমি নিষ্ঠুর বলছ, কিন্তু তাঁর মত কোমল আমি আর একজনও দেখি নি। তোমার জন্যে তিনি যে কষ্ট পাচ্ছেন, তা দেখলে চোখে জল আছে।"

"আর তোমাকে তিনি যে কষ্ট দিচ্ছেন, তা দেখলে মুখে শক্ত কথাই আসে।"

"তিনি আমাকে কেন কষ্ট দেবেন লীলা? আমার জন্যে তাঁকে কোন দোষ দেওয়া যায় না। তিনি তো কখনো আমাকে—" সহসা সরযূর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

একটু অপেক্ষা করিয়া লীলা বলিল, "আচ্ছা, তিনি যেন কখনও তোমাকে না-ই ভালবেসেছেন ; কিন্তু তোমার কথা তো আমি জানি সরযূ। তোমার কি দশা হবে?"

"আমি যদি তোমাদের কথা আগে জানতাম লীলা, তা হ'লে কখনই—" আবার সরযূর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

সরযুর অসমাপ্ত বাক্যের অনুবৃত্তি করিয়া লীলা বলিল, "তা হ'লে কখনই শশিদাকে ভালবাসতে না? কিন্তু ভাল যে বেসে ফেলেছ ভাই, এখন তার উপায় কি?"

হঠাৎ একটা সন্দেহ হওয়ায় লীলা ডাকিল, "সরযূ!"

কোন উত্তর না পাইয়া লীলা তাড়াতাড়ি হাতের কাছে সুইচটা টিপিয়া ঘর আলোকিত করিয়া দেখিল, তাহার অনুমান ভুল নহে, দরবিগলিত ধারায় সরযুর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

"তুমি কাঁদছ সরযূ?"

অন্ধকারে সরযূ নিশ্চিন্ত ছিল, ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল না বলিয়া সাবধানও হয় নাই। হঠাৎ এইরূপে ধরা পড়িয়া গিয়া প্রথমটা সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল, তাহার পর তাড়াতাড়ি অঞ্চলে দুই চক্ষু মুছিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া বলিল, "তুমি কাঁদিয়ে দিলে কাঁদব না? এ তোমার অন্যায় লীলা।"

বিস্মিত-স্মিতমুখে লীলা বলিল, "আমার অন্যায়? এ বেশ কথা সরযূ! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে—চোর!"

সরযূ কাতরনেত্রে চাহিয়া বলিল, "তা নয় ভাই। তুমি আমাকে এমন সহানুভূতির কথা ব'লো না, যাতে আমার কান্না আসে। আমার ওপর তোমার যদি বাস্তবিকই দয়াভালবাসা থাকে, তা হ'লে আমি যাতে সুখী হই তাই কর।"

"আমার সেটুকু বিবেচনা আছে সরযু। তুমি তাতে সুখী হবে না।"

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া লীলার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া সরযু বলিল, "হব ভাই, হব। আমাকে বিশ্বাস কর, হব। তুমি তোমার শশিদাকে বিয়ে করতে রাজি হও, তা হ'লেই আমি সুখী হব। নইলে আর কোন উপায় নেই। আর একটা কথা লীলা, আমি মিনতি ক'রে বলছি ভাই, আমার এ কান্নার কথা তাঁকে জানিয়ো না—আমি বড়ই অন্যায় করেছি। আমি এখন চললাম, আবার আমার মাথা ধ'রে আসছে।"

গমনোদ্যত সরযুকে দুই বাহুতে বেষ্টন ক'রিয়া ফেলিয়া লীলা বলিল, "শুধু একটা কথা ব'লে যাও সরযু। শশিদাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে না হ'লে তুমি বরেনবাবুকে বিয়ে করতে রাজি আছ কি না?"

একবার সরযু করুণ-ক্লিষ্টনেত্রে লীলার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর লীলার বাহুবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "সে কথা এখন থাক্ ভাই, সে পরের কথা পরে হবে।"

আরও দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া লীলা বলিল, "সেইটেই আগেকার কথা। সেটা না বললে তোমাকে ছাড়ছি নে!"

লীলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সরযু একবার একটু ইতস্তত করিল—তাহার পর বলিল, "দেখ লীলা, আমার ভবিষ্যৎ আমি কাল রাত্রেই ঠিক ক'রে নিয়েছি! জীবনেও আমার ঘৃণা হ'য়ে গেছে, বিয়েতেও আমার ঘৃণা হ'য়ে গেছে। পরের সঙ্গে কারবার আমার পোষাবে না ভাই। আমি ঠিক করেছি, এই রকমেই জীবনটা কাটিয়ে দোব। আমার তো সংসারে কেউ নেই—কাজেই সে বিষয়ে আমার কোন অসুবিধেও নেই।"

আবার সরযুর গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে আরম্ভ করিল। লীলা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া বক্ষের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। একই ব্যাধের শরে দুইটি বিহগীর হৃদয় বিদ্ধ। বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা না বলিয়া এই দুইটি আর্ত নারী নীরব অথচ গভীর সহানুভূতি-ভরে পরস্পরকে জড়াইয়া রহিল।

সেই রাত্রেই কিছু পরে শশিনাথের ঘরে মৃদু করাঘাত পড়িল।

"শশিদা!"

দ্বার খুলিয়া লীলাকে দেখিয়া শশিনাথ বলিল, "ভেতরে আসবে?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া লীলা দ্বার ভেজাইয়া দিল। তাহার পর শশিনাথের উৎসুক-ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার কাছে দুটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি শশিদা—এ দুটি বোধ হয় তোমার কাছে আমার জীবনের শেষ-প্রার্থনা।"

শশিনাথের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "তাই যদি হয় তা হ'লে এ দুটি প্রার্থনা আজ না ক'রে—আমার অন্তিম দিনের জন্যে রেখো, প্রাণটা এখনও কিছুদিন তো দেহে থাকতে পারে।"

শশিনাথের কথা শুনিয়া দুঃখিতস্বরে লীলা বলিল, "এ সব কথা বললে মেয়েরা মনে কষ্ট পায় ব'লেই কি তোমরা এ সব কথা বল? তা যাই বল না কেন—আজ আমাকে ফাঁকি দিলে চলবে না, আজ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতেই হবে।"

"কি তোমার প্রার্থনা, শুনি?"

একটু ইতস্তত করিয়া মনে মনে কঠিন হইয়া লইয়া লীলা বলিল, "প্রথমত সরযুকে তোমায় বিয়ে করতে হবে; দ্বিতীয়ত কাল সকালবেলা আমাকে বিদায় দিতে হবে।"

মুহূর্তের জন্য শশিনাথের মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু তখনই সংযত হইয়া বলিল, "বিয়ের কথাটা পরে হবে, বিদায় দেওয়ার কথাটা কি শুনি, একেবারে ইহজীবনের মত নাকি?"

লীলার চোখ দুইটা হঠাৎ ছলছল করিয়া উঠিল। নতনেত্রে বলিল, "বলা যায় না—তাও হ'তে পারে।"

মনে মনে অধীর ও উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া শশিনাথ বলিল, "কথাটা আরও স্পষ্ট ক'রে না বললে বুঝতে পারছি নে।"

কোন কথা না বলিয়া লীলা বস্ত্রমধ্য হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া শশিনাথের হস্তে দিল।

চিঠিটা আত্মন্ত পাঠ করিয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া, খামের উপর ডাকের ছাপ তারিখ ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া শশিনাথ শুষ্কভাবে বলি , "এ নিকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় কে ? বরেনের ভগ্নিপতি ?"

মৃদুকণ্ঠে লীলা বলিল, "হ্যাঁ।"

ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে শশিনাথ লীলার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল; তাহার পর তীব্র বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিল, "আমি এখন আর তা হ'লে আমাদের লীলার সঙ্গে কথা কচ্ছি নে; আমি কথা কচ্ছি রেঙ্গুন বেঙ্গলি গার্ল'স স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে—মাসে একশো টাকা মাইনে—স্বাধীন, স্বতন্ত্র, আমাদের সব রকম শাসন-বাঁধনের বাইরে!"

নদী পাহাড় হইতে নামিয়া যখন নরম মাটির বুক চিরিয়া বয়, তখন অনেকটা শান্ত-সংযত-ধারায় বহিয়া চলে; কিন্তু হঠাৎ কঠিন পার্বত্য-ভূমিতে আসিয়া পড়িলে তখন আর সে সংযত-গতিতে আবদ্ধ থাকে না, তখন সে একেবারে ফুলিয়া ফুঁসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সেইরূপ শশিনাথের প্রেম এতদিন অনেকটা শান্ত-আকারেই বহিতেছিল, আজ সে লীলার কঠিন আচরণে আহত হইয়া একেবারে বিদ্রোহীর মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লীলা কিন্তু জলোচ্ছ্বাসের নিম্নে স্তব্ধ পাষাণেরই মত নিশ্চল নির্বিকার ভাবে বলিল, "তা হচ্ছে না শশিদা, বাজে কথা ব'লে ফাঁকি দিলে চলবে না; আজ আমার দুটি কথাই রাখতে হবে।"

লীলার সে কথায় কোন প্রকার মনোযোগ না দিয়া অগ্নিমূর্তি হইয়া শশিনাথ বলিল, "চমৎকার লীলা, চমৎকার! এ অতি সুন্দর ব্যবহার! মূর্তিমতী কৃতজ্ঞতা তুমি! সেদিন যে চক্রবৃদ্ধিহারে ঋণ পরিশোধ করবার কথা তুলেছিলে, তার আর কিছু বাকি রাখলে না!—একেবারে কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রে দিলে! চমৎকার!"

একবার সজল-কাতর দৃষ্টি শশিনাথের মুখে নিবদ্ধ করিয়া পরমুহূর্তেই নত নেত্র হইয়া লীলা বলিল, "সে দিন আমার ঘাড়ে শয়তান চেপেছিল তাই ও-কথা বলেছিলাম। তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করবার নয় শশিদা।"

তীব্র-কটাক্ষে চাহিয়া শশিনাথ বলিল, "তা তো দেখতেই পাচ্ছি! তাই একেবারে দেউলের মত মহাজনের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে চাচ্ছ!"

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও লীলার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, মহাজন যে সর্বদা দেহ-গ্রেপ্তারের ভয় দেখায়?"

শশিনাথেরও মুখে বিদ্রূপের কঠিন হাসি দেখা দিল; বলিল, "তাই নাকি দেহটা নতুন মহাজনের হাতে সমর্পন করছ? জাহাজে তিনিও তোমার সঙ্গে থাকবেন তো?"

বিস্মিত হইয়া লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"তোমার গুপ্তমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতক বরেন?"

লীলার মুখ শক্ত ও আরক্ত হইয়া উঠিল। দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, না শশিদা, বরেনবাবু আমার গুপ্তমন্ত্রী নন, বিশ্বাসঘাতকও নন। তিনি কেন আমার সঙ্গে জাহাজে থাকবেন? কাল আমি যাচ্ছি, এ খবরও খুব সম্ভবত তিনি জানেন না। চিঠি তো তুমি প'ড়ে দেখলে! গুপ্ত-সাহেবের স্ত্রীর হঠাৎ যাওয়া না হ'লে আমার যাওয়ার এখনও দেরি ছিল। বরেনবাবু তোমাকে কোন কথা বলেন নি ব'লে তাঁর ওপর তুমি রাগ ক'রো না। তাঁকে যদি আমি প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়ে না িতাম, তা হ'লে কখনই তিনি এ কথা তোমাকে না ব'লে থাকতেন না। তিনি আমাকে অনেক মানা করেছিলেন, কিন্তু যখন বুঝলেন যে, আমার কথা না রাখলে আরও বেশি অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা, আর যখন আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, তোমাদের না জানিয়ে কিছু করব না, তখন তিনি তাঁর ভগ্নিপতির নামে আমাকে একটা পরিচয়-পত্র লিখে দিয়েছিলেন; এর বেশি তিনি কিছুই করেন নি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমিই সব ব্যবস্থা করেছিলাম।"

শশিনাথের দুই চক্ষু দীপ্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতে লাগিল। তীব্র-কণ্ঠে বলিল, "বরেন তোমার কি জানে?—পরিচয়-পত্র আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিলে না কেন? আমি লিখে দিতাম, একজন হৃদয়হীনা পাষাণীকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি, দয়া মমতার সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক নেই। ইনি আপনাদের মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হ'লে—মেয়েরা বেশ লায়েক হ'য়ে উঠবে।"

অভিমানের এই প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে লীলার হৃদয়ে বহু-যত্নে নির্মিত সমস্ত বাঁধ-বাঁধন একেবারে ভাঙিয়া ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আবেদন-আকিঞ্চনের অবিরাম গুঞ্জনে যাহার কিছুমাত্র সাড়া পাওয়া যায় নাই, অভিমানের আঘাতে তাহা একেবারে কাঁপিয়া ভাঙিয়া পড়িবার মত হইল। কিন্তু ভাঙিয়া পড়িবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তেই লীলা কোন প্রকারে সামলাইয়া লইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "না, না, শশিদা, এতে ভালই হবে, এতে তুমি বাধা দিয়ো না। বাস্তবিকই আমি পাষাণী, কিন্তু তুমি নির্দয় হ'য়ে পাষাণের মধ্যে লোভ জাগিয়ে তুলো না।"

শশিনাথ হাসিয়া উঠিল।—"নির্দয় হয়ে? কিন্তু তোমার দয়া সেদিন কোথায় ছিল লীলা, যেদিন চটিজুতো চুরি ক'রে আমার মনে লোভের আগুন জ্বেলে দিয়েছিলে? শ্বশুর-বাড়িতে রোজ সকালে আমার একশো আট নাম লিখবে ব'লে যেদিন আমার মনকে মাতাল ক'রে তুলেছিলে, সেদিন তোমার দয়া কোথায় ছিল?"

"আমার সে দুর্বুদ্ধিকে ক্ষমা ক'রো শশিদা।"

"ক্ষমা? কিছুতেই নয়। তার আমি দস্তুরমত প্রতিশোধ দিতে চাই। কি ক'রে—তা দেখবে এস।" বলিয়া শশিনাথ দৃঢ় মুষ্টিতে লীলার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া ঘরের এক কোণে একটা ছোট টেবিলের নিকট উপস্থিত করিল।

একটা বড় রেশমী রুমাল দিয়া ঢাকা টেবিলের উপর কোন জিনিস ছিল। রুমালটা তুলিয়া লইয়া শশিনাথ বলিল, "এই দেখ, তোমার জুতো চুরির প্রতিশোধ।"

সতীতি-বিস্ময়ে ত্রস্ত-নেত্রে লীলা চাহিয়া দেখিল, একটি মনোহর কট্-গ্লাসের মঞ্চে ফোটোগ্রাফ রাখিবার যুগল আধারে তাহার ও শশিনাথের দুইটি চিত্র পাশাপাশি রাখা ও সন্ধ্যাকালে গাঁথা সুগন্ধি-পুষ্পের মাল্য দিয়া উভয় চিত্র এক বেষ্টনে বেষ্টিত। প্রকৃত-জীবনে যে দুইটি দুর্ভাগ্য প্রাণী উত্তাল-তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া কাছাকাছি থাকিয়াও পাশাপাশি হইতে পারিতেছে না, ছবি-জীবনে তাহারা পরম নিশ্চিন্তভাবে পাশাপাশি হইয়াছে; কোন উদ্বেগ, কোন উৎকণ্ঠা নাই। এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত বিস্মৃত হইয়া মুগ্ধ চকিত নেত্রে লীলা এই অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য মিলন-চিত্র দেখিল। হায়, এ যদি শুধু ছবিই না হইত!

লীলার স্তব্ধ-বিস্মিত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া শশিনাথ বলিল, "কেমন লাগছে লীলা?—ভারি বিশ্রী কি?"

শশিনাথের কথায় চৈতন্য লাভ করিয়া লীলা ব্যাকুলভাবে বলিল, "দাও, শশিদা, দাও, তোমাকে মিনতি ক'রে বলছি, এ ফোটোগ্রাফ আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমি তো তোমার চটিজুতো ফিরিয়ে দিয়েছিলাম"

শশিনাথের মুখে বিচিত্র হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "অসম্ভব। তা হ'লে একশো আট নামের প্রতিশোধ দোব কি ক'রে?"

মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া লীলা বলিল, "ছি ছি, ছি! একজন সামান্য মেয়েমানুষের জন্য তুমি নিজেকে অত নীচু ক'রো না শশিদা।"

"একজন সামান্য পুরুষের জন্যে তুমি কতটা নীচু হয়েছিলে, তা তো আমার মনে আছে লীলা। স্বামীর বাড়িতেও তুমি তার একশো আট নাম লেখবার কথা তুলে ছিলে। তুমি রেঙ্গুন চ'লে গেলে সে-ও রোজ রোজ রাত্রে একশো আট বারেই তার প্রতিশোধ নেবে। কি ক'রে, তা নিজের চোখে একবার দেখে যাও।"

অতি সন্তর্পণে শশিনাথ সেই ফোটো-ফ্রেম হইতে লীলার ফোটোখানা বাহির করিয়া লইল; তাহার পর মুহূর্তের জন্য সতৃষ্ণ নেত্রের উদাদ-দৃষ্টি তাহার উপর

নিবদ্ধ করিয়া "এই রকম ক'রে লীলা" বলিয়া অকস্মাৎ সেই চিত্রের শান্ত নির্বিকার মুখে চুম্বনের পর চুম্বনে—অজস্র চুম্বন ভরিয়া দিল।

কাগজের উপর ছবির মুখ তেমনি অম্লান প্রফুল্ল হইয়া রহিল, কিন্তু নিজের মুখচ্ছায়ার উপর সেই অধীর উন্মত্ত চুম্বনের লীলা দেখিতে দেখিতে রক্ত-মাংসের আসল মুখখানা প্রথমে পাংশু, ক্রমশ নীলবর্ণ হইয়া গেল। চক্ষু স্থির হইয়া দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসল এবং পর-মুহূর্তেই লীলার বিবশ বিকল দেহ শশিনাথের দেহের উপর লাটিয়া পড়িল।

ঠিক আর একদিনেরই মত শশিনাথ লীলার শিথিল দেহ দুই বাহুর মধ্যে উঠাইয়া লইয়া শয্যায় শুয়াইয়া দিল; আজ কিন্তু সে-দিনের মত লীলার শয্যায় নহে, আজ তাহার নিজের বিছানায়।

গুরুতর উত্তেজনায় লীলার এরূপ ক্ষণস্থায়ী মূর্ছা হইতে শশিনাথ পূর্বেও দেখিয়াছে, তাই সে এবার তেমন চিন্তিত না হইয়া লীলার মুখে-চোখে জলের হাত বুলাইয়া দিয়া একটা হাতপাখা দিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

দ্বারের নিকট পদধ্বনি এবং কণ্ঠস্বর শুনা গেল। পাছে কেহ ঘরে প্রবেশ করিয়া লীলাকে তদবস্থায় দেখে, এই আশঙ্কায় শশিনাথ দ্বার বন্ধ করিলে শব্দ হইবে বলিয়া, তাড়াতাড়ি সুইচ টিপিয়া আলো নিভাইয়া দিল; কিন্তু ঠিক পর-মুহূর্তেই "শশি, ঘরে আছ" বলিয়া সোমনাথ দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, এবং তাহার পিছনে পিছনে একটি স্ত্রীমূর্তি—অর্থাৎ উর্মিলা।

শশিনাথ তাড়াতাড়ি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ততক্ষণে তাহারা উভয়েই ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল।

উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে সোমনাথ কহিল, "লীলাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার ঘরের দোর খোলা দেখে উর্মিলা ঢুকে দেখে, ট্রাঙ্ক বাক্স সব খোলা—জিনিসপত্র সব ছড়ানো, কিন্তু সে নেই। তার পর সব জায়গা খোঁজ হয়েছে—কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।"

সভয়ে কম্পিত-কণ্ঠে ঊর্মিলা বলিল, "কি হবে ঠাকুরপো ?"

এক মুহূর্ত ভাবিয়া শশিনাথ বলিল, "কোন ভয় নেই। সে এই বাড়িতেই আছে। তোমরা এগোও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

ঘরে আলো না থাকিলেও জানালা দিয়া পথ হইতে এবং দ্বার দিয়া বারান্দা হইতে অল্প যেটুকু আলো আসিতেছিল, তাহাতেই ক্রমশ ঘরের ভিতর একটু আলোকিত হইয়া আসিয়াছিল। ঘরের ভিতরের দ্রব্যাদি স্পষ্ট দেখা না যাইলেও তাহাদের অস্পষ্ট আকার ক্রমশই ফুটিয়া উঠিতেছিল।

ঊর্মিলা ব্যাকুলভাবে বলিল, "কিন্তু ঠাকুরপো, সে কোথাও নেই। আমি দেখতে কিছু বাকি রাখি নি।"

শশিনাথের উত্তর দিবার পূর্বেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া লীলা খাটের উপর উঠিয়া বসিল। স্পষ্ট দেখা না যাইলেও উহা যে মনুষ্য-মূর্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না।

"খাটে কে ?" বলিয়া ত্বরিতপদে সোমনাথ গিয়া আলো জ্বালিয়া দিল। ঊর্মিলা দেখিল, শশিনাথের শয্যার উপর বসিয়া লীলা। কয়েক মুহূর্ত সোমনাথ, ঊর্মিলা বা শশিনাথ তিনজনের মধ্যে কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, এবং লীলা বিস্মিত-নেত্রে একবার তিনজনকে নিরীক্ষণ করিয়া, একবার শশিনাথের শয্যার উপর চকিত-ব্যাকুল দৃষ্টি বুলাইয়া, তাড়াতাড়ি বস্ত্র সম্বৃত করিয়া ভূমিতলে নামিয়া দাঁড়াইল।

এই বিসদৃশ দৃশ্য ও অবস্থা দেখিয়া একটা বিকট ঘৃণা ও ক্রোধে সোমনাথ মুহূর্তের মধ্যে তাহার মানসিক সংযম হারাইল। ঊর্মিলার দিকে চাহিয়া সে দীপ্তরোষে বলিল, "এখন তো নিশ্চিন্ত হ'লে ঊর্মিলা ? এখন চল। আমি তো বলেছিলাম তোমাকে, সংসারে আগুন লেগেছে—আর রক্ষে নেই।"

ঊর্মিলার কথা কহিবার শক্তি ছিল না, নড়িবার শক্তিও ছিল না—তাহার শরীর কাঁপিতেছিল, পদদ্বয় অবশ হইয়া আসিয়াছিল। সে নিঃশব্দে নিকটস্থ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এবার শশিনাথ কথা কহিল। তীব্র কণ্ঠে বলিল, "কে আগুন লাগাবে দাদা? কিসে আগুন লাগল?"

শশিনাথের এই রোষ-বিদ্রূপ-মিশ্রিত কথা শুনিয়া যে ধৈর্য সোমনাথ বহু কষ্টে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ একেবারে লুপ্ত হইল। বলিল, "তোমাদেরই পাপে আগুন লাগল, আর কিছুতেই নয়। তুমি যে পণ্ডিতদের মত এনেছিলে—এখন দেখছি তারাই পণ্ডিত, আমি মূর্খ। তারা তোমাকে চিনতে পেরেছিল, তাই মত দিয়েছিল। আমি তোমাকে চিনতে পারি নি।" তাহার পর লীলার দিকে ফিরিয়া বলিল, "লীলা, আমি বড় দুঃখিত—ভারি দুঃখিত হয়েছি। এর বেশি তোমাকে আমার আর বলবার কিছু নেই।"

লীলার প্রস্তর-মূর্তির দিকে চাহিয়া শশিনাথ বলিল, "আমারও তোমাকে বেশি কিছু বলবার নেই লীলা। কৈফিয়ৎ দিয়ে, ক্ষমা চেয়ে যদি এ বাড়িতে থাকবার তোমার শখ থাকে, তা হ'লে ওদিকে গিয়ে সেই চেষ্টা কর; আর তাতে যদি প্রবৃত্তি না হয়, তা হ'লে আজকের রাতটাও এ বাড়িতে কাটিয়ে কাজ নেই—চল আমরা জগৎ সুরের লেনের বাড়িতে গিয়ে উঠি। সে বাড়ি তোমার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা প্রস্তুত হ'য়ে আছে। যাবে?"

লীলার মুখ হইতে সহসা যেন একরাশ মেঘ কাটিয়া গেল। বলিল, "এখনি!"

প্রসন্নমুখে শশিনাথ বলিল, "তবে আর কোন কথা নেই, যাও—তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমিও আমার দু-চারটে জিনিস গুছিয়ে নিই।"

লীলাকে লক্ষ্য করিয়া সোমনাথ বলিল, "তুমি যদি আমাকে বা ঊর্মিলাকে কোন কথা বলতে চাও লীলা, তো বলতে পার। তোমার বলবার কোন কথা থাকলে—কোন দিনই আমি তা শুনতে অবহেলা করব না।"

শান্তস্বরে লীলা বলিল, "আমার শুধু এই বলবার আছে যে, যত উপকার আপনারা আমার করেছেন, তত অপকার আপনাদের ক'রে এ বাড়ি থেকে আমি বিদায় হচ্ছি। যদি আমাকে ক্ষমা করা সম্ভব হয় তো করবেন। আর

একটা কথা, আমি যে এই বিদায় হচ্ছি—তা আজকের ঘটনার জন্যে দুঃখে বা অভিমানে নয়, তা আপনারা শীঘ্রই বুঝতে পারবেন। আর আমার বলবার কিছু নেই।”

উদ্যত অশ্রু কোন প্রকারে চাপিয়া বস্ত্রাঞ্চল গলদেশে বেষ্টিত করিয়া লীলা ভূমিষ্ঠ হইয়া সোমনাথ ও ঊর্মিলাকে প্রণাম করিল।

৩৫

পরদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া ঊর্মিলা পথের দিকে বারান্দায় আসিয়া বসিল। সমস্ত রাত্রি তাহার জাগিয়া ও কাঁদিয়া কাটিয়াছে,—নিদ্রা এক মুহূর্তের‍ও জন্য তাহাকে দুঃখ ও বেদনা হইতে মুক্তি দেয় নাই। এখনও নিষ্ঠুর অপরিহার্য চিন্তা তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্তকে দুষ্ট কীটের মত একই ভাবে দংশন করিতেছিল। এ ভীষণ বিপর্যয় কোন্ পাপে, কাহার অভিশাপে ঘটিল, ঊর্মিলা তাহাই ভাবিতেছিল। আজ যে সংসার দুঃখ ও অনর্থের বোঝা মাথায় করিয়া চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া পড়িল, কয়েক দিন পূর্বেও সেই সংসারে সুখ জলের মত এবং আনন্দ বায়ুর মত নিরন্তর বহিত। দুঃখের তাপে, বেদনার প্রশ্বাসে এক বৃন্তে তাহার ও লীলার কলিকা-জীবন উন্মেষিত হইয়াছিল; সৌভাগের স্নিগ্ধ-শীতল বায়ুতে ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে আজ অকস্মাৎ এ কোন্ পাপে, কোন্ গুপ্ত-কীটের দংশনে, একজন ঝরিয়া গেল! তাহার পর সুখের সাথী, দুঃখের সহায় শশিনাথ তাহার জীবনে এবং সংসারের ভিতর কতখানি শূন্য করিয়া চলিয়া গেল, তাহা ভাবিয়া ঊর্মিলার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, যে-অভেদ্য রহস্যের ভিতর দিয়া একটা ঘৃণিতকলঙ্কের ছাপ লইয়া উভয়ে বাহির হইয়া গেল, তাহার কোন ভিত্তি না থাকিলেও গত রাত্রের ঘটনাই হয়তো তাহার ভিত্তি গাঁথিয়া দিল। ক্ষণে ক্ষণে ঊর্মিলার এই কথাটাই মনে হইতেছিল যে, কাল রাত্রে ঘটনাটা চক্ষে যেমন দেখিতেছিল—আসলে

হয়তো ঠিক তাহাই ছিল না; এমন কি, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার সময়ে গতরাত্রে সোমনাথও একবার সেই রকম সন্দেহই করিয়াছিল। কিন্তু কে তাহা প্রমাণ করিবে, কে তাহা বলিবে? যে দুইজন বলিতে পারিত—তাহাদের দুইজনকেই উর্মিলা বিলক্ষণ চিনে, তাহারা যে কোনদিন এ বিষয়ে কোন কৈফিয়ৎ দিবে তাহার ভরসা ছিল না।

পথে লোক-চলাচল তখনও তেমন আরম্ভ হয় নাই; বসন্ত-প্রত্যুষের তরল কুয়াসায় রাজপথ তখন অস্পষ্ট মলিন; পূর্বদিকে সবেমাত্র ধূসরবর্ণ হইতে রক্তাভ হইয়া আসিতেছিল। উর্মিলা শুব্ধ হইয়া প্রকৃতির সেই শান্তসংহত-মূর্তি দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল, সংসারকে পঙ্গু করিয়া যে দুইজন চলিয়া গিয়াছে—আবার তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া সংসারকে সচল করিবার কোন উপায় ছিল কি না? উপস্থিত জগৎ সুরের লেনের বাড়িতে যাইবার জন্য এবং তথায় আহার্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পাঠাইবার জন্য কেমন করিয়া স্বামীর অনুমতি লইবে, উর্মিলা তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতেছিল, এমন সময়ে নিস্তব্ধ রাজপথকে সচকিত করিয়া একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ঠিকাগাড়ি তাহাদের দ্বারে আসিয়া লাগিল। একটা অধীর উদ্‌ভ্রান্ত দুরাশা লইয়া উর্মিলা দ্রুতবেগে উঠিয়া রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ি হইতে বরেন নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। শুধু বরেনকে দেখিয়া অনেকটা হতাশ হইলেও এ কথা উর্মিলার মনে হইল যে, এত সকালে বরেন শশিনাথ-লীলারই কোন সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির নিকট গিয়া সে বরেনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

বারান্দায় উঠিয়া সম্মুখে উর্মিলাকে দেখিয়া বলিল, "বউদি, সরযূ উঠেছেন কি? তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে,—খুব শিগগির। তুমি গিয়ে দেখে এসে আমাকে বল।"

সরযূ তখন উঠিয়া ঘরের জানালা খুলিতেছিল। সরযূর ঘরের সম্মুখে গিয়া উর্মিলা বরেনকে হাত নাড়িয়া ডাকিল।

বরেন ঘরের সম্মুখে আসিয়া সরযূকে বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।" তাহার পর ঊর্মিলার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি একটু নির্জনে এঁর সঙ্গে কথা কইতে চাই। তুমি বউদি, এখন যেতে পার,—তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে তবে আমি যাব।"

ঊর্মিলা প্রস্থান করিলে বরেন সরযূর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার হস্তে একখানা চিঠি দিয়া বলিল; "এইটে প্রথমে পড়ুন।"

এত প্রত্যুষে বরেনের আগমনে ও তাহার সহিত নির্জনে কথা কওয়ার প্রস্তাবে সরযূ মনে সসঙ্কোচ বিস্ময় অনুভব করিতেছিল, চিঠিটা হাতে পাইয়া এক সঙ্গে কৌতূহল ও সঙ্কোচের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়ার সুবিধা হইল।

খাম ছিঁড়িয়া সরযূ দেখিল, লীলার চিঠি। চিঠিখানি এইরূপ :—

"ভাই সরযূ, এ চিঠিখানা তুমি যখন পাবে তখন আমি রেঙ্গুনের পথে জাহাজে চলেছি। ভগবান এ হতভাগিনীকে একেবারেই ভোলেন নি, একটা ব্যবস্থা করেছেন—জীবনটা কাটবার মত একটা চাকরি পেয়েছি, রেঙ্গুনে গার্লস্ স্কুলের হেড মিস্ট্রেস্।

"যাবার সময়ে তাড়াতাড়ি ক'রে তোমাকে এ চিঠিটা লিখেছি—দুটো কারণে। প্রথমত কাল রাত্রে বাড়ি ছেড়ে আসবার সময়ে তোমার কাছে বিদায় নিতে পারি নি—তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। দ্বিতীয়ত তোমাকে একটা অনুরোধ করবার আছে,—আর সেই অনুরোধের প্রসঙ্গে একটা কথা বলবার আছে। খুব সংক্ষেপে বলি।

"কাল রাত্রে তোমার সঙ্গে কথাবার্তার কিছু পরে শশিদার ঘরে আমার রেঙ্গুনে যাবার কথা বলতে গিয়েছিলাম। কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ আমার শরীরটা খারাপ হয়ে মূর্ছার মত হয়। যখন আমার চৈতন্য হ'ল, দেখলাম আমি শুয়ে আছি, ঘর অন্ধকার আর ঘরের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। আমি ধড়মড় ক'রে উঠে বসতেই ঘরে আলো জ্ব'লে উঠল, দেখলাম আমি শশিদার খাটে রয়েছি, আর ঘরের মধ্যে জামাইবাবু, দিদি আর শশিদাদা। পরে শশিদার

কাছে শুনেছি তিনি আমার মূর্ছা ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলেন, এমন সময়ে বাইরে পায়ের শব্দ শুনে আলো নিবিয়ে দিয়েছিলেন, ওরকম অবস্থায় আমাকে কেউ দেখে, এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তাঁর মত শক্ত লোকের পক্ষে ওটুকু নিশ্চয়ই দুর্বলতা হয়েছিল—সব সময়ে মানুষ কর্তব্য ঠিক নির্ণয় করতে পারে না—মুনিদেরও মতিভ্রম হয়।

"দড়ি দেখে মানুষের সাপ ব'লে ভুল হয়। ওরূপ অবস্থায় আমাকে দেখে জামাইবাবুর এবং সম্ভবত দিদিরও যে কথা মনে হয়েছিল, সে জন্যে আমি তাঁদের দোষ দিতে পারি নে; বিশেষত যখন শশিদার আর আমার কাছ থেকে তাঁরা কোন কৈফিয়ৎ পেলেন না। শশিদাদার প্রকৃতি তো তুমিও কিছু কিছু জান—কৈফিয়ৎ দেওয়া তাঁর প্রকৃতির বাইরে। আমি দিলাম না দুটো কারণে; প্রথমত মনে একটা ভারি ঘৃণা হ'ল। তুমি তো কিছু কিছু জান সরযু, এ পৃথিবীর মধ্যে তুমিই আমার এ দুঃখটা বুঝতে পারবে। যে অযাচিত সামগ্রী আমি আমার নিজের ঘরে ব'সে বার বার ফিরিয়ে দিয়েছি, সেই জিনিস চুরি করবার জন্যে আমি শশিদার ঘরে গিয়ে ঢুকব! হায় রে! এ কথা ভেবে হাসব, না, কাঁদব, তা ভেবে পাই নে। আমার কৈফিয়ৎ না দেওয়ার দ্বিতীয় কারণটা একটু অদ্ভুত—আমার মনের অবস্থাটা তুমি হয়তো ঠিক বুঝতে পারবে না। তবুও বলি। শশিদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি জামাইবাবুর আর দিদির কাছে বিদায় নিতে যেতাম। এই বিদায় নেবার ব্যাপারগুলো আমার পক্ষে কত কষ্টকর আর কঠিন ব্যাপার হ'ত, তা বুঝতেই পারছ। এতটা দুঃখ দিয়ে আর কতটা দুঃখ পেয়ে ই বিদায়ের ব্যাপার সাঙ্গ হ'ত! দিদিকে কি ক'রে রাজি করাব, সে তো আমার মনে একটা দুরূহ সমস্যা ছিল। কাল রাত্রির ঘটনা আমার সেই কঠিন চিন্তাকে একেবারে জলের মত সহজ ক'রে দিলে—আমার মনে হ'ল, যেন ভগবানেরই দয়া—আমার নিজের আর সংসারের মঙ্গলের জন্য আমি তা সেই ভাবেই গ্রহণ করলাম। বাঁধন কাটবার সময় এসেছিল—ভগবান যেমন ক'রে কাটালেন সেই ভাল।

"এই হ'ল ভাই, কাল রাত্রের ঘটনা। তারপর তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ---আমি সংসারে যে আগুন লাগিয়ে চললাম, তুমি তা নেবাতে চেষ্টা ক'রো। এই হতভাগিনীর দুঃখ লাঘব করতে গিয়ে শশিদাদা অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। তুমি তাঁকে বিয়ে ক'রে সুখী ক'রো। এ বিষয়ে কোন দ্বিধা কোন অভিমান রেখো না। কষ্ট যদি হয় তা সহ্য ক'রো। ছেড়ে থাকবার কষ্ট যদি আমি নিতে পারলাম, কাছে থাকবার ভার তুমি নিতে পারবে না ভাই?

"আমি যাতে দূর দেশে গিয়ে না থাকি—আমি যাতে অন্তত কলকাতায় বাস করি, সে জন্য শশিদাদা আমাকে পীড়াপীড়ি করছেন। আমি তাঁকে বলেছি, তিনি যদি তোমাকে বিয়ে করেন, শুধু তা হ'লেই আমি তোমার সঙ্গিনী হ'য়ে থাকতে পারি—অন্যথা নয়। তাতে তিনি প্রায় রাজি হয়েছেন। লক্ষ্মী ভাই, তুমি এতে বাদ সেধো না। তুমি ভেবে দেখো, এতে শুধু তোমার আমার নয়—সকলেরই মঙ্গল হবে। আমি যেদিন তোমার চিঠি পাব—তুমি রাজি হয়েছ, সেই দিনই রেঙ্গুন থেকে রওনা হব।

"আমাকে রেঙ্গুন পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন, শশিদাদা এই জেদ ধরেছেন। আমি তা-ও হ'তে দোব না—অন্তত এ জাহাজে তাঁর যাওয়া কিছুতেই হবে না। পরের জাহাজে তিনি যাতে না যেতে পারেন, সে ভার রইল তোমার ওপর।

"এ চিঠিখানা শশিদাদার হাতেই তুমি পাবে। চিঠিখানা প'ড়েই ছিঁড়ে ফেলো। জামাইবাবু বা দিদি যেন না দেখতে পান, তাতে তাঁরা মনে বড় কষ্ট পাবেন।

"আর সময় নেই। আশীর্বাদ করি, জীবনে তুমি সুখী হও; এবার যখন দেখা হবে, তখন যেন তোমার সুখে সুখী হ'তে পারি। আর যদি না দেখা হয় তো চিরদিনের জন্য বিদায়। ইতি—

তোমার—লীলা"

চিঠি শেষ করিয়া সজলনেত্রে সরযু বলিল, "এ চিঠি আপনি কেমন ক'রে পেলেন?"

বরেন বলিল, "স্টিমার-ঘাটে যাবার সময়ে শশি আমাকে চিঠিখানা দিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললে। আপনি তাকে বিয়ে করতে রাজি আছেন, এই মর্মে লীলাকে এক লাইন চিঠি লিখে দিলে, শশি বলেছে, লীলাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে শীঘ্র লিখে দিন—সাড়ে আটটায় স্টিমার ছাড়বে—ছ'টা বেজে গিয়েছে।"

কোন কথা না বলিয়া সরযূ ক্ষণকাল অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল। শশিনাথের সহিত তাহার বিবাহের এই ব্যবস্থাটা সরযূর কাছে পথে বসিয়া পায়স খাওয়ার মত অপমানজনক মনে হইল। এই অযাচিত অকারণ প্রসাদে সে একটুও রুচি বোধ করিল না—তাহার অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা তীব্র বিতৃষ্ণায় যেন বমি আসিতে লাগিল। এ পাওয়া, পাওয়া নহে, ইহার উপর তাহার কোন দাবি নাই। ইহাকে ভিক্ষা বল, অনুগ্রহ বল, অপ্রত্যাশিত লাভ বা যাহাই বল, ইহার মধ্যে অধিকারের মর্যাদা একবিন্দুও নাই। যে জিনিস তাহাকে আজ দেওয়া হইতেছে, তাহা তাহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই; এ শুধু আর একজনের করুণায় তাহার পাতে পড়িবার উপক্রম করিয়াছে। তাই এই কৃপালব্ধ সামগ্রীর প্রতি তাহার চিত্ত একান্ত বিমুখ হইয়া উঠিল, তা সে যতই উপাদেয় হউক না কেন। শশিনাথের প্রতি তাহার প্রেম, যাহার রুগ্ন বিকৃত-স্বরূপ আজ পর্যন্তও তাহার মনের মধ্যে যাই-যাই করিয়াও কিছুটা অপেক্ষা করিয়াছিল, এই নিদারুণ আঘাতে বিনষ্ট হইয়া তাহার রক্তমাংসহীন জীর্ণ কঙ্কালটি সরযূর চক্ষের উপর ও বক্ষের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। দুঃখে ও অপমানে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিবার উপক্রম হইল।

সরযূর নিশ্চেষ্ট নীরব ভাব দেখিয়া একটু ব্যস্তভাবে বরেন বলিল, "তা হ'লে চিঠিটা লিখে দিন।"

মুখ না ফিরাইয়া সরযূ বলিল, "ও-কথা আমি লিখব না।"

সরযূর সেই অসংশয়িত বাক্য শুনিয়া বরেন প্রথমটা নিরুত্তর হইয়া রহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "লিখে দিলেই ভাল হ'ত না কি?"

মনের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়াছিল বলিয়া আজ সরযূর মুখে কথার অভাব ছিল না; বরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কার ভাল হ'ত?"

উত্তর দিতে গিয়াই বরেনের অন্য একটা কথা মনে হইল। একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, "দেখুন, এ সব হিসেবপত্তরের মধ্যে আমার কথাটা একেবারেই ধরবেন না। আমাকে সব রকম হিসেবের বাইরে ফেলবেন।"

সরযূ ত্বরিত উত্তর দিল, "আপনাকে না হয় হিসেবের বাইরে ফেললাম, কিন্তু নিজেকে তো বাইরে ফেলতে পারি নে। আমার নিজের তো একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে বিচার বিবেচনা আছে!"

এ কথা শুনিয়া বরেনের মনে পূর্ব-সন্দেহই বর্ধিত হইল, বলিল, "এমন সব গোলযোগের সময় কথা অপরিষ্কার ক'রে রেখে কোন লাভ হয় না। আমি একটা কথা খুলেই আপনাকে বলি। আমি শশিনাথের কাছে এ কথাও শুনেছি—আপনি লীলাকে বলেছেন জীবনটা অবিবাহিতভাবে কাটানোই আপনার অভিপ্রায়। আচ্ছা, এ সঙ্কল্প আপনার কেন? আমি যদি কোন রকমে এর জন্যে দায়ী হই, তা হ'লে বাস্তবিকই ভারি দুঃখিত হব। আমি তো সেদিন আপনাকে বলেইছি, আমার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। আমরা পুরুষমানুষ—আমাদের উচিত যাতে আপনারা সুখী হন তাই করা। দেখছেন তো লীলার জন্যে শশিনাথ কতটা করতে প্রস্তুত! লীলার জন্যে সে যদি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হ'তে পারে—আমিও না হয় আপনার জন্যে কাউকে বিয়ে করব। (ঘড়ি দেখিয়া) সাড়ে ছটা প্রায় বাজে। আপনি চিঠিটা আমাকে লিখে দিন—আমি আপনার কাছে শপথ করছি, আপনাদের সঙ্গে এক-লগ্নেই আমাদের পাড়ার রাম বাঁড়ুজ্জের মেয়েকে আমি বিয়ে করব। মেয়েটি খোঁড়া ব'লে বিয়ে হচ্ছে না, ভদ্রলোকেরও উপকার হবে।"

একটা জানালা ভাল করিয়া খুলিয়া দিবার ছলে তাড়াতাড়ি একটু

সরিয়া গিয়া সরযূ উচ্ছল অশ্রু সামলাইয়া আসিল। বলিল, "আপনি রাম বাঁড়ুজ্জের মেয়েকে বিয়ে করবেন, কিন্তু লীলার কি উপায় হচ্ছে ?"

বরেন বলিল, "লীলা আপনাদের কাছে থাকবে।" তাহার পর সরযূ কোন কথা কহিবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বলিল, "কিংবা একটা কাজ করলে হয় না ? ধরুন, আমি যদি লীলাকে বিয়ে করি ?—তা হ'লে তো সব গোল মিটে যায় ?"

সরযূর মুখে অতি মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। প্রাণপণে হাসি চাপিয়া বলিল, "লীলা তাতে রাজি হবে কেন ?"

একটু ভাবিয়া বরেন বলিল, "লীলা যেমন আপনাকে অনুরোধ করেছে, আপনিও যদি তেমনি তাকে অনুরোধ করেন ? শশিকে বিয়ে করবার সেইটেই যদি আপনি শর্ত করেন ?"

সরযূ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "লীলা আমাকে অন্যায় অনুরোধ করেছে ব'লে আমি লীলাকে অমন অন্যায় অনুরোধ করব কেন ?"

হতাশ হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া বরেন বলিল, "সাড়ে ছটা বাজল। তবে কি কোন উপায়ই নেই ?"

মৃদু-কণ্ঠে সরযূ বলিল, "আছে।" আমাকে স্টিমার-ঘাটে নিয়ে চলুন—আমি অন্য রকম অনুরোধ ক'রে লীলাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।"

ব্যগ্রভাবে বরেন বলিল, "কি অনুরোধ ?"

"লীলা যাতে শশিনাথবাবুকে বিয়ে করে, সেই ব্যবস্থা ক'রে আমি তাকে ফিরিয়ে আনব।"

"পারবেন ?"

"পারব।"

রুদ্ধশ্বাসে বরেন বলিল, "আর আপনি ? আপনি কি করবেন ?"

পূর্বদিক হইতে নবোদিত সূর্যের কিরণে সরযূর মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়াই

ছিল; কিন্তু অশোক ফুলের উপর আবীর ছড়াইয়া দিলে যেমন হয় তেমনি সরযূর গণ্ডদ্বয় লালের উপরেও লাল হইয়া উঠিল। এবার তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। সে নতনেত্রে মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অধীর হইয়া বরেন বলিল, "বলুন, বলুন—আপনি কি করবেন বলুন?"

কম্পিত-কণ্ঠে সরযূ বলিল, "আপনি যা আদেশ করবেন, তাই করব।"

"ধরুন, আমি যদি আদেশ করি—ধরুন, আমি যদি অনুরোধ করি—"

বরেনের কথায় সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সরযূ বলিল, "আমি তাতেই রাজি হব।"

"সুখী হবেন?"

"হব।"

"শুধু লীলা সুখী হবে ব'লেই কি আপনি সুখী হবেন? শুধু কি শশিনাথ সুখী হবে ব'লে সুখী হবেন?"

নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে সরযূ বলিল, "না, শুধু সে জন্যে নয়।"

"তবে কি আমি সুখী হব ব'লে সুখী হবেন?"

মৃদু হাসিয়া সরযূ বলিল, "না, শুধু সে জন্যেও নয়।"

"সরযূ!"

সরযূ তাহার সলজ্জ রক্তিম মুখ ধীরে ধীরে বরেনের দৃষ্টিপথে তুলিল।

"এ কথা তো আমার বিশ্বাস হয় না সরযূ।"

দৃষ্টি নত করিয়া সরযূ বলিল, "কিন্তু এ কথা একটুও মিথ্যা নয়।"

সরযূর কথা শুনিয়া এক মুহূর্ত বরেন নীরবে অনিমেষনেত্রে সরযূর অবনত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সরযূ! সরযূ! আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত। আজ আমার সব দুঃখ দূর হ'ল। আমার সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে—বুঝতে পারছি নে কি করব!"

ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া সরযূ বলিল, "পৌনে সাতটা বাজে। আপনি এইখানে একটু বসুন; আমি বউদিদির সঙ্গে একবার দেখা ক'রেই আসছি।" বলিয়া লীলার চিঠিখানা লইয়া হৃষ্টচিত্তে লঘু ক্ষিপ্রগতিতেই সরযূ ঊর্মিলার উদ্দেশে ছুটিল।

৩৬

কি করিতে আসিয়াছিল, কি হইয়া গেল! সেদিন দুঃখে ও বিস্ময়ে বরেন যেমন বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল—আজ সুখে ও বিস্ময়ে সে ঠিক তেমনি বিহ্বল হইল। এই অচিন্তনীয় পুলকের চেতনা তাহার চকিত মনকে নেশার মত ক্রমশ মাতাইয়া তুলিতে লাগিল। সেই আভ্যন্তরীণ মত্ততার বেগে কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সরযূর ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিছু পরে সরযূর সহিত ঊর্মিলা প্রবেশ করিল; চক্ষে অশ্রু, মুখে হাসি।

"আশীর্বাদ করি বরেন-ঠাকুপো, তুমি আর সরযূ সুখী হও। এত দুঃখের মধ্যেও মনে বড় শান্তি পেয়েছি ভাই। সরযুর জন্যে আমার মনে একটুও সুখ ছিল না, তোমার দুঃখও আমার অজানা ছিল না।"

ঊর্মিলা'র পদধূলি লইয়া বরেন বলিল, "বাকি দুঃখটাও তোমার আশীর্বাদে কেটে যাবে বউদিদি। দাদা কি সব শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, তিনিও সব শুনেছেন, তিনি এলেন, ব'লে। কিন্তু বরেনঠাকুরপো, ফিরিয়ে আনতে পারবে তো? দুজনেই বড় শক্ত লোক।"

সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া বরেন বলিল, "নিশ্চয়ই পারব।" তাহার পর সরযূর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া হাস্যমুখে বলিল, "আমাদের দিকেও একজন কম শক্ত লোক নেই ; আমি না পারলেও সে পারবে।"

স্মিতমুখে ঊর্মিলা বলিল, "এখন তো সে আর শক্ত নয়, এখন তো সে নরম।"

বরেন বলিল, "কিন্তু অনেক কষ্ট দিয়ে।"

সরযূ তাহার সলজ্জ-আরক্ত মুখ নত করিল। বরেনর সেই সাদরসুমিষ্ট ভৎ‍‍‍সনা ও অনুযোগ তাহার নিদ্রোত্থিত প্রেমকে মৃদু তাড়নায় জাগ্রত করিয়া তুলিল এবং সে যে যথার্থই এই তিরস্কারের যোগ্য তাহা মনে মনে অনুভব ও স্বীকার করিয়া সে নিজেকে ব্যথিত এবং অনুতপ্ত বোধ করিল। কিন্তু মিষ্টরসে অম্ল সংযুক্ত হওয়ার মত এই অনুতাপ তাহার আনন্দকে সমধিক সরস করিয়া তুলিল।

সিঁড়িতে নামিবার সময়ে সোমনাথ সকলের সহিত একত্র হইল। বরেনকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "কাল রাত্রে; বরেন, যে বিভীষিকা দেখিয়াছিলাম, আজ সকালেই যে এত সহজ হ'য়ে আসবে, তা জানতাম না। এখন মনে হচ্ছে, কাল রাত্রে যে ভুলের মধ্যে আমরা পড়েছিলাম, তাতে মঙ্গলই হয়েছে, নইলে কিছু দিন থেকে আমরা যে সব ভুলের জাল বুনে ছিলাম, সেগুলো এমন ক'রে একেবারে কাটত না। অনেক কষ্ট পেয়ে আজ বুঝলাম যে সমাজই বল আর শাস্ত্রই বল, মানুষের ওপর কিছুই নয়। মানুষের গলা টিপে সমাজকে বাঁচানো যায় না।"

সোমনাথের মনে চণ্ডীদাসের একটা বিখ্যাত পদ নিরন্তর জাগিয়া উঠিতেছিল—"চণ্ডীদাস ভণে বিনয় বচনে, শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।"

আজ বরেনের হৃদয়ের কোনো স্থানে কোনো কোণে কিছুমাত্র বাধা বা দ্বিধা রাখিবার স্থান ছিল না ; বহু দিবসের মেঘভারাক্রান্ত আকাশ সহসা নির্মুক্ত

হওয়ার পর অনাবিল সূর্য-কিরণের মত আনন্দের হিল্লোল আজ তাহার প্রাণের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হইতেছিল। প্রতি দিবসের নিবৃত্তি-নিষেধের স্থলে আজিকার অবাধ উন্মাদনা তাহার চিত্তকে বিচিত্র ছন্দে দোল দিতেছিল এবং দোলের গতি ও ছন্দ হইতে বিশ্বের কোন অংশ যে আজ বাদ পড়িতে পারে—এমন কথা তাহার একবারও মনে হইতেছিল না। সে মনে করিতেছিল, সুখের যে দীপশিখাটি তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়াছে, ঘাটে একবার পৌঁছিতে পারিলেই নব-সংযোগের বলে তাহা একেবারে দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠিবে। সে পরিপূর্ণ বচনে সোমনাথের প্রতিপাদিত সত্যকে স্বীকার করিল।

স্টিমার-ঘাট অভিমুখে গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে গাড়ির চারিজন আরোহীই নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন হইল। গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য শশিনাথ ও লীলাকে কি বলিবে এবং গত রাত্রের শোচনীয় ভুলের জন্য কি প্রকারে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা-ভিক্ষা করিবে, সোমনাথ ও ঊর্মিলা তাহাই ভাবিতেছিল। সরযূ ও বরেন ভাবিতেছিল প্রধানত তাহাদের নিজেদের কথা। বসন্ত-প্রভাতের নির্মল বায়ু, নবোদিত সূর্যের রক্তিম কিরণ তাহাদিগকে একই আনন্দধারায় স্নান করাইতেছিল। দুইজন পুরুষের নিকটে দুই ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সরযূর হৃদয়ে যে প্রেম দুঃখ ও ঘৃণায় মলিন হইয়া আসিয়াছিল, বরেনের হৃদয়ে বরণীয় হইয়া আজ তাহা নিজেকে সম্মানিত মনে করিল। আজ তাহা দীন নহে, উপেক্ষিত নহে, আজ তাহা অভ্যর্থনা ও আদরে গৌরবান্বিত। সরযূর হৃদয়ের এই তৃপ্তি ও প্রসন্নতা তাহার সলজ্জ আরক্ত মুখের অধরপ্রান্ত এবং নেত্রকোণ দিয়া বার বার উছলিয়া পড়িতেছিল। বরেন তাহার উৎসুক চক্ষু দিয়া সম্মুখে উপবিষ্টা সরযূর এই স্নিগ্ধ মাধুরীর প্রলেপ গ্রহণ করিয়া তাহার হৃদয়ের ক্ষত নিরাময় করিতেছিল। আজিকার অচিন্তিত সৌভাগ্য তাহার এতদিনের লজ্জা ও দুঃখকে এক মুহূর্তে আনন্দে পর্যবসিত করিয়া দিয়াছে। পথচারী পথিকের কোলাহল, গাড়ির ঘর্ঘর

শব্দ, রাজপথের শত প্রকারের নিনাদ আজ বিচিত্রভাবে মিলিত হইয়া বরেনের কর্ণে সঙ্গীতের মত গুঞ্জরিত হইতে লাগিল।

গাড়ি যখন স্টিমার-ঘাটের নিকটবর্তী হইল, তখন ভোঁ-ভোঁ করিয়া স্টিমারের গভীর ও প্রবল বাঁশি ঘন ঘন বাজিতেছিল।

ব্যস্ত হইয়া ঘড়ি দেখিয়া বরেন বলিল, "এখন তো মোটে পৌনে আটটা এরই মধ্যে স্টিমারের বাঁশি বাজছে কেন?"

সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে মুখ বাহির করিয়া সোমনাথ কোচম্যানকে বলিল, "জোরসে চালাও।"

অল্প পরেই গাড়ি আসিয়া ঘাটের সম্মুখে স্থির হইল। জেটির ঠিক সম্মুখেই স্টিমার। উপরের ডেকে উচ্চশ্রেণীর যাত্রীগণ সার বাঁধিয়া রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া তীরে দণ্ডায়মান তাহাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে নিরীক্ষণ করিতেছে—কাহারও কাহারও হস্তে দূরবীক্ষণ যন্ত্র। একদল ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষ জেটিতে দাঁড়াইয়া সজোরে রুমাল নাড়িতেছিল।

"আপনি মেয়েদের নিয়ে আসুন, আমি এগিয়ে চললাম।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বরেন জেটির মধ্যে নামিয়া গেল।

তখন সবে মাত্র দুই দিকের জেটি হইতে দুইখানি সিঁড়ি জাহাজের উপর তুলিয়া লইয়াছে। স্টিমার অগ্র-পশ্চাতে না চলিয়া অতি ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া জেটি হইতে গভীর জলে সরিয়া যাইতেছিল।

খালাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বরেন উচ্চকণ্ঠে বলিল, "স্টিমার জেটিতে একবার লাগাও—পঞ্চাশ টাকা বক্‌শিশ দোব।"

কে কাহার কথা শুনে! সিঁড়ি তুলবার ঘর্ঘর শব্দে ও জাহাজের উপরে অন্যান্য কোলাহলে বরেনের আকুল কণ্ঠস্বর অশ্রুত মিলাইয়া গেল। শুধু ডেকের উপর হইতে এবং জেটির উপরে কয়েক ব্যক্তি সকৌতুকে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ততক্ষণে ঊর্মিলা ও সরযূকে লইয়া সোমনাথ বরেনের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। ঊর্মিলার দিকে হতাশ নেত্রে চাহিয়া বরেন বলিল, "সব বৃথা হ'ল বউদি? এমনি ক'রে ফাঁকি দেবার জন্যেই বোধ হয় স্টিমার ছাড়বার ঠিক সময় শশি আমাদের জানায় নি। ঐ দেখ, লীলা আর শশি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

উদাস অপলক দৃষ্টি তীরের দিকে নিবদ্ধ করিয়া লীলা জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবং তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শশিনাথ তাহাকে কিছু বলিতেছিল,—যাহা, দূর হইতেও বেশ বুঝা যাইতেছিল, লীলার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না।

চীৎকার করিয়া সোমনাথ ডাকিল, "শশি!"

জাহাজ তখনো কণ্ঠস্বরের একেবারে বাহিরে চলিয়া যায় নাই।—সোমনাথের আহ্বান শশিনাথ ও লীলা উভয়েরই কর্ণে পৌঁছিল। চকিত হইয়া তাহারা ইতস্তত অন্বেষণ করিতে লাগিল, অবশেষে জেটির উপরে সোমনাথ, বরেন, ঊর্মিলা ও সরযূকে দেখিতে পাইল।

পূর্ববৎ চীৎকার করিয়া সোমনাথ বলিল, "ফিরে এস, নেবে পড়।"

বরেন হস্তসঙ্কেতে তাহাদিগকে নামিয়া পড়িতে ইঙ্গিত করিল এবং উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ক্যাপ্টেনকে বললে নামিয়ে দেবে।"

ঊর্মিলা ও সরযূ আকুল ভাবে হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাহাদিগকে ডাকিতে লাগিল।

নদীবক্ষে সঞ্চরমাণ নৌকা ও ক্ষুদ্র স্টিমারসমূহকে সাবধান করিবার জন্য জাহাজ পুনঃপুনঃ গভীর স্বরে বাঁশি বাজাইতেছিল। সেই বিপুল শব্দ ভেদ করিয়া সোমনাথ ও বরেনের বক্তব্য তাহাদের শ্রুতিগোচর হইল কি না বুঝা গেল না। কিন্তু উভয়েই যে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মনে হইল। লীলা তাহার অঞ্চল গলদেশে বেষ্টিত করিয়া যুক্তকর ও মস্তক রেলিঙে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, এবং শশিনাথ রেলিঙে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি বলিল, তাহা একেবারেই বুঝা গেল না।

বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে স্টিমার ক্রমশ জেটি হইতে এং দূর হইয়া পড়িল যে, উভয় পক্ষই বুঝিতে পারিল আর কথা কহিয়া কোন ফল ছি না। তখন নিরুপায় হইয়া এক পক্ষ জাহাজে এবং অপর পক্ষ জেটিতে নিঃশব্দ দাঁড়াইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। দূর হইতে দূরে গিয়া স্টিমার মধ্য-নদীতে একবার যেন স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর সহসা দ্রুতগতি লাভ করিয়া সম্মুখে ছুটিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে স্টিমার তীরবর্তী জাহাজসমূহের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধু বাঁশির বিরাট শব্দ আরও ভীষণ হইয়া বাজিতে লাগিল—ভোঁ ভোঁ ভোঁ।

ঊর্মিলা ও সরযূ নিঃশব্দে রোদন করিতেছিল।

তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সোমনাথ বলিল, "গঙ্গাস্নান ক'রে যাবে ঊর্মিলা?"

চক্ষু মুছিয়া ঊর্মিলা বলিল, "কেন?"

"যদি তাতে কাল রাত্রির মহাপাপ একটু ক্ষয় পায়!"

আবার ঊর্মিলার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সমাপ্ত